ভারতের সঙ্গীত গুণী

প্রথম খণ্ড

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
বিপুল চট্টোপাধ্যায়
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৬৭

সরকার প্রদত্ত কাগজে মুদ্রিত

প্রচ্ছদ : তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

মুদ্রাকর :
শ্রীমন্মথনাথ পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭ ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

ভারতের সঙ্গীত গুণী

প্রথম খণ্ড

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

সঙ্গীত বিষয়ক ঃ

ভারতীয় সঙ্গীতে ঘরানার ইতিহাস
বাঙ্গালীর রাগসঙ্গীত চর্চা
দরবার নটী কলাবন্ত
আসরের গল্প
বিষ্ণুপুর ঘরানা
সঙ্গীতের আসরে
সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীতকল্পতরু

জীবনী ঃ

বিচিত্র প্রতিভা
CHAITANYA

ছোটদের ঃ

এশিয়ার রূপকথা
একদা যাহার বিজয় সেনানী

উৎসর্গ

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীবিমল মিত্র

সমীপেষু

এই লেখাগুলির সঙ্গে আপনার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা
মিশে আছে, সেকথা স্মরণ করে—

‘যে ভাল গান গায়, ভাল বাজায়, কোন একটা বিদ্যা খুব ভাল রকম জানে, তার ভিতরেও সার আছে। ঈশ্বরের শক্তি আছে।’

শ্রীরামকৃষ্ণ

‘We owe consideration to the living, to the dead we owe only truth’.

Voltaire

নিবেদন

একটি বড় পরিকল্পনা নিয়ে এই গ্রন্থমালার সূচনা হল। ভারতীয় সঙ্গীতের বিশিষ্ট সাধক-সাধিকাদের জীবনকথা প্রকাশ করা হবে পর্যায়ক্রমে। বর্তমান খণ্ড তার প্রথম সম্ভার।

রাগের রূপ ও তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে যথেষ্ট বই সাম্প্রতিক কালে দেখা দিচ্ছে। সঙ্গীত বিষয়ে বার্ষিক অসংখ্য পরীক্ষার্থীদের জন্যে এইসব পাঠ্যপুস্তকে সহজ সিদ্ধির ব্যবস্থা। কিন্তু সেই তত্ত্বকে যাঁরা সারা জীবনের তন্নিষ্ঠ সাধনায় রূপায়িত করেছিলেন, তাঁদের পরিচয়-কথা প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। কয়েকজনের নামের স্মৃতি মাত্র আছে। কারুর বা কোন কোন দুষ্প্রাপ্য গ্রামোফোন রেকর্ড। আর বেশির ভাগই বিস্মরণের অকূল পাথারে নিমজ্জিত। বিগত যুগের সাহিত্য কিংবা সংবাদপত্র-জগতেও তাঁরা ছিলেন অলক্ষিত, হয়ত বা উপেক্ষিতও।

ভারতীয় সঙ্গীতের ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্য নিয়ে আমরা গৌরব বোধ করে থাকি। জগৎ-সঙ্গীত-সভাতেও আজ পরম সমাদরের আসন পেয়েছে ভারতের রাগ-সঙ্গীত। কিন্তু অতীত কালের, বিশেষ উনিশ শতকীয় যে কলাকাররা এই বহুমূল্য বিদ্যাধারাকে একনিষ্ঠ সাধনে রক্ষা করেছেন, বর্তমানের দরবারে সযত্নে উপনীত করে দিয়েছেন, তাঁদের বিবরণই অনাদরে নিশ্চিহ্ন-প্রায়। সেই সব সঙ্গীতশিল্পীদের কীর্তিকাহিনী উদ্ধার করবার জন্যে এই প্রচেষ্টা।

জীবনীগুলি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, মামুলি ধরনের কঙ্কাল মাত্র নয়। কলাকারদের বিস্তারিত আর অন্তরঙ্গ পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তাঁদের সঙ্গীতজীবনের জ্ঞাতব্য বিষয় সমেত। সমকালীন সঙ্গীতক্ষেত্রে তাঁদের স্থান, সম্পর্কিত অন্যান্য গুণীদের, পূর্বাচার্য ও শিষ্যদের, উল্লেখ্য বিবরণও বিধৃত আছে। নিশ্চিত-ভাবে জানা আসরের ঘটনাও বিবৃত করা হয়েছে তাঁদের সঙ্গীতগুণের নিদর্শন-স্বরূপ। অর্থাৎ একটি জীবনের সূত্রে সাঙ্গীতিক ইতিহাসের নানা অংশের সংযোজন। সন্ধানী আলোকপাতে বিভিন্ন, বিচিত্র ধারার সংরক্ষণ। যেমন, বড়কু মিঞা ও মহম্মদ আলীর কথায় তানসেনের এক পুত্রধারার শ'খানেক বছরের এবং সমগ্র সমাপ্তি পর্যায় পাওয়া যাবে। লছমী ওস্তাদের প্রসঙ্গে তাঁদের তিন পুরুষের সঙ্গীতজীবনের পরিচয়। তেমনি গহরজান, লালচাঁদ,

বড়াল, দক্ষিণাচরণ সেন, কিরণময়ী কিংবা মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুষঙ্গে থাকবে সমসাময়িক সঙ্গীতজগতের নানা গুণীর কথা।

অধ্যায়ের নায়ক বা নায়িকার জীবনকে সেকালের সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমিতে স্থাপন করেছি। তাঁদের সঙ্গীতজীবনের তথ্য উদ্ধার করে দিয়েছি যথাসাধ্য। যাঁদের গ্রামোফোন রেকর্ড হয়েছে তাঁদের রেকর্ডের তালিকাও বাদ দিইনি। ভবিষ্যৎ গবেষকদের এ সবই সহায়ক হবে। গুরু পর্যায় এবং শিষ্য তালিকাও যুক্ত করেছি সেই বিবেচনায়। এত তথ্য যোগে রচনা যেন ক্লান্তিকর না হয় সেজন্যে সুখপাঠ্যতার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়েছে। কিন্তু কাহিনী আকর্ষক করতে কাল্পনিক কিছু যোগ করিনি। যাঁদের প্রসঙ্গে নাটকীয়তা দেখা দিয়েছে, তাঁদের বাস্তব জীবনও ওই প্রকার ছিল।

জীবনীগুলির উপকরণ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, সমসাময়িক গ্রন্থ বা পত্র-পত্রিকায় যেটুকু উল্লেখ পেয়েছি, উদ্ধৃত করেছি যথাস্থানে। কোন কোন শিল্পীর স্মৃতি-সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকা থেকেও সন তারিখ বা অন্য কিছু কিছু তথ্য পেয়েছি। আর তাঁদের সঙ্গ পেয়েছেন কিংবা অন্য কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাঁদের প্রসঙ্গ জানেন এমন ব্যক্তিদের কাছেও অনেক মূল্যবান বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছি। সমকালীন নথিপত্র ভিন্ন আর কিছুই বিশ্বাস-যোগ্য নয়—এমন অসঙ্গত মনোভাব অবলম্বন করলে এই সব জীবনীর প্রায় কোনটিই লেখা যেত না। আর তাহলে সমস্ত উপাদান লুপ্ত হয়ে কলাকারদের পরিচয় অজ্ঞাত থাকত, যেমন অতীতে হয়েছে অনেকের ক্ষেত্রে।

কোন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, 'যাঁকে নিজের চোখে দেখিনি, অন্যের মুখে শুনে তাঁর কথা লিখব না।'

কথাটিতে দম্ভ, ফাঁকি, নির্বুদ্ধিতা এবং দায়িত্বহীনতাও আছে। দম্ভ এই-জন্যে যে, 'আমি' ছাড়া আর কেউ যেন সত্যবাদী বা সত্যদর্শী নেই। ফাঁকি এইজন্যে যে, আমি নিজের চোখেও ভুল দেখতে পারি যথোচিত বিদ্যাবুদ্ধি না থাকলে। আমি তো স্বচক্ষে দেখি, সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। অথচ বাস্তব সত্য একেবারে বিপরীত। নির্বুদ্ধিতা এইজন্যে যে, ওই মনোবৃত্তির বশে অন্য সকলের নিশ্চিত জানা বিবরণ হেলায় হারাতে হয় এবং সে ক্ষতি অপূরণীয়। দায়িত্বহীনতা এইজন্যে যে, অপরের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে অন্যান্য সূত্রে এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করে, স্থায়ী রূপ দেবার পরিশ্রমকে এড়িয়ে যাওয়া এবং তার ফলে, নিষ্ক্রিয়তা।

আমার লক্ষ্য, উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান করে তাঁর নিকটে সংগ্রহ, সমকালীন স্বীকৃত বা সম্ভাব্য ভিত্তিতে নিরপেক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণ বিবেচনায় সার নির্ণয়ের জন্যে প্রয়াস। এই উপায়ে, সংগৃহীত জীবনীগুচ্ছের অনেকাংশই গঠিত। 'অন্যের মুখে শোনা কথা' নিয়ে সত্যভ্রষ্ট হইনি, এই আমার স্থির বিশ্বাস। বিদগ্ধ পাঠকবর্গ লেখাগুলি পাঠের পর সিদ্ধান্ত করবেন, অমুদ্রিত তথ্য ব্যবহার সমীচীন হয়েছে কিনা।

সকল গুণীদের নাম হয়ত পাঠকদের কাছে সুপরিচিত নয়। কিন্তু পাঠ করলেই বোঝা যাবে যে, তাঁদের কৃতিত্বও জানবার যোগ্য। তাঁরাও স্মরণীয় দান রেখে গেছেন সঙ্গীতচর্চার শ্রীবৃদ্ধিতে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কলাকারদের নিয়ে ব্যাপক বিষয়সূচী প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতি খণ্ডে একাধিক কেন্দ্র বা অঞ্চলের শিল্পীদের কথা থাকবে। তাঁদের জন্মসন অনুসারে বা কালানুক্রমিক দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সম-কালীনদের রাখা হবে একেকটি খণ্ডে।

এই গ্রন্থমালার অন্তর্গত গুণীদের কাল আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, সমগ্র উনিশ শতক এবং বিশ শতকেও বিস্তৃত। তাঁরা অধিকাংশই উনিশ শতাব্দের জাতক। আঠারো শতকের পূর্ববর্তী অর্থাৎ মধ্যযুগীয় নানা কলাকারের বিবরণ আছে আমার 'দরবার নটী কলাবন্ত' গ্রন্থে। আমার অন্যান্য বইগুলিতে যাঁদের কথা বলেছি, বর্তমান পর্যায়ে তাঁরা কথিত হবেন না।

আমার সেই সব পুস্তকে ভিন্ন, আরো অনেকের জীবনকাহিনী প্রকাশ করেছি সাময়িক পত্রপত্রিকায়। 'অমৃত' সাপ্তাহিকে 'সেকালের সঙ্গীতগুণী' অনেক সংখ্যায় প্রকাশিত হলেও সম্পূর্ণ হয়নি। 'দেশ' পত্রিকাতেও একাধিক সংখ্যায় বেরিয়েছে 'ভারতের সুরলোকে'। সেই সমস্ত এবং আমার অন্যান্য অপ্রকাশিত লেখা নিয়ে বর্তমান পর্যায় আরম্ভ হল। 'দেশ' ও 'অমৃতে'র লেখাগুলি এখানে পুনর্মার্জিত রূপ পেয়েছে, আরো তথ্যও দেওয়া হয়েছে।

গুণীদের জীবনীমালা এই অর্থে নতুন যে, অন্য কেউ তাঁদের কথা লেখেন-নি। একমাত্র লালচাঁদ বড়াল সম্পর্কে কিছু স্মৃতিকথা তাঁর সুযোগ্য পুত্র রাইচাঁদ বড়াল মহাশয় প্রকাশ করেছেন সাময়িক পত্রিকায়। সেই বিবরণের সঙ্গে দু-একটি প্রসঙ্গে স্বভাবতই আমার লেখায় একত্ব আছে। কিন্তু দুটি রচনার বিষয়বস্তু, পরিধি ও তথ্যগত পার্থক্য পাঠ করলেই বোঝা যাবে।

মূল শিল্পীদের প্রতিকৃতিও বর্তমান খণ্ডের মতন প্রতি খণ্ডে দেওয়া হবে যথাসম্ভব। জীবনীর সঙ্গে ছবিও তাঁদের স্মরণের সহায়ক হবে আশা করি।

প্রকাশক মহাশয় শ্রীবিপুল চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর সানন্দ সহযোগিতা এবং সযত্ন উদ্‌যোগের জন্যে আমার অন্তরের ধন্যবাদ। ইতি

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

লাল চাঁদ বড়াল
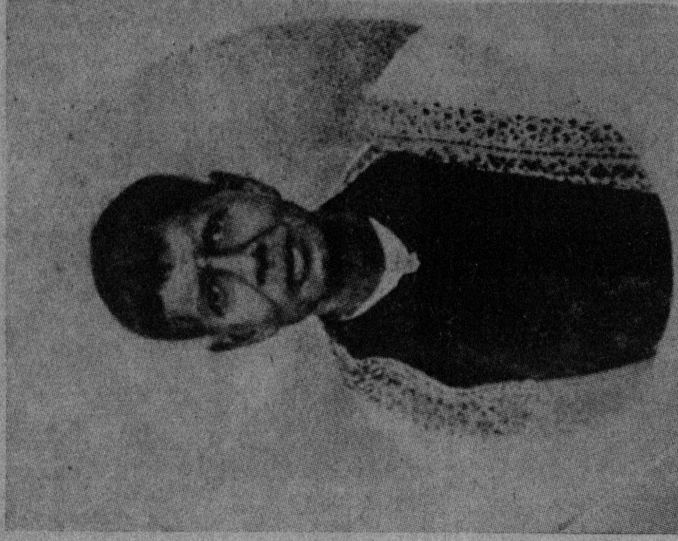
দক্ষিণা চরণ সেন

মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

লছমী প্রসাদ মিশ্র
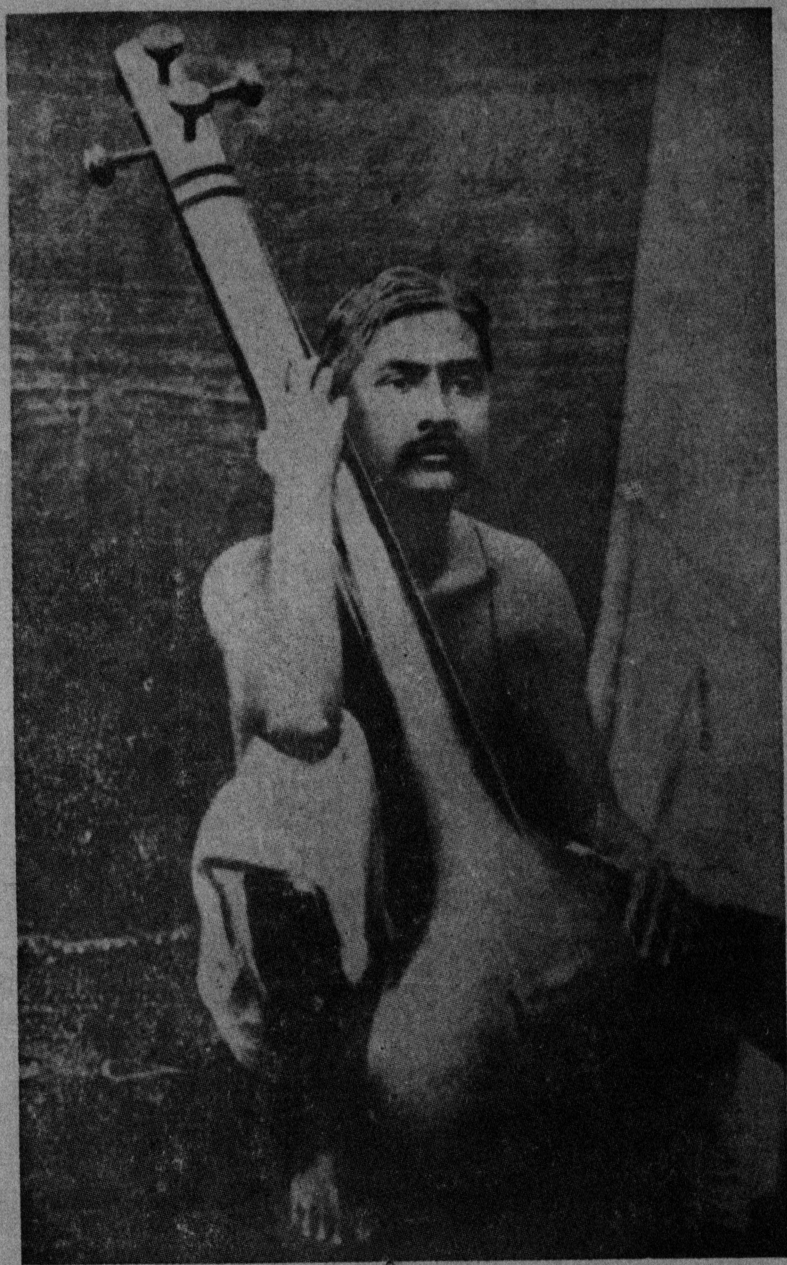
গহর জানের জীবন গহনে

গহর জান

এমন আসরও হতে পারে ? স্বচক্ষে দেখেও অনেকে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। আগে কখনো শোনা যায়নি তো এরকম আসরের কথা।

কিন্তু গহর জানকে যাঁরা জানতেন তাঁরা বললেন, 'হ্যাঁ, হয় বৈকি। শুধু গহরের পক্ষেই এমন আসর করা সম্ভব। অন্য কোন বাইজীর এ ক্ষমতা নেই।'

গহর জানের সব কিছুতেই চমক। রূপে আর সজ্জায়, চরিত্রে আর আচরণে, নাচে গানে আর আসরে চমকিত করে দেন দর্শকদের, শ্রোতাদের।

সেদিন যাঁদের বাড়িতে সে আসর হয়েছিল, তাঁরাও ধারণা করতে পারেননি কি চমক সৃষ্টি তবে বাইজীর আসরে।

গহর জান নিজেও আগে থেকে কিছু ভেবে রাখেননি। এ ভাবের উদয় তাৎক্ষণিক।

কর্মকর্তারাও প্রথমে অপ্রস্তুত বোধ করলেন।

গহর জান যখন তাঁদের জানালেন, 'শ্রোতারা এই যে সকলে মিলে মিশে রয়েছেন, এঁদের ভাগ করে বসানো যায় না ?'

তখনো কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারেননি, বাইজীর কি উদ্দেশ্য। একেবারে তাঁর নাচ গান আরম্ভ হতে, শ্রোতাদের সঙ্গে তাঁরাও বুঝলেন।

সেদিন জোড়াসাঁকোর সেই মল্লিক ভবনে। চিৎপুর রোডের পশ্চিম ধারে সেই ঘড়িওলা বাড়িতে। হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের অট্টালিকার (যা এখন লোহিয়া মাতৃ সেবাসদন) বিপরীত দিকে।

সেখানে ১৯১৩ সালের একটি গ্রীষ্মসন্ধ্যার কথা।

সেদিন গহর জানের আসর শুধু নয়, বিরাট মল্লিক গৃহটিও সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। বিবাহ-উৎসবের সাজ! বিবাহ হয়ে গেছে একদিন আগে। সেদিন প্রীতিভোজের সম্মেলন। সেই উপলক্ষ্যে গহর জানের নৃত্যগীত হবে সদর মহলে। নিমন্ত্রিতেরা প্রাঙ্গণের সারি সারি চেয়ারে বসেছেন। তারই একদিকে গহর জানের জন্যে সাজানো মঞ্চ। বাই সাহেবা তখনো আসেননি আসরে।

তখনকার মল্লিক বাড়ি বটে। কিন্তু তার বলবার মতন আরো পুরনো পরিচয় আছে।

বাংলার প্রথম জাতীয় নাট্যশালার পত্তন হয় সেখানেই। তবে তা গহর জানের সে আসরের ৪০ বছর আগেকার কথা। ১৯১৩ সালে যেখানে গহর জানের আসর বসেছে, ঠিক সেইখানে ১৮৭২ সনে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় হয়ে গেছে। দর্শক সাধারণ দর্শনী দিয়ে দেখেছেন 'নীলদর্পণ নাটক'।

তবে গৃহটি সে সময় ছিল মধুসূদন সান্ন্যালের। কিন্তু তখনো তা ক্লক টাওয়ার বা ঘড়িওলা বাড়ি বলে এ অঞ্চলে সর্বপরিচিত। আর বাংলার প্রথম সাধারণ নাট্য-মঞ্চের জন্যে সে ভবন ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে আছে।

"রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিবার জন্য মাসিক ৪০ টাকা ভাড়ায় চিৎপুরে 'ঘড়িওয়ালা বাড়ি' নামে খ্যাত মধুসূদন সান্ন্যালের সুবৃহৎ অট্টালিকার বহির্বাটির উঠানটি ভাড়া লওয়া হইল।...পরে ধর্মদাস সুরের কর্তৃত্বে স্টেজ তৈয়ার হইয়া গেলে ঠিক হইল, ৭ই ডিসেম্বর তারিখে প্রথম অভিনয় হইবে। অভিনয়ের পূর্বে ১৯ নভেম্বর ১৮৭২ তারিখের 'সুলভ সমাচারে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়,—

কলিকাতা ন্যাশনেল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি

সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমরা আগামী ৭ই ডিসেম্বর শনিবার তারিখে শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকের বাটীর সম্মুখে মৃত

মধুসূদন সান্ন্যাল মহাশয়ের বাটীতে বঙ্গভূমির ও বঙ্গ ভাষার অঙ্গ-পুষ্টির নিমিত্ত রঙ্গভূমে আবির্ভূত হইতে ইচ্ছুক ও যত্নবান হইয়াছি। সেদিন নীলদর্পণের অভিনয় হইবে। টিকিটের মূল্য প্রথম শ্রেণী—১ টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণী—৮ আনা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক। শ্রীধর্মদাস সুর স্টেজ মেনেজর।" (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১০৮—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

গহর জানের জন্যে সাজানো আসরের জায়গায় ৪০ বছর আগে পর পর অভিনয় হতে থাকে 'নীলদর্পণ', 'জামাই বারিক', 'সধবার একাদশী', 'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী', 'মুস্তফী সাহেবকা পাকা তামাসা', 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি। নানা ভূমিকায় সেখানে দেখা দিয়েছেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, মতিলাল সুর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশ কর, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বেলবাবু, মহেন্দ্রলাল ও অমৃতলাল বসুরা।

যে প্রাঙ্গণে ন্যাশনাল থিয়েটারের দর্শকরা আট আনা, এক টাকা দর্শনী দিয়ে অভিনয় দেখতেন, সেখানেই সেদিন বিবাহ-উৎসবের নিমন্ত্রিতরা গহর জানের আসরে উপস্থিত। কালের পটভূমিতে আরেক মঞ্চের দৃশ্য। মল্লিক পরিবারের আত্মীয় কুটুম্ব ভিন্ন ব্যবসায় সূত্রে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন সাহেব সুবো, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি নানা ভাষাভাষীরা।

আগেকার সান্ন্যাল বাড়ি তখন মল্লিক বাড়িতে নামান্তরিত হলেও রূপান্তর কিছু ঘটেনি। বহিরঙ্গ আকৃতি আছে অবিকল। বাইরের দেওয়ালে প্রকাণ্ড ঘড়িটি পর্যন্ত। পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট যেখানে চিৎপুর রোডে মিলেছে, তার দক্ষিণেই। ট্রাম রাস্তার ধারে। ঝোলানো ঘড়ি দূর থেকেও চোখে পড়ে। লোকে তখনো বলে—ক্লকটাওয়ার কিংবা ঘড়িওলা বাড়ি।

গৃহপরিবারের কর্তা এখন দুজন। বনমালি মল্লিক ও মোতিলাল মল্লিক। গোবিনলাল মল্লিকের দুই কনিষ্ঠ সহোদর।

আর গোবিনলালের জামাতা হলেন সেকালের প্রসিদ্ধ গায়ক লালচাঁদ বড়াল। তবে গহর জানের সে আসরের ছ বছর আগে লালচাঁদ বিগত। তাঁর শ্বশুর গোবিনলাল মল্লিকও তখন পরলোকে।

সেদিন মোতিলালের পুত্র মুরারিমোহনের বিবাহ উপলক্ষ্যে গহর জানের আসর বসেছে।

সেই ১৯১৩ সালে গহরের একটি আসরের মুজরো ৫০০ টাকা; বাইজী কুলে তাঁর হার তখন সর্বোচ্চ।

সন্ধ্যের কিছু পরেই গহর জান আসরে প্রবেশ করলেন। অমনি এক স্ফুট গুঞ্জরণ জাগল অভ্যাগতদের মধ্যে। বাইজীকে যাঁরা চিনতেন আর যাঁরা চিনতেন না সকলকেই একবার চেয়ে দেখতে হল। যাঁদের শোনা ছিল গহর জান মধ্যবয়সিনী, তাঁদের হিসেব মিলল না তাঁকে সামনে দেখে। কত বছর থেকে নটী যে একইভাবে দেদীপ্যমানা, বোঝা যায় না।

অঙ্গে হিল্লোল তুলে মঞ্চের দিকে এগিয়ে চললেন বাই সাহেবা। তাঁর পরে তবল্‌চী, সারঙ্গী, হারমোনিয়াম বাদক প্রভৃতি লোকজন।

গহর জান আসন নিতেই আসর মঞ্চ আবার নতুন করে ঝলমল করে উঠল। আর তিনি স্বল্প বিশ্রামের অবসরে লক্ষ্য করতে লাগলেন শ্রোতাদের। কোন কোন উদ্‌যোক্তার সঙ্গে শিষ্টাচার আলাপনের মধ্যেও সেদিকে তাঁর দৃষ্টি রইল। যেমন তাঁর বরাবরের অভ্যাস—আসরের মান ও প্রকৃতি লক্ষ্য করা। কারণ রীতিমত আসর-সচেতন শিল্পী তিনি। নৃত্যগীত আরম্ভ করবার আগে ধারণা করে নেন—শ্রোতারা আর তাঁদের রুচি ধরনধারণ কেমন। তারপর স্থির করেন নিজের অনুষ্ঠান সূচী। জানা আসর হলে অবশ্য এদিকে চিন্তার দরকার হয় না।

এখানে সমাগতদের দেখে এক অভিনব পরিকল্পনা জাগল তাঁর মনে। শ্রোতাদের নতুন বিন্যাসে বসানো দরকার বোধ হল।

সেজন্যে কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিলেন, 'উপস্থিত

ব্যক্তিদের মধ্যে সাহেব, বাঙালী, মারোয়াড়ী, পাঞ্জাবী সব মিশে রয়েছেন দেখছি। ওঁদের আলাদা বসানো যায় না?'

'কি রকম?'

গহর জান বুঝিয়ে বললেন, 'এক একটি ভাষার লোক হিসাবে ওঁরা ভাগ হয়ে বসবেন। সাহেব মেমরা থাকবেন একসঙ্গে পাঞ্জাবীরা সবাই এক জায়গায়। মারোয়াড়ী হিন্দুস্থানীরা একসঙ্গে বসুন। আর বাঙালীরা সবাই থাকুন এক জায়গায়।'

'আচ্ছা, সে রকম ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু···'

'এখনি বুঝতে পারবেন, কেন।' এই মাত্র জানালেন গহর।

তাঁর কথা মতন শ্রোতাদের নতুন করে বসতে অনুরোধ করলেন তাঁরা। কৌতূহলী হয়ে সবাই তেমনিভাবে আসন নিলেন। ভাষা অনুযায়ী পৃথক এক একটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত।

তখন এই নতুন ব্যবস্থার জন্যে সকলেরই উৎসুক দৃষ্টি পড়েছে বাইজীর দিকে।

তিনি মঞ্চ থেকে প্রাঙ্গণে নেমে এলেন। বিভিন্ন ভাষাভাষী শ্রোতাদের মধ্যে।

যেখানে সাহেব মেমরা বসেছিলেন, সেখানে এসে বাই সাহেবা দাঁড়ালেন। এখান থেকেই আরম্ভ হল তাঁর অনুষ্ঠান।

সাহেবদের দিকে 'নড' করে গহর জান একটি ইংরিজী গান ধরলেন। সাবলীলভাবে এবং নিখুঁত উচ্চারণে।

ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষরা চমৎকৃত হলেন বাইজীকে ইংরিজী গান আরম্ভ করতে দেখে। আর কি সপ্রতিভ গায়িকা! অন্য শ্রোতারাও বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন। দিব্যি ইংরিজী ভাষায় গাইছেন তো গহর জান!

গান শেষ হতে মেম সাহেবরা মহা খুশি হয়ে করতালি দিলেন।

গানের পরে বাইজী নৃত্য আরম্ভ করলেন তাঁদের কাছেই। এ নাচ অবশ্য ইংরেজী ধরনের নয়। যেমন ভাও বাৎলাবার সঙ্গে বাই

নৃত্য হয়ে থাকে, তেমনি। তবে ভাও বাৎলানা বিশেষ করলেন না। কিছু কিছু নৃত্য ভঙ্গিমা দেখালেন দেহচ্ছন্দে।

এমনি নাচের পর আর একটি ইংরিজী গান শুনিয়ে দিলেন।

মেম সাহেবরা এবারও করতালি ধ্বনিতে আনন্দ প্রকাশ করলেন। এবার অনেকেই বুঝলেন—বাইজীর আসরের পরিকল্পনাটি।

তারপর গহর জান এলেন পাঞ্জাবী শ্রোতাদের সামনে। তাঁদের অভিবাদন জানিয়ে তিনি পাঞ্জাবী ভাষায় একটি গান শোনালেন। এই শ্রোতাদের এখন চমকিত হবার পালা।

গানের শেষে বিশেষ করে তাঁদের উদ্দেশেই নৃত্য করলেন।

পাঞ্জাবীদের প্রশংসা নিয়ে এবার তিনি এসে দাঁড়ালেন আর এক দিকে। এখানে রাজস্থানী ও অন্যান্য হিন্দী-ভাষী অতিথিবর্গ ছিলেন।

তাঁদের দিকে নতি জানিয়ে এবার শুরু হল গহর জানের হিন্দী গান। এখন তো আসর তাঁর হাতের মধ্যে এসে গেছে। শ্রোতাদের মাতিয়ে দিলেন একটি ঠুংরি আর একটি দাদরা শুনিয়ে।

আবার খানিকক্ষণ নৃত্য দেখালেন।

তাঁদের হর্ষধ্বনির মধ্যে গহর জান এলেন বাঙালীদের দিকে। সকলেই বুঝতে পারলেন, এবার তিনি বাংলা গান শোনাবেন।

গহর গান ধরলেন জিলা সুরে দাদরা তালে—

ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল
আর এল না (আর এল না)।
বুঝিবা প্রেমের ডোরে বেঁধেছে কেউ
প্রাণ ময়না॥
বল সখি কোথায় যাব,
কোথায় গেলে পাখী পাব।
এমন ধনী কে শহরে আমার পাখী রাখলে ধরে,
দেখলে তারে কেড়ে নেব,
আর দেব না॥

অন্য শ্রোতাদের তুলনায় বাঙালীরা ছিলেন অনেক বেশি। তাই হয়ত গহর জান আরেকটি গান শোনালেন—

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
পথের শুকনো ধূলি যত,
কে জানিত আসবে তুমি গো
এমন অনাহুতের মতো।...

গানের পরে আরো একদফা নৃত্য দেখালেন।

এমনিভাবে সমস্ত শ্রোতাদের পরিতুষ্ট করলেন গহর জান। তাঁদের এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা হল। একই গায়িকার কণ্ঠে চারটি ভাষায় গান শুনে।

সেদিন তারপরেও গহরকে গাইতে হয়েছিল। এতক্ষণ নাচ গান করছিলেন সদর মহলে। এ আসরে বাংলা গান গাইবার পর তাঁর কাছে অন্দর মহল থেকে আহ্বান এল।

'দোতলায় মহিলারা বাই সাহেবার গান শোনবার জন্যে বড়ই আগ্রহ জানাচ্ছেন। গায়িকার সামনে বসে তাঁদের শোনবার ইচ্ছা। তিনি আসবেন কি?'

সানন্দে সম্মতা হলেন গহর জান। এবার মহিলা-মহলে বাংলা গান শোনাতে চললেন। সে বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।...

সেদিন মল্লিক বাড়ির আসরে গহর জান যে তাবৎ শ্রোতাদের চমৎকৃত করেছিলেন, সেটি তাঁর সঙ্গীত-জীবনের এক বৈশিষ্ট্য। আসর যেমনই হোক, তিনি তা জয় করবেনই। শ্রোতারা যে ধরনের হোক, গহর তাঁদের মাতিয়ে দেবেন ঠিক। সেজন্যে তাঁর প্রস্তুতি আছে নানাভাবে।

ওখানে তো চার ভাষায় গান গেয়েছিলেন। তা ছাড়াও আরো তিনটি ভাষায় গান শোনাতে পারতেন তিনি। হিন্দী উর্দু ফারসী মরাঠী পাঞ্জাবী ইংরেজী বাংলা—সাকুল্যে এই সাতটি ভাষায় গান তাঁর সঞ্চয়ে থাকত। শুনিয়ে দিতেন ফরমায়েশ কিংবা দরকার মাফিক।

বিভিন্ন ভাষায় গান গাওয়া যে সঙ্গীতকৃতি হিসেবে খুব বড় কথা, তা নয়। তবে পেশাদার শিল্পীর পক্ষে প্রয়োজনীয় গুণ নিঃসন্দেহে। গহর জানকে মুজরো দিলে সে মহ্‌ফিল কখনো মার খায় না— উদ্‌যোক্তাদের এই বিশ্বাস অর্জন করাও একটি বিশেষ ক্ষমতা। সেদিক থেকেই কথাটি উল্লেখ করা রইল।

সঙ্গীত-জগতে তাঁর প্রকৃত পরিচয় ছিল রাগসঙ্গীতের আসরে। সেখানেও তিনি অসামান্য। বাইজীদের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয়া। অনেকের মতে, সামগ্রিকভাবে অর্থাৎ সব রীতির গানের নিরিখে গহর জান শ্রেষ্ঠা গায়িকা। সেকালে পেশাদার সম্প্রদায়ের বাইরে মহিলা গীতশিল্পীর তো অস্তিত্ব ছিল না। প্রকাশ্য আসরের গায়িকা মাত্রেই সমাজবহির্ভূতা সেই চিহ্নিত শ্রেণীর অন্তর্গতা। দু অর্থেই সঙ্গীত-ব্যবসায়িনী তাঁরা। সে মহলে গহরের স্থান ছিল অনন্য।

সাধারণ সঙ্গীতপ্রিয় এবং বোদ্ধা সকলেরই কাছে স্বীকৃত তাঁর গুণপনা। গীতে এবং নৃত্যে। গায়িকার তুল্য প্রসিদ্ধি তাঁর নর্তকী রূপেও। তাই দেখা যায়, সে যুগের রেকর্ড সঙ্গীতের পুস্তক তালিকায় তিনি 'নর্তকী গহর জান' নামে কথিত। তাঁর প্রতিকৃতিরও অনুরূপ পরিচিতি।

সেকালের সব প্রথম শ্রেণীর বাইজীর মতন গহর জানেরও নৃত্য-রীতি ছিল 'কত্থক' অঙ্গের। তিনি তা রীতিমত শিক্ষা ও চর্চা করেছিলেন। সমঝ্‌দার আসরে কত্থক নর্তকী তিনি।

আর রাগসঙ্গীতের জলসায় উচ্চ মানের খেয়াল টপ্পা ঠুংরি দাদরা গায়িকা। তেমন আসরে কিংবা ফরমায়েস হলে ধ্রুপদও শুনিয়ে দিতে পারতেন গহর জান। তা ছাড়া, কাজরী চৈতী লাউনী গানও দরকার হলে গাইতেন। সব ধরনের গানে ছিল তাঁর পেশাদার গায়িকার যোগ্য তৈয়ারি আর দক্ষতা। সে যুগের বাইজীদের নানা অঙ্গে নৈপুণ্যই ছিল রেওয়াজ। একটি কি দুটি রীতিতে বিশেষজ্ঞা হলে চলত না, পরবর্তীকালের গায়িকা গায়কদের মতন।

গহর জানের আরেকটি গুণের কথাও আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর শ্রোতাদের রুচি ও চাহিদা বোঝবার ক্ষমতা। অর্থাৎ তাঁর আসরসচেতনতা এবং সেই সূত্রে সাফল্য। সহজাত বুদ্ধিতে তিনি অনুধাবন করে নিতেন আসরের ধমনী। আর সেই অনুসারী গান শুনিয়ে বিজয়িনী হয়ে আসতেন। তৃপ্ত হতেন শ্রোতারা।

সেদিনকার মল্লিক বাড়ির মতন নাটকীয় দৃশ্য না হলেও গহর জানের নানা ধরনের আসর মাৎ করার দৃষ্টান্ত তাঁর সর্বভারতীয় সঙ্গীত-জীবনে ছড়িয়ে আছে। দু-একটির কথা বলা যায় এখানে।

সেবার বোম্বাইয়ের সেই জলসায় কিরকম সহজ সিদ্ধি তাঁর হয়েছিল। অথচ কোন ছাপ রাখতে পারেননি তাঁর চেয়ে এক বৃহত্তর প্রতিভাময়ী গায়িকা।

স্বয়ং জোহ্‌রা বাই তো সে আসরে এসেছিলেন। আগ্রার জোহ্‌রা বাই। শুধু খেয়াল গানের হিসাবে, তিনি সেকালের হিন্দুস্থানেই হয়ত অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী। দস্তুরমত ওস্তাদদের সামনেও আচ্ছা এলেম দেখাতেন জোহ্‌রা বাই। উত্তর ভারতের বড় বড় মহ্‌ফিলে তিনি মুজরো করতেন। শুধ্ খেয়াল গানের গ্রামোফোন রেকর্ড তাঁরই ছিল হয়ত সবচেয়ে বেশি। কি দাপটের সঙ্গে আসরে তিনি গাইতেন। যেমন তান বিস্তারে তেমনি তাল লয়ে তাঁর মুন্সীয়ানা।

বোম্বাইয়ের সে আসরেও জোহ্‌রা বাই গেয়েছিলেন নিজের উপযুক্ত মানেই। কিন্তু শ্রোতাদের মান আন্দাজ করতে পারেননি। আর তা গহর জান বুঝেছিলেন সঠিক। দুজনের গানের ফলাফল তাই আসরে হল দুরকম।

জোহ্‌রা বাই সেখানে আগে গাইছিলেন। তাঁর গানের পরেই গহরের পালা।

সে আসরটি তাঁর কাছে নতুন। সেখানে তিনি আগে কখনো মুজরো করেননি। তাই জোহ্‌রা বাই যখন গাইছেন, তিনি শ্রোতাদের দিকে লক্ষ্য করছিলেন অন্তরাল থেকে। অর্থাৎ শ্রোতারা

কি ধরনের। জোহ্‌রা বাঈয়ের গান তাঁরা কেমনভাবে গ্রহণ করছেন।

গহর জান দেখলেন, জোহ্‌রা গেয়ে চলেছেন চমৎকার। খুবই ভারি চালের বন্দীশ ধরেছেন। তান বিস্তারও করছেন উঁচু দরের।

কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে কোন ভাবান্তর নেই। কোন সাড়া জাগেনি তাঁদের মধ্যে। তাঁরা এদিক ওদিক চাইছেন। গল্পস্বল্প করছেন ফিসফাস করে। জোহ্‌রারও সেদিকে লক্ষ্য নেই। আর গহর দেখলেন—এমন সুন্দর খেয়াল মাঠে মারা যাচ্ছে সেই অযোগ্য আসরে।

শেষ পর্যন্ত জোহ্‌রার গানে যখন সমাপ্তির সম পড়ল, শ্রোতারাও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

সবই লক্ষ্য করলেন গহর।

এখানে জোহ্‌রা খেয়াল গাইবেন আর তাঁর পরেই তাঁকে গাইতে হবে জেনে গহর বিস্তারিত খেয়ালের জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছা ত্যাগ করলেন এখন।

জোহ্‌রার গানের পর তিনি আর খেয়ালের ধারেই গেলেন না। প্রথম থেকেই আরম্ভ করে দিলেন নাটকের গান। হিন্দী নাটকের জনপ্রিয় গান পর পর শোনাতে লাগলেন। এসব অনেক জানা ছিল গহর জানের।

আসরও জমে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। জোহ্‌রা বাঈয়ের অমন চমৎকার খেয়াল শুনেও যে শ্রোতারা এতক্ষণ নির্বিকার চিত্তে বসেছিলেন, এবার তাঁরা উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন। প্রতিটি গানের শেষে সাবাস জানাতে লাগলেন গহরকে। প্রশংসার হর্ষধ্বনি শোনা যেতে লাগল।

জমজমাট আসরে নাট্যসঙ্গীতগুলির শেষে গহর জান শোনালেন একটি ছোট খেয়াল। তিনিও যে খেয়াল গানের শিল্পী তার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিলেন। তানের বাহুল্যবর্জিত মধ্য লয়ের স্থায়ী আর

অন্তরাটি কেবল গাইলেন জমাটি করে। শ্রোতারা দিব্য উপভোগ করলেন।

জোহ্‌রার চেয়ে নিম্ন মানের গান শুনিয়েও আসর জিতে নিলেন গহর জান।

সদা সচেতন সদা সফল সদা তৈয়ার পেশাদার বাইজী।

তাঁর কলকাতায় স্টার থিয়েটারের জলসাটি আবার আরেক রকম। গহর জান সেদিন একমাত্র গায়িকা। সেজন্যেই আসর জমাবার দায়িত্ব অনেক বেশি। সম্পূর্ণ একার আসর। তাঁর গানের পরে আরম্ভ হবে অভিনয়।

তখনকার নাট্যমঞ্চে এমনি গান-বাজনার আসর মাঝে মাঝে হত। নামী ওস্তাদ বাইজীরা গান-বাজনা শোনাতেন নাটক দর্শকদের। তাঁদের আকর্ষণে সেদিন রঙ্গালয়ে অনেক বেশি জন-সমাগম হত।

গহর জানের তখন খুব নামডাক। তিনি একাই একশো। তাই থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ সেদিন কেবল তাঁরই আসর করেছেন।

পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগার। নির্ধারিত সময়ে এসেছেন গহর জান। তাঁর সঙ্গতকার যন্ত্রীরা যবনিকার অন্তরালে যন্ত্রের সুর বাঁধছেন। বাইজীর মঞ্চ-প্রবেশে কিছু বিলম্ব আছে সেজন্যে।

তিনি উইংয়ের পাশ থেকে দর্শকদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। বাংলা নাটকের অভিনয় হবার কথা। সুতরাং বাঙালীরাই উপস্থিত হয়েছেন নাটক দেখতে। তবু গহর জান একবার দেখে নিতে চাইলেন। শ্রোতা কারা। তাঁর নাম শুনে হিন্দীভাষীরা বেশি এসেছেন কিনা।

বাইজী দেখলেন—টুপি বা পাগড়িধারী নামমাত্র। সারি সারি চেয়ারে প্রায় সকলেই নাঙ্গা-শির বাঙালী। তাঁদের নিয়েই হল ভর্তি।

গহর জান প্রথম থেকেই বাংলা গান ধরলেন--

যদি নিমেষের দেখা পাই,

পাই হে তোমারি।

আঁচলে মুছাই যত বালাই তোমারি॥

গারা খাম্বাজের একখানি মধুর গান। তখনকার বাংলা গানের ভাল ভাল আসরে গানটির খুব চলন ছিল। পরিপাটি টপ্পা অঙ্গের গান।

গহর জানও অল্প অল্প গিট্‌কিরি দিয়ে গাইতে লাগলেন, বিলম্বিত যৎ তালে—

কত আর স'ব বল তোমারি বিরহানল,

কত দিন ভালবাসা লুকাই তোমারি॥

লাজ নয়নে চকিত চাহনি,

সে যে গো বিষম দায়,

যৌবনে বধে বা প্রাণ অবলা আমারি॥

যদি দীর্ঘশ্বাস বয় প্রাণ পাখী উড়ে যায়,

জনমে জনমে রব আশায় তোমারি॥

সেই প্রথম গানেই আসর জমে গেল। গহরের নিজেরও বেশ নাম ছিল এই গানে। এটি তিনি রেকর্ডও করেছিলেন। আরো অনেক আসরে গানটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন রাণাঘাটের বিখ্যাত গায়ক নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। আর তাঁর চেয়েও বেশি—তাঁরই যোগ্য শিষ্য নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গানের জগতে যিনি সুপরিচিত ছিলেন পদ্মবাবু নামে। যাঁরা শুনেছিলেন, তাঁদের স্মৃতিতে পদ্মবাবুর নামের সঙ্গে এই গানখানিও বেঁচে ছিল।

সেদিন গহর জান প্রথম গান থেকেই আসর জমতে দেখে স্থির করলেন বাংলা গান শোনানোই ভাল।

তখন আরেকখানি আরম্ভ করলেন—

যতনে গেঁথেছিলাম বকুল কুসুম মালা ··

এ গানটিও কলকাতার নানা আসরে তিনি শোনাতেন বাঙালী শ্রোতাদের। গানখানি তাঁর নিজের যেমন প্রিয় ছিল তেমনি শ্রোতাদের কাছেও প্রিয় করেছিলেন—

যতনে গেঁথেছিলাম বকুল কুসুম মালা।
পর' পর' গলায় পর', কোর না শ্যাম অবহেলা॥
আমি ব্রজবাসিনী, হীরা মোতি নাহি চিনি,
মরমে মরে আছি, সয় না বিরহ জ্বালা॥

স্টার থিয়েটারের শ্রোতাদেরও বড় ভাল লাগল গানটি। তার পরেই গহর ধরলেন নিধুবাবুর সেই বিখ্যাত গান—

যে যাতনা যতনে মনে মনে মনই জানে···

চমৎকার একটি বাংলা টপ্পার নমুনা নিধুবাবুর এই গানখানি। কথার তানের মধ্যে টপ্পার দানা দিয়ে দিয়ে গহর গাইতে লাগলেন—

যে যাতনা যতনে মনে মনে, মনই জানে।
পাছে শত্রু হাসে, লোক লাজে প্রকাশ করিনে॥
প্রথম মিলনাবধি যেন কত অপরাধী,
নিরবধি সাধি প্রাণপণে॥
তবু সে ত' নাহি তোষে,
আরো রোষে অকারণে॥
যে যাতনা যতনে মনে মনে···

শ্রোতারা ততক্ষণে মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন। আর গহর জান গেয়ে চলেছেন একটির পর একটি বাংলা গান।

দাদরা তালে একটি জিলা শোনালেন—

আজ কেন বঁধু অধর কোণেতে
লুকানো হাসির রেখা।
পরাণের হাসি চুরি কে করেছে
বল গো পরাণসখা॥

কেন শূন্য হাসি নেহারি,
ব্যাকুল চাহনি চমকি দিয়েছে
যা ছিল সরমে মাখা ॥
তার ছায়া পড়ে মরমে,
নিমেষে ফুরাল জনমের সাধ
বরষে বরষে আঁকা ॥
আজ কেন বঁধু অধর কোণেতে
লুকানো হাসির রেখা···

কাব্যসঙ্গীতের আবেদনে গানটি শ্রোতাদের হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠল।

তারপর গহর আরম্ভ করলেন কীর্তন অঙ্গের সেই প্রসিদ্ধ গান—

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী···

অনেক বাঙালী বাড়িতে এই গান শুনিয়ে শ্রোতাদের পরিতুষ্ট করতেন তিনি। এখানেও সকলে তেমনি উপভোগ করতে লাগলেন—

ও যার বিমল তটে, রূপের হাটে
বিকাত নীলকান্তমণি ॥
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলি,
কোথা সে ললিতা সখি সুহাসিনী,
কোথা শ্যাম রাসবিহারী বংশীধারী,
বামেতে রাই বিনোদিনী ॥
(যমুনে) এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী···

এমনিভাবে গান শুনিয়ে দিলেন গহর জান। তারপর তাঁর সেই বহু-আসর-মাৎ-করা ভজন-গীতিটি গেয়ে মধুরে সমাপন করলেন—

রাধা কৃষ্ণ বোল্ মুখ সে রাধা কৃষ্ণ বোল্।
তেরা কেয়া লাগো গে মোল্ ॥

হাত পাও না হিল্ না,
দশ্ বিশ্ কো শুনাহি চল্ না,
কুছ্ গিরাহা গাঠ নাহি ছুট্ না,
তেরা মন্ কি ঘুন্ডি খোল্॥···
মুখ সে রাধা কৃষ্ণ বোল্···

প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত শ্রোতাদের অন্তর রণিত হয়ে উঠল গায়িকার সুরে সুরে।

স্টার থিয়েটারের সেই আসরের স্মৃতি সেদিনকার অনেকে তাঁদের বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মনে রেখেছিলেন।

গহরের গায়িকা-জীবন এমনি নানা সার্থকতা সুখে ভরা। কোন বাংলা গানের আসরেও তিনি ব্যর্থ হতেন না।

বাঙালীদের মধ্যে তাঁর তুল্য জনপ্রিয়তা পাননি অন্য কোন অবাঙালী বাইজী।

কলকাতায় গহর জানের অন্তরঙ্গদের মধ্যে একাধিক বিখ্যাত ও অখ্যাত বাঙালী ছিলেন, একথাও এখানে বলে রাখা যায়। ধনী বাঙালীদের ঘরোয়া আসরেও প্রচুর মুজরো করতেন তিনি। আর রবীন্দ্রনাথের গান (অবশ্য বাইজীর নিজস্ব ধরনে) থেকে টপ্পা কীর্তন ইত্যাদি সব রকমের বাংলা গান গেয়ে সর্বপ্রকার শ্রোতাদের চিত্ত-বিজয়িনী হতেন।

বেশ কখানি রেকর্ডও তিনি করেছিলেন বাংলা গানে—

(১) হরি বলে' ডাক্ রসনা এই বেলা রে (গৌরী, একতালা)।
(২) ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল (জিলা, দাদ্‌রা)।
(৩) যদি নিমেষের দেখা পাই (গারা খাম্বাজ)।
(৪) আজ কেন বঁধু অধর কোণেতে (জিলা, দাদ্‌রা)।
(৫) যে যাতনা যতনে (সিন্ধু, মধ্যমান)।
(৬) না জানে না জানে প্রাণ···।
(৭) তোমারি বিরহ সয়ে···। ইত্যাদি

(তাঁর একটি হিন্দী গানেরও রেকর্ড আছে—তো সে বচন দে ম্যয় হারি বাল্‌মা—দাদ্‌রা।)

তবে বাংলা গানই গহর জানের সঙ্গীতজীবনের পরিচায়ক হয়। তাঁর গায়ন প্রতিভার মাধ্যম ছিল রাগসঙ্গীত। সেইসব আসরের জন্যেই সঙ্গীতজগতে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। খেয়াল টপ্পা ঠুংরি দাদ্‌রা থেকে কাজরী লাউনী চৈতী ভজন সব রীতির গানে সপ্রতিভ শিল্পী। আর, আসরে আসরে ক্বচিৎ দেখা রূপতনু। সৌন্দর্যময়ী ব্যক্তিত্ব।

সেই মল্লিক বাড়ির আসরের সময় তাঁর যে পাঁচশো টাকা মুজরো ছিল, পরে তা উঠেছিল এক হাজার টাকায়। ১৯১৮-২০ সাল থেকে, কলকাতায় একটি মাত্র আসরের জন্যে।

রাগসঙ্গীতের যে কলাবতী গায়িকা তিনি হয়েছিলেন, তার ভিত্তিতে ছিল রীতিমত শিক্ষা। বাইজী হবার জন্যে অল্প বয়স থেকেই ভাল তালিম তিনি পেয়েছিলেন। আর তৈরি হবার পরও শিক্ষা-সংগ্রহ করতেন নানা সূত্রে—সুযোগ মাত্র, বরাবর। নামী বাইজী হয়ে যখন ভারতের প্রদেশে প্রদেশে আসরের পর আসর মাৎ করে যেতেন, তখনো তাঁর সঞ্চয়ের কাজ চলত। সংগ্রহ করে নিতেন তেমন তেমন গুণীদের সান্নিধ্যে এলে। সত্যিকার শিল্পী-চিত্ত যেমন সদা-সঞ্চয়ী হয়ে থাকে।

তবে পদ্ধতিগত শিক্ষা তিনি কাশীর ওস্তাদ বেচু মিশ্রের অধীনেই পেয়েছিলেন। আর তার অনেক পরে, বাইজী ব্যবসায়ে যখন সুপ্রতিষ্ঠিতা, গোয়ালিয়রের স্বনামধন্য গণপৎ রাওয়ের কাছে কিছু পরিমাণে। আরেক জনের নিকটেও ছিল তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত শিক্ষাপর্ব—তিনি হলেন (পাতিয়ালার) খেয়াল-গুণী কালে খাঁ। সে নাটকীয় কথা, পরে।

ভাইয়া সাহেব নামে প্রসিদ্ধ গণপৎ রাওয়ের সঙ্গে গহর জানের পরিচয় কলকাতায়। বিশ শতকের সেই প্রথম দিকে ভাইয়া সাহেব

এ শহরে আসতেন। শিষ্য সেবক পরিবৃত হয়ে থাকতেন সঙ্গীতের নিত্য আবহে। গহর জানও তাঁর সঙ্গীত-সঙ্গ লাভ করতেন। গণপৎ রাও কলকাতায় বেশি অতিথি হতেন শেঠ দুলিচাঁদের বাগান-বাড়িতে, দমদমায়। আরো কটি জায়গায়। গহর তখন তাঁর কাছে শিক্ষা সংগ্রহ করতে যেতেন।

আর বারাণসীর বেচু ওস্তাদের কাছে তালিম পেয়েছেন একেবারে প্রথম জীবনে। আসলে সেই শিক্ষাতেই গহরের সঙ্গীতজীবন গড়ে ওঠে। কাশীর নাম-করা ঘরানাদার বেচু ওস্তাদ—তাঁদের বংশই সঙ্গীতাচার্যের। নানা বাইজী আর নামী গাইয়ে বাজিয়ে সঙ্গীত ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছেন, এই মিশ্র ঘরের তালিম পেয়ে। এ বংশের নানা গুণীর মতন বেচু ওস্তাদও খেয়াল টপ্পা গান আর সারঙ্গ যন্ত্রের সাধক। খেয়াল টপ্পা ঠুংরি দাদ্‌রা শিক্ষায় ছাত্রী-ছাত্র তৈরি করে দেন বেচু ওস্তাদ। কাশীর কবীর চৌরার বিখ্যাত ওস্তাদ বুদ্ধু মিশ্রের পুত্র আর ঠাকুর প্রসাদের অগ্রজ তিনি।

বেচু ওস্তাদ কলকাতাতেও থাকেন। তাঁর কাছে গহর শেখেন কলকাতায়, আর কাশীতেও হয়ত। বেচু ওস্তাদের শিক্ষা পাবার ফলে গহর জানের সঙ্গে তাঁদের পরিবারেরও যোগাযোগ ঘটে। বিশেষ, বেচু ওস্তাদের দ্বিতীয় পুত্র গৌরীশঙ্কর মিশ্রের সঙ্গে। গৌরীশঙ্করের পেশাদার জীবন বেশির ভাগ কলকাতাতেই কেটেছিল। তিনিও গুণী সারঙ্গ-বাদক আর কলকাতার কয়েকজন নামী বাইজী ও অন্যান্যের শিক্ষক। গৌরীশঙ্কর পরিচিত ছিলেন ওস্তাদ বলেই।

সেই গৌরীশঙ্কর মিশ্র হলেন গহর জানের প্রধান সারঙ্গী। কলকাতায় বা পশ্চিমে গহর যত আসরে গান গেয়েছেন, তার বেশির ভাগ আসরে গৌরীশঙ্কর ওস্তাদই সারঙ্গ সঙ্গত করতেন। বাইজীর দু দিকে দুই সারঙ্গীর মধ্যে ডাইনের বাজিয়েকে ধরা হয় বেশি ইজ্জতদার বা এলেমদার। গহর জানের সেই দক্ষিণের সারঙ্গ-বাদক গৌরীশঙ্কর, তাঁর ওস্তাদ বেচু মিশ্রের সন্তান।

রাগসঙ্গীতের আসরে গহর জান বসতেন বাইজীর সম্পূর্ণ সাজে। দুধারে দুই সারঙ্গী সুরের সঙ্গতকার। ডাইনে ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর আর বাঁয়ে (পাটনার) এম্‌দাদ খাঁ। তাঁদের পেছনে বসতেন তবল্‌চী। সেসব আসরে হারমোনিয়ম সঙ্গত সচরাচর তিনি রাখতেন না। বাংলা গানের আসরে কিংবা গ্রামোফোনে রেকর্ড করবার সময় তাঁর সঙ্গে বাজত হারমোনিয়ম। তাঁর কোন কোন রেকর্ডের গানে হারমোনিয়ম বাজিয়েছেন তখনকার বিখ্যাত হারমোনিয়ম-বাদক বসির খাঁ। ওস্তাদ গণপৎ রাওয়ের একজন কৃতী শিষ্য বসির খাঁ স্বনামধন্য মৌজুদ্দিনের অনেক আসরেও হারমোনিয়ম সঙ্গত করেছেন। মৌজুদ্দিনের একজন বন্ধুলোকও তিনি।

গহর যে নানা ভাষায় গানের চর্চা করতেন, তাও বাইজী পেশার সাফল্যের জন্যে। আর বাইজীদের মধ্যে ইংরিজী গানও তিনি সবচেয়ে বেশী জানতেন। সাহেব মাস্টারের কাছে তিনি শেখেন লেখাপড়া, কথাবার্তা। মেম সাহেবদের সঙ্গে সমানে কথোপকথন করতে পারতেন। তাঁর ইংরেজী কথার সামান্য চিহ্ন রয়ে গেছে কোন গ্রামোফোন রেকর্ডে। তাঁর 'যদি নিমেষের দেখা পাই' রেকর্ডটিতে গানের শেষে ভেসে আসে স্বকণ্ঠে ঘোষণা—'মাই নেম ইজ গহর জান। মাই হারমোনিয়ম প্লেয়ার ইজ বসির খান। মাই তবলা প্লেয়ার ইজ লড্ডন খান···।'

ইংরিজী গানের কথায় বলে রাখা যায়, কলকাতার গভর্ণমেণ্ট হাউসে তাঁর একাধিকবার আসর হয়েছিল। আর একবার বিলাতেও গিয়েছিলেন মুজরো করতে, যে বিষয়ে বাইজীদের মধ্যে হয়ত তিনি অদ্বিতীয়া।

ইংরিজীর দিকে গহরের প্রবণতা ছিল জন্মসূত্রেই। সেসব অনেক কথা, পরে বলবার।

তবে ইংরিজী গান যে ভাণ্ডারে রাখতেন, তা ব্যবসায়িক কারণে। তখনও দোর্দণ্ড প্রতাপে এদেশে ইংরেজ রাজত্ব চলছে। কলকাতায়

সাহেবদের কি বোল্‌বোলাও তখন। সে সমাজেও গতায়াত ছিল গহর জানের। কোন কোন রাজপুরুষেরও নেকনজরের অধিকারিণী। মেম সাহেবদের পার্টিতেও মুজরো হত তাঁর। তা ছাড়াও, এ-দেশীয় ব্যবসায়ীরা অনেক সময় এমন জলসা করতেন, সেখানে বিশিষ্ট সম্মানিত অতিথি সাহেব-সুবোরা। তাঁদের ইংরিজী গান শুনিয়েও গহর জান খুশি করে নিতেন। ইঙ্গ মহলে তাই গহরের কদর ছিল ইংরিজী গানের জন্যে।

আর সাধারণ সঙ্গীতপ্রিয় বাঙালী ধনীদের মধ্যে বাংলা গানের কল্যাণে গহর জানের সমাদর ছিল। শুভ উৎসবে, পার্বণে, নানা উপলক্ষ্যে তিনি আসতেন গান শোনাতে। সেজন্যেও অনেক বাংলা গান শিখেছিলেন, সংগ্রহে রাখতেন। আর ভালও বাসতেন বাংলা গান। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। তবে রবীন্দ্র-নির্দিষ্ট সুরে সেগুলি গাইতেন না বটে। নিজের দেওয়া সুরে ওস্তাদী ঢঙের হত সেসব রবীন্দ্র-সঙ্গীত। যেমন সেকালের অনেক গায়ক-গায়িকারাই রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন নিজেদের ইচ্ছা মতন সুরে আর ধরনে। গ্রামোফোন রেকর্ডে তার অনেক নমুনাও ধরা আছে। যেমন মানদাসুন্দরী, কৃষ্ণভামিনী, পূর্ণকুমারী, ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী প্রমুখের গান।

গহর জান রবীন্দ্রনাথের কোন গান রেকর্ড করেননি। কিন্তু গাইতেন বাংলা গানের আসরে। 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না পথের শুকনো ধূলি যত' গানখানি তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। তবে গাইতেন 'কেন চোখে-এ-এ-এর জলে' এমনি ভঙ্গীতে। তাঁর পরের যুগে ইন্দুবালাও যে গানটি ওই ঢঙে গেয়েছেন তা গহরেরই শুনে শেখা।

রবীন্দ্রনাথের রচনা গান যে তাঁরই নির্দেশিত সুরে, ভাবে, রীতিতে পরিবেশন করতে হবে, গহর জানদের সময়ে এমন সংস্কার গড়ে ওঠেনি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভাষার অপূর্বত্ব আকৃষ্ট করত গায়ক-

গায়িকাদের। আর তাঁরা আপন আপন সাঙ্গীতিক শিক্ষা এবং/বা প্রবণতা অনুযায়ী সুরে, ধরনে গাইতেন সেসব গান। তেমনি একজন গহরও।

তাঁর বাংলা উচ্চারণের কথাও এখানে বলে রাখা যায়। গহরের মুখে বাংলা কথাবার্তায় ঈষৎ টান থাকলেও বোঝা যেত না গানের বেলা।

বাইজীর স্বভাবে নানা বিপরীতের মিশ্রণ ঘটেছিল।

যেমন আসর-সচেতন তেমনি আত্মসচেতন গহর জান। গুণ বিচারের আগে শ্রোতারা যে দর্শন-ধারিণীতে মুগ্ধ হয়েছেন, এ বোধ তাঁর থাকত।

অথচ, সর্ববিষয়ে এত সাফল্য সত্বেও ঠিক অহমিকা ছিল না তাঁর অন্তরে। বরং সরলতা ও উদারতা ছিল, বলতে হয়। তা বোঝা যায় তাঁর গান শেখাবার কথায়।

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দুজনকে অল্পবিস্তর শিখিয়েছেন। তখন তিনি বাইজী মহলের শিখরে। নামডাক মুজরো যশ সবেতেই সবার ওপরে। কিছু তাঁর কাছে বিনা মূল্যে শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন অনাথনাথ বসু আর ইন্দুবালা। দুজনেরই তখন কিশোর বয়স। সঙ্গীতজগতে কোন পরিচিতি নেই, অখ্যাত তো বটেই। দূর যশোরের সন্তান অনাথনাথ গান শেখার অদম্য প্রেরণায় কলকাতায় এসে রয়েছেন। বয়স হয়ত ১৬-১৭ বছর। শুনে-শেখা-গান শোনান শেঠ দুলিচাঁদের দমদমার বাড়িতে। খুশি হয়ে আপনা থেকেই তাঁকে গান শেখাবার কথা গহর জান বলেন। অনাথনাথ তাঁর বাড়ি গিয়ে শিখেছিলেন কখানি গান।

আর ইন্দুবালা গহরকে প্রথম দেখেন ওস্তাদ গৌরীশঙ্করের বাড়িতে। গৌরীশঙ্কর জন্মাষ্টমীতে সারারাত গান বাজনার আসর বসাতেন। জোড়াসাঁকোতে তাঁর ছোট ভাড়াটে বাড়িটিতে অনেক

বড় বড় গুণী গাইতেন বাজাতেন সেদিন। গহর জানও তাঁদের একজন।

ইন্দুবালা তখন গৌরীশঙ্করের কাছে শিখতে আরম্ভ করেছেন মাত্র। বয়সে ১৫-১৬ বছর। ওস্তাদজীর কথায় ইন্দুবালা সেবার জন্মাষ্টমীর আসরে গাইলেন।

সামনেই বসেছিলেন গহর জান।

গানের পরে ইন্দুবালাকে কাছে ডেকে আলাপ করলেন। গানের সুখ্যাতি করে নিজের বাড়ি যেতে বললেন, 'আমার বাড়িতে এসো। তোমায় গান শেখাব।'

গহর জান তখন থাকতেন তাঁর ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ঠিকানায়। ইন্দুবালা সেখানে মাঝে মাঝে যেতেন। গান শিখতেন তাঁর কাছে।

গহর ব্যবহারও বড় ভাল করতেন। তখন তাঁর অত সম্মান, উপার্জন। কিন্তু অহঙ্কার কোথায়? নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করে গান শেখাতেন ইন্দুবালাকে। বিরক্তির লেশ নেই।

আবার এক-একদিন বাংলা গান শুনতে চাইতেন ছাত্রীর কাছে। বাংলা গান যে কত ভালবাসতেন তখন তা বোঝা যেত।

গহর জান বলতেন, 'গাও তো, আর কি বাংলা গান জানো।'

ভাল লাগলে, সেটি আবার ছাত্রীর কাছে শিখেও নিতেন। এ ব্যাপারেও ছিল না অহমিকা।

একদিন ইন্দুবালার মুখে শুনলেন এমনি একখানি বাংলা গান। বিদ্যাসুন্দর পালার—

শোন রাজকুমারী হাতে ধরি
প্রাণে দিও না আর ব্যথা।
(ধনি) কথা শোন, চেয়ে দেখো,
আজকে কেমন মালা গাঁথা॥
যে জন্যে হয়েছে বেলা,
জানতে যদি সেসব জ্বালা,.

খুলে দেখলে ফুলের মালা,

অমনি ঘুরে যাবে মাথা ॥

ভৈরবীতে বাঁধা এই গানখানি গহরের ভারি ভাল লাগত।

মাঝে মাঝেই ইন্দুবালাকে বলতেন, 'সেই ফুল্‌কা গানাটা গাও তো।'

তারপর একদিন ইন্দুবালার মুখে শুনে শুনে নিজেই শিখে নিলেন—'শোন রাজকুমারী হাতে ধরি, প্রাণে দিও না আর ব্যথা...।'

এই গহর জানেরই আবার অন্য কত রূপ। আলোছায়ার কুহেলিকায় কত বিচিত্ররূপিণী। শিল্পী-সত্তার সঙ্গে কি অদ্ভুত স্বৈরিণী।

গহরের অনুরক্ত কি শুধু সঙ্গীতের আসরে? ঝলমলে আলোর আড়ালে সে যেন অন্য লীলাময়ী। বহরমপুর থেকে বোম্বাই, কলকাতা থেকে দার্জিলিঙ—কত যে বিলাস-বিচিত্রা। প্রবৃত্তির পুত্তলিকা।

বহরমপুরের সেই গহর-বিধুর সেন মহাশয়। এদিক থেকে বহরমপুর যেন মুর্শিদাবাদেরই অঙ্গ। তিন-চার ক্রোশ কাছের নবাবী হাওয়া বহরমপুরেও বয়ে যায়। সেন মশায়ের সঙ্গে তখন বাইজী শিরোমণির বড় সুখের সম্পর্ক।

তাঁর তন মন ধন্য করে নটী রয়েছেন বহরমপুরে। বিলাসিনী অতিথি হয়ে।

একদিন গহর-সকাশে এসে সেন মশায় দেখেন, বল্লভার মুখ ভার। অপাঙ্গে কুঞ্চিত ভ্রু-যুগল।

দেখেই তাঁর ব্যাকুল প্রশ্ন, 'কি হয়েছে, জান?'

'বড় মাথা ধরেছে।'

'তাই তো, কি মুশকিল,' বিচলিত হয়ে পড়লেন সেন মশায়,—'হঠাৎ মাথা ধরল কেন?'

'এখনো চা আসেনি।' কারণটি কি ভাগ্যে তিনি বুঝেছিলেন!

'অ্যাঁ? কেন চা হয়নি?'

'জল গরম করা যায়নি বলে।'

'এই কথা?'

তৎক্ষণাৎ হুকুম মাফিক কেটলিতে জল চাপানো হল। মহাশয়ের পকেটে ছিল একতাড়া নোট। সেই বাণ্ডিল বার করে দেশলাই দিয়ে ধরালেন। নোটের কেতা জ্বলতে জ্বলতে গরম হয়ে উঠল চায়ের জল। এবার চা তৈরি হল আর তা সেবন করে গহুরের ভ্রু-জোড়া জ্যা-মুক্ত হয়ে উঠল। হাসি ফুটল নগর-বধূর অধরকোণে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সেন মহাশয়।

এমনি কত পর্ব ছড়িয়ে আছে নটীর নেপথ্য জীবনে। কোথাও আবার কুহেলিকাময়ী।

আবার বোম্বাইতে শেঠজী কি আরামের আশ্রয় সেবারাণীকে দিয়েছিলেন! কিন্তু মন বসল না গহরের।

নিজের বিপর্যস্ত অবস্থা সত্ত্বেও সে লোভনীয় পরিবেশ ছেড়ে চলে এলেন।...

আবার দার্জিলিঙে আরেক মোহময়ী। প্রবৃত্তির অবিবেকী পুতুল যেন।

এক সঙ্গীতপ্রেমী ধনাঢ্যের বরণীয়া গায়ন-শিল্পী হয়ে তখন দার্জিলিঙে এসেছেন। অবস্থান করছেন তাঁর রমণীয় অতিথি-আবাসে।

মহতী শিল্পীরূপেই সকলের সামনে পরিচিতা করেছেন নিজেকে। সেই শৈলাবাসের তুহিন শীতলতার মধ্যেও অনলস সঙ্গীতসাধিকা। ঊষাকালে হিমকুহেলী বিদীর্ণ করে তাঁর গীত-কণ্ঠ কক্ষ থেকে সকলের কানে ভেসে আসে। নিষ্ঠাবতী গায়িকার প্রভাতী রাগ অনুরাগীরা শোনেন উৎকর্ণ হয়ে। কদিনের মধ্যেই গহর জান সে নিরালা এলাকায় সাড়া জাগান।

কিন্তু অপরাহ্নে তাঁরই সঙ্গীত-ভক্তদের চোখে পড়ে এক বিসদৃশ ব্যাপার। বাইজীর খাস কামরায় এক যুবক হাজিরা দেয়।

একদিন নয়, প্রত্যহ।

কদিনেই হৈচৈ হয়ে যায় ঘটনা নিয়ে। তরুণের আসা-যাওয়া বন্ধ করতে হয় গহরকে। আর নির্ধারিত সময়ের আগে দার্জিলিঙও ত্যাগ করতে হয়েছিল।

এ হল ১৯২৪ সালের এক ছায়াচ্ছন্ন সমাচার। নটী তখন খ্যাতি-প্রতিপত্তির শীর্ষে আসীনা এবং প্রায় পঞ্চাশটি বসন্তের ভোগবতী।

অথচ তার কত বছর আগেও দেখা গেছে আরেক স্বভাব। সে এক সমুজ্জ্বল সংবাদ বাই সাহেবার গহিন মনের। অন্য রূপের। অন্তর কন্দরের এক পরম রহস্য। এটিও তাঁর বাইজী জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ের কথা।

তখন তাঁর ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের বাড়িতে থাকেন। গ্রীষ্মবেলার এক অলস অবসরক্ষণ। গহর জান দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম করছেন নিভৃত কক্ষে, হয়ত তন্দ্রাজড়িত।

এমন সময়ে ক'টি কলেজের ছাত্র তাঁর বহির্কক্ষে এসে দাঁড়াল। অনেক আশা নিয়ে তারা নিরিবিলিতে এসেছে, অনেক ভরসা করে। গহর জানের গান সামনে বসে শুনতে চায়।

বেয়ারাকে দিয়ে তারা খবর পাঠালে—তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে।

খানিক পরে প্রসাধিতা বাইজী সে ঘরে এলেন।

সসম্ভ্রমে তারা অভিবাদন জানালে তাঁকে। গহর জান সুদৃশ্য কৌচে বসে এক নজরে তাদের দেখে নিলেন। মুখভাব আরো গম্ভীর হল হয়ত।

অতিথিরা উপযুক্ত ভাষার অভাব বোধ করে তখনো নির্বাক। সঙ্কুচিত আর কিঞ্চিৎ সন্ত্রস্তও যেন।

বাই সাহেবাও কিছু উচ্চারণ করলেন না। তবে চন্দ্র-ললাটে প্রশ্নের নিশানা হল ঘন-কৃষ্ণ টানা ভ্রূ দুটিতে।

ছাত্রদের মুখপাত্র অনেক সাহস সঞ্চয় করে বললে, 'আমরা

আপনার গান শুনতে এসেছি। আপনার উপযুক্ত না হলেও একেবারে খালি হাতে আমরা আসিনি।'

জিজ্ঞাসার অভিব্যক্তিতে কৌতুকের ভঙ্গিমা ফুটে উঠল আয়ত আঁখিপটে। ভূয়োদর্শিনী আরেকবার অভ্যাগতদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। নিতান্ত তরুণ এবং স্পষ্টতই ধনী-নন্দন। সরলতার মধ্যেও মুগ্ধ, প্রায় বিহ্বল ভাব সুপ্রকট।

কচি ক'টিকে গহর জান তখন যথেচ্ছ বধ করতে পারতেন, নিজের কাঞ্চনমূল্য জানিয়ে। রঙ্গিনীর রঙ্গভঙ্গে বিধ্বস্ত করবার প্রলোভনও মনে জাগতে পারত। কিংবা সরাসরি বিতাড়িত করলেও অস্বাভাবিক দেখাত না—বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে অনাহুত আহাম্মকরা।

কিন্তু বিচিত্র-চরিত্রা তার কোনটাই করলেন না। বরং বিনা দক্ষিণায় গান শোনাতে সম্মত হলেন, সেই অসময়ে। আপত্তি অনিচ্ছার কোনপ্রকার ভাব না দেখিয়ে।

মোনালিসা-হাসির আভাস দিয়ে বললেন, 'ওয়েল ইয়ংমেন, লিস্‌ন্ এ ফিউ সঙ্‌স্। বাংলা গান তোমাদের শোনাব। বাট্…

কৃতার্থ ছাত্রদের এবার সন্দিগ্ধ, খানিকটা ভীত করে দিয়ে বাইজী জানালেন, 'বাট, বিফোর দ্যাট, গিভ মি ইয়োর গার্ডিয়ান্‌স্ নেম্‌স্ অ্যাণ্ড অ্যাড্রেসেস।'

আশ্চর্য হয়ে গেল, ভয়ও পেয়ে গেল তারা। অভিভাবকদের নাম-ঠিকানা চাইবার উদ্দেশ্য কি? হতবুদ্ধি হয়ে তারা ইতস্তত করতে লাগল।

'হারি আপ, ইয়ংমেন।'

তাদের সেসব লিখে দিতেই হল, গান আরম্ভ করার আগে।

তারপর গহর জান কথা রাখলেন। কখানি বাংলা গান শোনালেন অর্বাচীন শ্রোতাদের।

তাঁর সামনে বসে গান শুনে, তাঁকে এত কাছ থেকে দেখে তারা পরম পুলকিত, আপ্যায়িত হয়ে গেল।

গানের শেষে গহর জান উঠে দাঁড়ালেন। তাদের দিকে ফিরে স্পষ্ট ভাষায় এবার জানালেন বক্তব্য, 'লুক্ হিয়ার, ইয়ং মেন্। আর কোনদিন বাইজীর বাড়ি গান শুনতে এস না। সাবধান করে দিচ্ছি। যদি কখনো বাইজীর বাড়ি আস, তোমাদের গার্ডিয়ানদের চিঠি লিখে জানিয়ে দেব। মাইণ্ড্ ইউ। গুড বাই।'

দুরু দুরু বুকে পালিয়ে বাঁচল বেচারিরা। সত্যিই তারা পরে আর কোন বাইজীর বাড়ি যায়নি। সেদিন তাদের মোক্ষম শিক্ষা দিয়েছিল গহর জানের ব্যক্তিত্ব।

সেই অভিন্ন বাইজী আবার নৃত্য-সঙ্গীতের আসরে আসরে কি লাস্যময়ী নৃত্যের ছন্দে, সুরের ঝঙ্কারে উচ্ছলিতা।

আর জলসার নেপথ্যে অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আরেক মোহময়ী।

সব অর্থেই বিলাসিনী গহর জান। যত উপার্জন তত সম্ভোগ। ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ফিরিঙ্গী পাড়ায় কিংবা কলুটোলায়। বাস যখন যেখানেই হোক, তাঁকে ঘিরে থাকে ঐশ্বর্য আড়ম্বর। যে বাড়ির যে কক্ষে আসর বসে, অতিথি অভ্যাগতদের জন্যে তার সর্বত্র মূল্যবান আসবাবপত্রে সুরুচিসম্মত সাজানো। বাইজীর আহার-বিহার পোশাক-পরিচ্ছদ দৈনন্দিন কেতা প্রসাধন আপ্যায়নের সমস্ত প্রকরণই উচ্চ মানের।

তাঁর বিচরণের সমাজে এবং সঙ্গীতের আসরে সাজসজ্জা অলঙ্কারে সৌখীনতার সীমা নেই। উপকরণও বহুমূল্য। আভরণে ভূষিতা হন একেকদিন এক এক প্রকারে। সোনার গহনার মধ্যে সেদিন আর জহরতের প্রক্ষেপ থাকে না। জড়োয়ার সাজেও কোনদিন চুনীর সেট্, কোনদিন পান্নার। মুক্তামালার কণ্ঠহার থেকে বাজুবন্ধ যেদিন শুভ্র আভাময় হয়ে ওঠে, সেদিন আর হীরকের দ্যুতি বিকীরণ নয়। যত সম্পদ তত রুচি-সম্পন্না।

অর্জনের প্রাচুর্যে বিষয়সম্পত্তিও হয়ে যায় বিস্তর। ফ্রী স্কুল স্ট্রীট

আর চিৎপুর রোডে ছাড়াও কলকাতার নানা অঞ্চলে আরো কখানি বাড়ি।

গহর জানের একটি দ্রষ্টব্য সখ, স্বয়ং জুড়ি গাড়ি চালানো। নিজের ঝকঝকে ফিটনের রাশ হাতে তিনি বিকেলে বায়ুসেবনে বেরিয়েছেন, গাড়ির পেছনে উর্দি-পরা সহিস দাঁড়িয়ে। সে এক দৃশ্য দেখত তখনকার পথচারীরা। প্রকাশ্য রূপসীর গাড়ি চলেছে চিৎপুর রোড পার হয়ে ময়দানের দিকে। কিংবা ফ্রী স্কুল স্ট্রীট থেকে এস্‌প্ল্যানেডে।

সেকালের কলকাতায় সে দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়-রহিত। তাঁর সব ঘটা-পটা নিয়ে গহর জান জীবিতকালেই প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে তাঁর হাওয়া খাওয়া নিয়ে অনেক গল্পকথাও ছড়িয়ে ছিল—তাঁর সময়ে, আর পরেও। তাঁর আসল গুণের চেয়ে লোকে এইসব কথা বেশী শুনত, জানত।

বাই সাহেবার সেই মহা ধুমধামের পর্বে কলকাতায় এলেন ওস্তাদ কালে খাঁ। তখনকার এক অতুলনীয় কলাবৎ, খেয়াল-গায়ক কালে খাঁ। পাতিয়ালার এক গুণী পরিবারের মানুষ। পরবর্তীকালের বিখ্যাত বড়ে গোলাম আলীর কাকা তিনি। গোলাম আলীর প্রথম জীবনের প্রধান ওস্তাদও।

পাতিয়ালা থেকে দিল্লী লক্ষ্ণৌ কানপুর হয়ে সেবার কালে খাঁ কলকাতায় এলেন। গুণীজনের দরাজ পোষক শহর এই কলকাতা। তাবৎ পেশাদার কলাবৎকেই এখানে আসতে হয়। খাঁ সাহেবেরও বেশিদিন থাকবার ইচ্ছা ছিল কলকাতায়।

গহর জান সেসময় কলুটোলার গৃহে নিবাসিনী। নাখোদা মসজিদ ও তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীটের মাঝামাঝি, চিৎপুর রোডের পূর্বধারে। ট্রাম রাস্তার ওপর, পশ্চিমমুখী বারান্দাওয়ালা বৃহৎ বাড়ি—তাঁরই নামাঙ্কিত 'গউহর বিল্ডিং'।

বহিরঙ্গ জীবনে যেমনই হোন, অন্তরে যথার্থ শিল্পী-চিত্ত গহর

জান। সঙ্গীতকলার সেবিকা। কলাবন্তের গুণগ্রাহিকা। সঙ্গীতচর্চায় নিষ্ঠাবতী, নিরহঙ্কার, চিরশিক্ষার্থিনী। দুর্লভ সঙ্গীতবিদ্যার পরিচয় পেলে সম্মান জানাতেও দ্বিধা নেই। সম্ভব হলে তা আত্মস্থ করতেও প্রস্তুত, সজীব শিল্পী-প্রাণ।

খেয়াল গানের মহা গুণী কালে খাঁ কলকাতায় এসেছেন। তান কর্তব্, বাঢ়ৎ বিস্তারের অসামান্য কলাকার তিনি। তাঁর কাছেও কিছু শিক্ষা সংগ্রহের বাসনা করলেন গহর জান।

সুতরাং সে বন্দোবস্ত ভালভাবে হল। কালে খাঁর আশ্রয় নেবার মতন বেশি ডেরা বা আলাপী নেই কলকাতায়।

তাই চিৎপুর রোডের সেই চক্ মেলানো গউহর বিল্ডিঙের একটি ঘরে খাঁ সাহেবের আস্তানা হল।

খুশ্ মেজাজে বহাল তবিয়তে তিনি রইলেন নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। দিন ভালই যায়। এমন সেরা বাইজী গান নেন তাঁর কাছে। তাঁকে খাতির জানান। ওস্তাদ বলে তাঁর সঙ্গীত-সঙ্গ লাভ করতে চান।

খেয়ালের কলাবৎ কালে খাঁ স্বভাবেও খামখেয়ালী। সুর আর ভাবরাজ্যের মানুষ। বাস্তব জগতের হ্রস্ব-দীর্ঘ বোধ ঠিক ঠিক ছিল না। অকৃতদার, পরিণত-বয়সীর এতকাল ধ্যানজ্ঞান ছিল রাগের রূপ আর বিস্তারের কলাকৌশল ইত্যাদি। অন্য কোন রূপের দিকে দৃষ্টি দেবার ফুরসৎ মেজাজ বা হয়ত সুযোগও মেলেনি। কিন্তু অবচেতনে ক্ষুধার্ত ছিল অন্তর।

গহরকে এমন ঘনিষ্ঠ পরিবেশে দেখতে দেখতে খাঁ সাহেবের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল। সঙ্গীত-সঙ্গের অতিরিক্ত কামনায় কাণ্ডজ্ঞান হারালেন একদিন।

অনন্তযৌবনীকে নিবেদন করে ফেললেন, 'তুমি আমার দিল্ ভরিয়ে দাও। আমি তোমার দিল্ ভরে গানা দেব।'

প্রতিক্রিয়া ঘটল ঝঞ্ঝাবাতের বেগে।

বেওকুফ! বেওকুফ! বামন হয়ে চাঁদে হাত!

ফলাফল যথাবিধিই হল। প্রত্যাখ্যাত ওস্তাদজী নির্বাসিত হলেন গহর ভবন থেকেও। সঙ্গীতশিক্ষা দেয়া তো কেয়া, গহর-দৃষ্টিরই বহির্ভূত হয়ে যাও!

সে যাত্রায় কলকাতায় আসাই যেন কাল হয়েছিল কালে খাঁর। 'গউহর বিল্ডিং' থেকে বিদায়ের কিছুদিন পরে বীডনস্ট্রীটে তারাপ্রসাদ ঘোষের গৃহে আশ্রয় পেলেন বটে। কিন্তু সেখানেও সুরবাহারী এমদাদ খাঁর সঙ্গে একদিন সাঙ্গীতিক বিবাদ বাধল অদৃষ্টের ফেরে। শান্তিপ্রিয় কালে খাঁ তারাপ্রসাদের অন্য একটি বাড়িতে কদিন রইলেন। তারপর কলকাতার অন্যত্র আরো কিছুদিন প্রতিষ্ঠাহীন গুজরান করে চলে গেলেন পূর্ববঙ্গে। ঢাকায়। সেখানে চার-পাঁচ বছর বাসের পর পাতিয়ালায় ফিরে যান। কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে কালে খাঁর আর অবস্থান ঘটেনি কখনো। তাঁর অনুপস্থিতিতে কলকাতার সঙ্গীতিক জীবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

কিন্তু গুজবের সৃষ্টিক্ষমতা অদ্ভুত। তাই কালে খাঁর জীবনে সেই বিয়োগান্ত গহর-অধ্যায় নিয়ে একেবারে বিপরীত গুজব রটে গেল: মুগ্ধা গহর জান তাঁর আবাসে সসম্মান আতিথ্য গ্রহণের জন্যে সাধা-সাধি করছেন কালে খাঁকে। কিন্তু উদাসীন, দৃক্‌পাতহীন কালে খাঁ। গহর জানকে তিনি 'ডাইনী, অজগরণী' বলে এড়িয়ে চলেন, মুখদর্শন পর্যন্ত করেন না। ইত্যাদি

অবশ্য ঘনিষ্ঠ মহলে অনেকেই ওয়াকিবহাল ছিলেন আসল ঘটনা সম্পর্কে। 'গউহর বিল্ডিং' পর্বের পরবর্তী কালে খাঁর আশ্রয়স্থল তারাপ্রসাদ ঘোষের গৃহেও প্রকৃত বিবরণ থেকে যায়। কালে খাঁ যে গহরের বাড়িতে ছিলেন, অন্য সূত্রেও তা সমর্থিত। পরবর্তীকালের একজন বিখ্যাত টপ্পা (খেয়ালেরও) গায়ক বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়। তিনি কিছুদিন কালে খাঁর কাছে তালিমের সুযোগ পান। বিজয়লাল তাঁর তালিম নিতে যেতেন গহরের সেই কলুটোলার বাড়িতে!

তবে গহর জানের দিল্‌-দারির রহস্য বোঝা ভার। তা দিয়ে

হৃদয়-কুম্ভ ভরিয়ে নিতে গিয়ে কালে খাঁর ভরাডুবি হল। অথচ সেই দিল্ই তুরীয় লোকে উঠিয়ে দিলে আব্বাসের ভাগ্যকে। কালে খাঁ তবু তো অত বড় গুণী। কিন্তু আব্বাসের কি ছিল? একেবারেই নিঃস্ব এবং নির্গুণ। অথচ বাই সাহেবার দিল্ দরিয়া হয়ে আব্বাসের সঙ্গে ভেসে চলল, বছরের পর বছর।

শুধু ঘরে নয়, অনেক আসরেও আব্বাসকে সঙ্গী করে নিয়ে যেতে লাগলেন। আর তেমনি তন মন ধন নিবেদনের বহর গহরের। নিজের সঙ্গে কখানি বাড়ি পর্যন্ত প্রণয়ীকে উপহার দিয়ে ফেললেন। একেবারে উজাড় করে দেয়া অনেক কিছু সম্বল।...

এমনি নানা বিপরীতমুখীন আচরণ গহর চরিত্রকে রহস্যময়ী করে তুলেছিল। তাঁর পরিচিত মহলেও মহা বিস্ময় আর আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

আসলে বাই সাহেবার এই উদ্দামতা আর স্বভাবের স্বৈরিতা হয়ত জন্মসূত্রেই পাওয়া। এমন প্রদীপ্ত প্রতিভার নেপথ্যে এত ছায়া সমাবেশ আর বৈপরীত্য বোধ হয় সহজাত।

গহর জানের গহন লোকের মূল কি জননীর উত্তরাধিকার? অথচ বাইজী বা কোন সমাজ-বহির্ভূত শ্রেণীতে গহর মাতারও জন্ম কিংবা জীবনের সূচনা হয়নি।

সে পূর্ব বৃত্তান্তের জন্যে পিছিয়ে যেতে হবে আরো অনেক বছর। এদেশীয় সঙ্গীত-জগৎ থেকে বহুদূরে। আর ক' যুগ আগেকার কলকাতায়। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে। এ শহরের মধ্যেই এক সম্পূর্ণ বিদেশী সমাজে।

সেই সম্প্রদায়ের একটি পরিবার থেকে এই কাহিনীর সূত্রপাত।

সেকালের রাজধানীতে পরিবারটি ছিল ইউরোপীয় সমাজের অন্তর্গত। কিন্তু পরের যুগে কেউ তাঁদের ইহুদী বলেছেন আর কেউ বা বলেন আর্মানী।

সাহেবের নাম রবার্ট উইলিয়ম ইওয়ার্ড। আর তাঁর মেমসাহেব

হলেন—এডেলাইন ভিক্টোরিয়া হেমিংস্। একটি শিশুকন্যাকে নিয়ে তাঁদের তুজনের ছোট্ট সংসার।

মেয়েটির সেই শৈশবে পিতৃদত্ত নাম ছিল ইলীন অ্যাঞ্জেলিনা ইওয়ার্ড। তার জন্ম কলকাতায়, ১৮৭৩ সালে।

রবার্ট উইলিয়ম ইওয়ার্ড আর এডেলাইন ভিক্টোরিয়া হেমিংসের সঙ্গে এদেশীয়দের সংস্রব বলতে কেবল বাড়ির বাবুর্চি আর্দালি কোচমানরা। দেশজ সঙ্গীতের সঙ্গে কোন সম্পর্কও থাকবার নয়।

অসামান্যা রূপবতী এডেলাইন ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে মিস্টার রবার্ট ইওয়ার্ডের সংসার বাইরে থেকে বেশ চলতে দেখা যায়।

কিন্তু এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল পরিবারটিতে। কি যে ছিল এডেলাইন ভিক্টোরিয়া হেমিংসের মনে বা প্রবৃত্তিতে। একদিন তিনি রবার্ট ইওয়ার্ড সাহেবের ঘর ভেঙে দিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। উধাও হলেন বাড়িরই এক হীন বৃত্তির কালা আদমির সঙ্গে।

শিশু ইলীন অ্যাঞ্জেলিনাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। মিস্টার ইওয়ার্ড ভাঙা সংসার জোড়া দেবার আর চেষ্টা করেছিলেন কিনা জানা যায়নি। তবে সে পথ বন্ধ করে দেয় তাঁরই একদা বেতন-ভোগী কৃষ্ণকায়টি। মিসেস এডেলাইন ভিক্টোরিয়া ধর্মান্তরিত হয়ে গেলেন। ধর্ম যেন সাপের খোলস কিংবা বিলাসিনীর পোশাক। ছেড়ে ফেলা যায় ইচ্ছে হলেই!…

এডেলাইন ভিক্টোরিয়া হেমিংস রাতারাতি মাল্‌কা জান বনে গেলেন। মিসেস হেমিংসের নতুন নাম দেখে মনে হয় বাইজী বুঝি। কিন্তু তা নয়। গায়িকা বা নর্তকী হবার কোন গুণ সে ব্যভিচারিণীর ছিল না।

আর সেই শিশুকন্যা ইলীন অ্যাঞ্জেলিনার এবার নামকরণ হল—গউহর জান। অনেক পরে অনেক মুখে যা উচ্চারিত হত গহর জান বলে।

বাইজী মহলের একজন হিসেবে তারপর যখন গহর জান বিখ্যাত

হলেন, তখন আরো কজন মাল্‌কা জানকে দেখা যায়। সে মাল্‌কা জানরাও সবাই বাইজী। যে জায়গা থেকে তাঁদের কলকাতায় আগমন ঘটে, সে সবের নামের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয় তাঁদের নাম পরিচয়। যেমন আগ্রাওয়ালী মাল্‌কা জান, চুল্‌বুলাওয়ালী মাল্‌কা জান, ভাগলপুরী মাল্‌কা জান। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধা আগ্রাওয়ালী মাল্‌কা জান। গহর জানের সঙ্গে আগ্রাওয়ালীর খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। আলাপ ছিল অন্য মাল্‌কাদের সঙ্গেও। আবার গহর-জননী অর্থাৎ মিসেস ভিক্টোরিয়া হেমিংসের নতুন নামও মাল্‌কা জান। তাই গহর জানের বান্ধবী মাল্‌কাদের অর্থাৎ বাইজী মাল্‌কা জানদের মধ্যে থেকে গহর-মাতাকে নির্দিষ্ট করবার জন্যে বলা হত, বড়ী মাল্‌কা জান বা বড় মাল্‌কা। তবে বড় মাল্‌কা কোনদিনই বাইজী অর্থাৎ নর্তকা গায়িকা ছিলেন না, বাইজী কুলেও তাঁর জন্ম নয়। অনেকের এই ভুল হত গহর-জননীর মাল্‌কা জান নাম দেখে, কিংবা তাঁর কন্যা বাইজী বলে।

শিশুকন্যাকে নিয়ে বড় মাল্‌কার সেই প্রথম জীবনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। জানা যায় না গহরের বাল্যজীবনের কথা। সুন্দর ও বর্বরের সেই সহাবস্থানের মধ্যে কিভাবে বালিকার দেহ-সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রকাশ পায় সঙ্গীতকণ্ঠ, কেমন করে তাকে নৃত্যগীত শেখাবার ব্যবস্থা হয়, বেচু ওস্তাদের তালিম কি করে আরম্ভ হয়েছিল, কোন্‌ পরিবেশে এই বিদেশিনী কন্যা দেশীয় এত প্রকার রাগসঙ্গীতের রীতি আয়ত্ত, আত্মস্থ করতে থাকে, সে সব নাটকীয় বৃত্তান্ত অজ্ঞাত আছে। তবে গহরের সঙ্গীতপ্রতিভা অসাধারণ। কারণ অমন বিষম পরিস্থিতিতেও প্রথম যৌবনেই তাঁর প্রতিষ্ঠা হয় বাইজী জীবনে।

বৃহত্তর সঙ্গীতসমাজে গহর জানের প্রথম পরিচিতিও চমকপ্রদ। তাঁর কিশোরী বয়সে হায়দরাবাদের নিজাম তাঁকে কলকাতায় পরিচিত করেন বলে প্রকাশ। নিজামের সঙ্গে যোগাযোগের বিবরণও অজানা।

তারপর বাইজীর পেশাদারী জীবনে গহর জানের উত্তরোত্তর খ্যাতি প্রতিপত্তি। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যশ ও প্রতিষ্ঠা। সর্বাধিক মুজরোর হার। অসাধারণ আসর-সচেতনতা ও সাফল্য ইত্যাদির ঘটনাবহুল তাঁর প্রতিভা-প্রোজ্জ্বল ক্রমিক ইতিহাস। কলকাতায় গভর্ণরের প্রাসাদে একাধিকবার আসর। আর লণ্ডনেও গহরের মুজরো করতে যাওয়া। সেই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব, বিলাস। কখনো বা স্ব-বিরোধিতা। কখনো স্বৈরিণী। কখনো ভাবুক শিল্পী-সত্তা নিয়ে অনন্যা গহর জান।

তাঁর মধ্যজীবনে অসাধারণ কলাবৎ কালে খাঁর প্রসঙ্গ এসেছিল। গহরের দিল যাচ্‌তে গিয়ে বরাত জ্বলে যায় যে দুর্ধর্ষ খেয়ালীয়ার। অথচ তার পরেই তো সেই আব্বাস।

তখন আবার বাইজী-কুলরাণীর নিজের কি খেয়াল আর উচ্ছ্বসিত আবেগ। সে দিল্ আব্বাসের ভাগ্যে জুটে গেল। তারই দরিয়ায় গহর জান কয়েক বছর ভাসবার পর প্রেমের সাম্পান বেধে গেল রুক্ষ চড়ায়। পীরিতের তুফান শুকিয়ে চর জেগে উঠল জোয়ারের প্রতিক্রিয়ায় ভাঁটারও সে কি জোরালো টান।

মন না মতি—কি অভাবিত তার গতিপ্রকৃতি। গহরের মনো-গহনে কি তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হল, কে জানে। প্রেমের ডোর ছিন্ন করেই তিনি ক্ষান্ত হন। এ যাবৎ যত স্থাবর সম্পদাদি দান করেছিলেন প্রেমাস্পদকে, ফিরে পেতে চাইলেন সে সব।

কিন্তু মুখের কথায় চাইলেই কি ফেরত পাওয়া যায় মূল্যবান সম্পত্তি! হৃদয়ের চেয়েও তা অনেক কঠিন দেখা গেল। এক্ষেত্রে আছে আইনের জটিল ব্যাপার। কারণ, ক'বছর তাঁদের মধ্যে চলেছিল প্রণয়েরই পর্ব। পরিণয় আদৌ হয়নি। হৃদয়াবেগে তাড়িতা প্রেমিকা এমন দানপত্র করেছিলেন যা নিজের পক্ষে ক্ষতিকর।

এখন মনান্তর থেকে বিসম্বাদ মামলায় পর্যবসিত হতে, গহর জানকে অতএব বিচক্ষণ আইনজ্ঞের শরণ নিতে হল। সুপ্রতিষ্ঠ

অ্যাটর্নি ও. সি. গাঙ্গুলী মহাশয়কে নিযুক্ত করে গহর জান মোকদ্দমা দায়ের করলেন হাইকোর্টে। আব্বাসের বিরুদ্ধে।

শ্রী ও. সি. গাঙ্গুলী। অর্থাৎ ওই নামেই কান্তকলার গবেষণার জগতেও সুপ্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি সেসময় আইনের পেশা আর ললিতকলার নেশার জুড়ি গাড়ি সমান দাপটে হাঁকিয়ে চলেছিলেন। একদিকে তাঁর কর্মব্যস্ত, সফল অ্যাটর্নি ব্যবসায়। অন্যদিকে শিল্প-সংস্কৃতির নানা বিভাগের অক্লান্ত গবেষক, সমালোচক, মর্মব্যাখ্যাতা এবং ইতিহাস-লেখক অর্ধেন্দ্রকুমার। কান্তকলার ক্ষেত্রে কি নিরলস কর্মধারা তাঁর। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং আমেরিকা ইউরোপাদি বিদেশেও ভারতীয় চিত্রসম্পদের প্রদর্শনী উদ্‌যোগী, বিশ্ববিখ্যাত 'রূপম্' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, সোসাইটি অফ্ ওরিয়েন্টাল আর্ট্‌স্-এর অন্যতম স্থাপয়িতা ও কর্মকর্তা, নানা বহুমূল্য গ্রন্থের লেখক—স্বনামধন্য ও. সি. গাঙ্গুলী।

এই মোকদ্দমার আগেও তাঁর অ্যাটর্নি বৃত্তিতে গহর জান মোয়াক্কেল ছিলেন। গহর জানের সেই আব্বাস-ঘটিত মামলা এবং আরো কিছু প্রসঙ্গের উল্লেখ তিনি করেছেন তাঁর বিস্তারিত স্মৃতিকথা গ্রন্থ 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা'য়। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনে দুই মেরুর নানা জ্ঞাতব্য সংবাদ আছে পুস্তকটিতে। শিল্প-সংস্কৃতির জগৎ থেকে হাইকোর্টের এখতিয়ার পর্যন্ত।

গহর জানের বিষয়ে অর্ধেন্দ্রকুমার এইভাবে জানিয়েছেন—জীবনে আরো কত বড় বড় মামলা করেছি।···এইরকম বিশেষ একটি মোকদ্দমা···হয়েছিল বেশ কৌতূহলকর।

"সেকালের প্রখ্যাত গায়িকা বিবি গহর জানও সেকালের প্রখ্যাত মক্কেলগোষ্ঠীর অন্যতম। তিনি তাঁর এক প্রিয়পাত্রকে কয়েকখানি বাড়ি দিয়েছিলেন দানপত্র করে। পরে তাঁর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে সেই দানপত্র নাকচ করবার জন্যেই আমাকে নিয়ে গহর জান মামলা করান। এর আগে ও পরে গহর জান যত বাড়ি এবং বিষয়

কিনেছিলেন, তার দলিলপত্রও আমার হাত দিয়েই হয়েছিল। গহর জানের এই মোকদ্দমায় আমি কৌসুলী নিযুক্ত করেছিলাম স্যার বি. সি. মিত্র ও মিঃ চারুচন্দ্র ঘোষকে। যখন এই মামলার কনসালটেশান হয়, তখন মিঃ ঘোষ স্যার বি. সি. মিত্রকে বলেছিলেন, 'আপনার ফিস্ মাত্র পাঁচশো দশ টাকা। কিন্তু আপনার মক্কেলের এক-রাত্রির মুজরোর দক্ষিণা এক হাজার কুড়ি টাকা মাত্র।' এই মামলা চালাতে আমাকে 'আনডিউ ইনফ্লুয়েন্স' দেখাতে ও প্রমাণ করতে হয়েছিল। এবং প্রমাণস্বরূপ গহর জানের সঙ্গে তাঁর প্রিয়পাত্রের পত্র বিনিময় আদালতে দাখিল করতে হয়েছিল। চিঠিগুলি ছিল উর্দুতে লেখা ও খুব কবিত্বপূর্ণ। একজন ভাল উর্দু-জানা লোককে দিয়ে সমস্ত চিঠিগুলি ইংরেজীতে তর্জমা করিয়ে দিয়েছিলাম। এই তর্জমার সময় স্যার বি. সি. মিত্র নানারকম হাস্যপরিহাস ও রসিকতা করতেন। এই মামলায় আমার মক্কেলেরই জিত হয়েছিল। গহর জান মামলায় জয়ী হতে খুব খুশী হয়ে বলেছিলেন, আমার ছেলের বিয়েতে এসে গাওনা করে যাবেন।

"মামলা শেষ হতেই তিনি চলে যান মহাশূর দরবারে গায়িকার পদ নিয়ে। কিছুকাল পরেই সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার বাড়িতে এসে তাঁর গান আর গাওয়া হয়নি। মহীশূরে তিনি বেতন পেতেন দু হাজার টাকা। গহর জান ছিলেন সেকালের এক শ্রেষ্ঠ গায়িকা। বাংলা হিন্দী উর্দু ও ইংরেজী সব ভাষায় তিনি গাইতে পারতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের রচিত দু-একটি গানও গাইতেন। আবার ইচ্ছামত দুই-একটি পদ বা কথার পরিবর্তনও করে নিতেন। এই পরিবর্তন তিনি করতেন দাদরা সুরে গাইবার জন্যে। তাঁর গান শুনবার সুযোগ আমার অনেকবারই হয়েছিল। আমাদের বড়বাজারের বাড়িতে নানা উপলক্ষে তাঁর গান কয়েকবারই হয়েছে।

"গহর জানের একটি নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস ছিল। রোজ বিকেলে বাড়ি থেকে টমটমে করে বর্মী টাট্টু নিজে হাঁকিয়ে ময়দানে

বেড়াতে যেতেন। রাস্তায় ক্যানিং স্ট্রীটে আমার এক আত্মীয়-সম্পর্কে দাদা, নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির মুনিহারী দোকানের সামনে একবার থেমে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে পান খেয়ে তবে ময়দানের দিকে যেতেন। রাস্তায় তখন লোক দাঁড়িয়ে যেত। গহর জানের পিতা ছিলেন কালো চেহারার মানুষ। মাতা ছিলেন সুন্দরী ইহুদী। মায়ের বর্ণ ও রূপ পেয়েছিলেন গহর জান। মামলা উপলক্ষ্যে গহর জানের মাতাপিতা, সেই প্রিয়পাত্র আব্বাস ও তাঁর পিতা সকলকেই দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আব্বাসের বৃদ্ধ পিতা আবার বিশেষ করে আমার কাছে আসতেন যাতে তাঁর পুত্রকে প্রদত্ত সব বাড়ি কটি গহর জান ফিরিয়ে নিয়ে না যান। মামলার অবসানে গহর জানও সব বাড়ি নিলেন না। একটি বাড়ি আব্বাসকে দিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করে চলে গেলেন মহীশূরে।"
(ভারতের শিল্প ও আমার কথা, পৃষ্ঠা ১২২-১২৪)

এই প্রত্যক্ষদর্শী মূল্যবান বিবরণের মধ্যে কিছু অবশ্য ফাঁক আছে। মামলা নিষ্পত্তির পরেই যে গহর জান মহীশূর দরবারে যোগ দিতে যান, তা নয়। মধ্যবর্তী কালে আরো অধ্যায় ছিল নটীর ঘটনাবৈচিত্র্যে পূর্ণ জীবনে। বিশেষ বোম্বাইয়ের সেই অনুচ্ছেদটি, যা উপসংহারে বক্তব্য। তা ছাড়া, কলকাতায় তাঁর সমাপ্তি-পর্বেও বর্ণনীয় নানা বিষয় আছে।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবৃতি সম্পর্কে আরো একটি কথা উল্লেখনীয়। তিনি বলছেন, 'গহর জানের পিতা ছিলেন কালো চেহারার মানুষ।' তা যদি হয়, তাহলে গহরের শৈশবকালীন নাম 'ইলীন অ্যাঞ্জেলিনা ইওয়ার্ড' কি করে হয়েছিল? তার সঙ্গত কারণ, ওই 'কালো চেহারার মানুষ' গহরের জনক নয়, পালক পিতা বা বি-পিতা। গহরের জনক ছিলেন—রবার্ট উইলিয়ম ইওয়ার্ড। সেজন্যেই গহরের প্রথম নাম 'ইলান অ্যাঞ্জেলিনায়' সঙ্গে যুক্ত ছিল 'ইওয়ার্ড' নামাংশটি।

এখন, মোকদ্দমার পরবর্তী গহরের কলকাতা-জীবনের সকরুণ শেষাঙ্ক।

বিপুল ব্যয়সাধ্য মামলায় বাইজী জিতলেন বটে। কিন্তু আর্থিক ক্ষতির চেয়েও গুরুতর বিপর্যয়কর হল তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া। এই অশান্তির ঘটনা পরম্পরায় গহরের অন্তর তথা শিল্পীচিত্ত যেন বিধ্বস্ত হয়ে গেল। আলোকোজ্জ্বল সঙ্গীতজীবনে ঘনিয়ে এল যবনিকার অন্তরাল ছায়া। তিনি অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

প্রথমে বিষণ্ণমনে যেন স্বেচ্ছানির্বাসন নিতে চাইলেন, হয়ত সাময়িকভাবে। কিন্তু পেশাদারী সঙ্গীতজীবনও অনেকখানি নাট্য-শিল্পীর মতন। আসর থেকে অদর্শনের ফলে সঙ্গীতামোদীদের মনোলোক থেকেও তাঁর অপসরণ ঘটতে লাগল। তা ছাড়া পঞ্চাশ-উত্তীর্ণা! দেহপটের সঙ্গে এমন নামী নটীও পোষক শ্রোতাদের হারাতে লাগলেন।

তারপর যখন আবার মুজরো শুরু করতে চাইলেন, তখন বিস্ময়ের সীমা রইল না গহর জানের নিজেরই। সেই নাম ডাক কদর সমাদর —কোথায় গেল! ডাক আসে না আর। মুজরো নেই।

সমস্ত কারণের যোগাযোগে, যা ছিল তাঁর অকল্পনীয়, তাই ঘটল জীবনে।

হাজার টাকা মুজরোর বাইজী দারিদ্র্যের কবলে পড়লেন। সেই সঙ্গে, মানসিক অবস্থাও শোচনীয়।

জীবন-নাট্যের এই অঙ্কে গহর জানকে আশ্রয় নিতে হল আগ্রাওয়ালী মাল্‌কা জানের গৃহে। এই মাল্‌কা তাঁর প্রিয় সখী। সঙ্গীতজীবনে হয়ত প্রছন্ন কিঞ্চিৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব বিগত পর্বে ছিল। কিন্তু এমন শিল্পীর দুর্দিনে তা আর মনে রাখলেন না আগ্রাওয়ালী মাল্‌কা।

ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটে, ট্রাম-রাস্তা থেকে পূর্বমুখে প্রবেশ করে নিকটেই ডান দিকে তাঁর সেই উত্তরমুখী বাড়ি। সেখানে গহর জান

বাস করতে এলেন। পূর্ব-জীবনের মান না থাকলেও তাঁর সঙ্গীতকণ্ঠ বা নৃত্যপটুত্ব অন্তর্ধান করেনি তখনো। অথচ সঙ্গীতাসর থেকে তখন প্রায় নির্বাসিতা। বিয়োগান্তক পরিস্থিতি এইখানেই।

বয়সও যেন হঠাৎ ক বছর বেড়ে গেছে। গহর জানের চোখে এখন পুরু কাঁচের চশমা। তা অবশ্য চোখের বিশেষ কাজের জন্যে, ঘরের মধ্যে ব্যবহার করতে হয়। বেশভূষার জৌলুষ যে নেই, তা বলা বাহুল্য। বহিরঙ্গ পরিবর্তনও চোখে লাগে আগেকার দেখা সকলের, নানা রকমে।

আব্বাস-পর্ব ও মোকদ্দমার উপসংহারে গহর জানের এই কলকাতা-জাবন।

এ অধ্যায়েরই কোন সময়ে হয়ত, একবার বোম্বাই গিয়েছিলেন। বোধ হয় অসহ বোধ হয়েছিল কলকাতায়। পরিবর্তনের আশায় অনেক সফল আসরের স্মৃতি জড়ানো বোম্বাইতে এ সময় গহর জান একবার পাড়ি দেন। সূত্রও ছিল সেখানে। কিন্তু কেন যে অমন আশ্রয়েও টিকতে পারলেন না, কে জানে তার রহস্য। সে কি মানসিক অস্থিরতায়? বোম্বাইয়ের তুলনায় সহস্র-গুণ স্মরণের নিকেতন কলকাতার টান কি দুর্বার হয়ে উঠল? সঠিক জানা যায় না তার অন্তর্বিবরণ।

বাইজীর উচ্ছ্বসিত অনুরাগী বোম্বাইয়ের সেই শেঠজী। কত অনুকূল পরিবেশই সেখানে ছিল। কারণ তিনি শুধু দরাজ পোষক নন, নিজেও সখের গীতচর্চা করেছেন এককালে। আর গহরের রঙ্গিনী-শক্তি তখনো নিঃশেষ হয়নি। তাঁর সুখের আয়োজন বড় কম করেননি এই রূপ-গুণ-মুগ্ধ।

রঙ্গিনীর কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত। তাই শেঠজীর স্বর্ণপিঞ্জর একদিন শূন্য হয়ে অচিন্ পাখি অদৃশ্য হল।

পুনরায় বান্ধবী মাল্‌কার কাছে গহর জান ফিরে এলেন দুঃখের দিন গুজরান্ করতে। ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটের সেই বাড়িতে।

অবস্থা তখন এমনই দাঁড়ায় যে, মাল্‌কা জান ভিন্ন কোন কোন সদাশয় বদান্যের সাহায্যও নিতে হত। যেমন পাথুরিয়াঘাটার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়। সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতপ্রেমী ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ সঙ্গীত-গুণীদের যে কি সহৃদয় মুক্তহস্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তার বাইরে প্রকাশ ছিল না। পরবর্তী কালের নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন (যা প্রকৃতপক্ষে সর্বভারতীয় আসরই হত) পরিচালনার জন্যে তিনি সুপরিচিত ছিলেন সঙ্গীতজগতে। কিন্তু কত শিল্পীর দুর্দিনে যে তিনি গোপন সাহায্য করেছেন, তা শুধু ভুক্তভোগীদেরই জানা। তাঁর নিকটতম আত্মজনেরও তা অজ্ঞাত থাকত। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর হাতবাক্স থেকে পাওয়া যায় দুঃস্থ কলাকারদের ঠিকানায় পাঠানো কত মানি অর্ডারের চিরকুট !

গহর জানের দুঃসময়েও ঘোষ মহাশয় দাক্ষিণ্য করতেন। ঠিক অর্থসাহায্য নয়। তাঁর দরকারী জিনিসপত্রের জন্যে সহায়তা।

গহর-ভক্ত জ্ঞান দত্ত এসে এসে জানাতেন, গহর জানের এটা ওটা নেই। আর তা পূরণ করে দিতেন ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ, জ্ঞান দত্তের মারফতেই। গহর জানকে ঘোষ মহাশয় আগে থেকে জানেন। বাইজীর সেসব মহা সুদিনের সময়েও। বাই সাহেবা তো কবার মুজরোই করেছেন তাঁদের পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে। বিয়ে উপলক্ষ্যে তাঁর নাচগান হয়েছে। তা ছাড়া, ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের জলসাঘরেও আসর করেছেন গহর জান।

তাঁর বাড়িতে বাই সাহেবার প্রথম নাচগানও একটি বিয়ের উৎসবে। তা হল, ১৯২০ সালের কথা। তাঁর খুড়তুত ভাই সিদ্ধেশ্বরের বিয়েতে সেই নতুন রকমের আসর গহর জানের। আর তাঁর সঙ্গে মাল্‌কা জানেরও। ওই ৪৬ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের সদর মহলে। সমস্ত উঠোনে ঢাকা শামিয়ানার নীচে আসর বসেছিল। সে আসরের সাজই আলাদা। মাঝখানে দুটি বরফের পাহাড়। তার দু পাশ থেকে নাচতে নাচতে দেখা দিলেন গহর আর আগ্রাওয়ালী মাল্‌কা

জান। খানিকক্ষণ তাঁদের দ্বৈত নৃত্য চলল। তারপর গান শোনালেন দুজনেই। শেষে নাচতে নাচতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সাদা বরফ স্তূপের আড়ালে। দুই বাইজীর রূপের ছটা শেষ চমক দিয়ে গেল। যেন কোন রূপকথার দৃশ্য ভেসে উঠেছিল দর্শকদের চোখের সামনে।··

সেই প্রথম গহরের এই বাড়িতে আসা। তার পর থেকে তাঁর কত বড় বড় আসর হয়ে গেছে দোতলার এই জলসাঘরে আর কত রকমের আসর। বাংলা গানও শুনিয়েছেন। আবার খেয়াল ঠুংরি দাদরা। ঘোষ মশায়কে কি খাতির করতেন উঁচুদরের সমঝদার বলে।

এ বাড়ির জলসাঘরে গহরের অনেক আসরের স্মৃতি আছে।

একদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠুংরি গাইছেন বাইজী। খাড়া ঠুংরির আসর। চোখমুখের ভাব অভিনয়ে, হাতে মুদ্রায় ভাওবাৎলাবার সঙ্গে দণ্ডায়মানার ঠুংরি গান। বাইজীর সুরের আর তালের সঙ্গতকাররাও পাশে পিছনে দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছেন। কোমরে চাদর বেঁধে তবলচী তার মধ্যে কায়দা করে রেখেছেন তবলা বাঁয়া। আর দাঁড়িয়েই তাঁর সঙ্গত চলছে। সারঙ্গী বুকের ওপর ঝুলিয়ে নিয়েছেন সারঙ্গ যন্ত্রটি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ছড় টানছেন।

আসর-ভরা শ্রোতারা দেখছেন শুনছেন গহর জানের ভাও বাৎলানা খাঁড়া ঠুংরি।

তাঁদের মধ্যে বসে ছিলেন বীরু মিশির। কাশীর বিখ্যাত তবলিয়া। তিনি সেদিন শ্রোতা হয়ে এসেছেন।

শুনতে শুনতে হঠাৎ বীরু দাঁড়িয়ে উঠলেন। গহরের গানে বাজাবার মেজাজ এসে গেছে তাঁর।

গহরের তবলচীর কাছে এসে বললেন, 'মাফ কিজিয়ে ভাইজী। এখন আমি একটু বাজাই।'

বলে, তেমনি করে বীরু কোমরে চাঁদর বাঁধলেন। আর তার সঙ্গে তবলা বাঁয়া। নিজে যে এত বড় নামী তবলচী, এটা তাঁর বাজাবার আসরও নয়, ওসব তাঁর আর মনে রইল না।

তারপর কি মজা করেই বাজাতে লাগলেন গহরের ঠুংরির সঙ্গে। সে আসর কি জমজমাট হয়ে উঠল।

আবার সেই জলসাঘরে গহর এমন আসর করেছেন যে সারা রাত গান গেয়েছেন একাই।

নটীজীবনে তাঁর চূড়ান্ত পর্বের সেসব কথা।

তখন থেকে ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের আসরে আসতেন জ্ঞান দত্ত বলে সেই ভদ্রলোক। তাঁর জলসাঘরের নিয়মিত শ্রোতা একজন। গহর জানের গানেরও এক ভক্ত জ্ঞান দত্ত।

তিনি কাপড়ের কারবারী। আর মনেপ্রাণে সঙ্গীতের ব্যাপারী। অন্তর তাঁর সঙ্গীতরসে ভরপুর। গান শুধু ভালবেসে কিংবা শুনেই তিনি তৃপ্ত নন। গেয়ে থাকেন সাধ্য মতন। আর নিরীহ শ্রোতা পেলে নিঃসঙ্কোচে শুনিয়ে দেন। নিজের কণ্ঠে সুর আছে কিনা, তাঁর সেই গান শুনে শ্রোতার পলায়নের ইচ্ছা জেগেছে কিনা, এসব অবান্তর বিষয়ে তিনি দৃক্‌পাতহীন।

তেমনি অদম্য আগ্রহ তাঁর সঙ্গীত শিক্ষাতেও। গান শেখার কোন সুযোগ তিনি হাতছাড়া করেন না।

জ্ঞান দত্ত নামে যে একজন গায়ক ছিলেন, যাঁর গ্রামোফোন রেকর্ডও ক'খানি হয়ছিল, তিনি ভিন্ন ব্যক্তি।

বস্ত্রব্যবসায়ী জ্ঞান দত্তের সঙ্গে গহর জানের আলাপ হয়ে যায়। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়ির আসর থেকেই তাঁদের পরিচয়ের সূত্রপাত। সেই আলাপের জের কিংবা বস্ত্রের বেসাতি সূত্রে তাঁর আসা-যাওয়া হতে থাকে গহর জানের বাড়িতে।

কিন্তু জ্ঞান দত্তের আসল লক্ষ্য ঠিক আছে। সেরা বাইজীর কাছে ভাল ভাল গান শিখে নেয়া।

আর আশ্চর্য চরিত্র গহর জানের। তাঁর তখন অতিব্যস্ত পেশাদারী সময়। আসরে আসরে যেমন নামডাক, তেমনি মুজরো। কিন্তু কি তাঁর উদারতা, ধৈর্য এবং অহংবিহীন ব্যবহার। এমন বেসুর

স্থূল-মস্তিষ্ক মানুষটিকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন। গানও শেখাতেন তাঁর প্রার্থনা মতন। জ্ঞান দত্তের ঐকান্তিক নিষ্ঠার জন্যে হাসির বদলে মর্যাদা প্রকাশ করতেন। তাঁর সঙ্গে 'মাই ফ্রেণ্ড্' সম্পর্ক পাতান ভদ্রতার খাতিরে।

জ্ঞান দত্ত সে সংবাদ ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের কাছে এসে সগৌরবে জানান, 'গহর জান আমাকে মাই ফ্রেণ্ড বলেন।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। মাই ফ্রেণ্ড বলেই আমার সঙ্গে কথা কন।'

আবার কোন দিন এসে ভূপেন্দ্রকৃষ্ণকে বলেন, 'গহর জান কাল আমায় এই গানটা শিখিয়ে দিয়েছেন।'

বলে, গানখানি শুনিয়েও দেন যথাসাধ্য।

ঘোষ মশায় মুখ টিপে জিজ্ঞেস করেন, 'গহর জান ঠিক এমনি সুরেই কি গানটি দিয়েছিলেন ?'

এবার রসিকতা বুঝতে পারেন জ্ঞান দত্ত। অপ্রস্তুত হেসে স্বীকার করেন, 'না না, ঠিক এরকম সুরে নয়। তবে আমার গলায় এইরকম উঠেছে আর কি।'

'তাই বলো।'

তা জ্ঞান দত্ত বরাবর গহর জানের কাছে যাতায়াতটা রেখেছিলেন। আর গহরেরও অনুকম্পা ছিল তাঁর প্রতি। নিজের জীবনে বিপর্যয় আর মামলা-মোকদ্দমার পরেও।

বাইজীর এই অকল্পনীয় দুর্দিনেও অধ্যবসায়ী জ্ঞান দত্ত মাঝে মাঝে উপস্থিত হতেন। গহর জানের সঙ্গে দেখা করতেন মাল্কা জানের ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটের বাড়িতে।

এ যেন আরেক গহর জান। এ বাড়ির দোতলায় একটি ঘরে তাঁর একাকিনী বাস। চোখে পুরু কাঁচের চশমা পরতে হয়। কি বেশভূষা হয়েছে গহর জানের! অপ্রসাধিতার বয়স বোঝা যায় আজকাল।

আর এখন জ্ঞান দত্তেরও আরেক ভূমিকা। বাই সাহেবার খবরা-খবর নেন। আর এক একটা অভাব-অনটনের কথা ভূপেন্দ্রকৃষ্ণকে জানান এসে।

কোনদিন বলেন, 'দেখলুম গহর জানের কাপড় ছিঁড়ে গেছে।'

ঘোষ মশায় তার সুব্যবস্থা করে দেন।

এমনিভাবে একদা শ্রেষ্ঠা বাইজীর দিন কাটছিল, লোকচক্ষুর প্রায় অন্তরালে।

এমন সময় অকস্মাৎ ভাগ্যের চক্র আরেকবার আবর্তিত হয়ে গেল। গহর জানের জীবনে এল আরেক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়।

দাক্ষিণাত্যের মহীশূর দরবারে তিনি নিযুক্ত হলেন। কি করে এই নতুন যোগাযোগ ঘটল, জানা যায় না। তবে গহর জানের দাক্ষিণাত্যে খ্যাতি তো ছিল প্রথম জীবন থেকেই। মহীশূর মহারাজা তাঁর গুণের পরিচয় আগেও পেয়েছিলেন। ভারতের দরবারে আসরে নৃত্যে সঙ্গীতে যখন সাড়া জাগিয়ে ফিরতেন গহর জান তখনো মহীশূর দরবারে মুজরো করে এসেছেন।

হয়ত নৃপতি শুনেছেন নটীর বর্তমান দুঃসময়ের কথা। কিংবা গহরই কোনভাবে আবেদন করেছিলেন দাক্ষিণাত্যের এই প্রসিদ্ধ সঙ্গীত দরবারে।

সেদিন গহর জান নতুন সংবাদটি দিলেন জ্ঞান দত্তকে।

ভূপেন্দ্রকৃষ্ণকে জানাতে বললেন, 'মাই ফ্রেণ্ড, বাবুজীকে আমার বহুৎ সেলাম দেবেন। আর বলবেন, আমি এবার কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাবেন? কোথায়?'

'মাইসোর দরবারে।'

ভারি মন নিয়ে জ্ঞান দত্ত সে খবরও দিয়ে গেলেন ভূপেন্দ্রকৃষ্ণকে।

গহর জানের দুঃখনিশার অবসান ঘটল।

তবে আবাল্য প্রিয়, যৌবনের উপবন, বাইজীবনের এই সুবর্ণ

বর্ণাঢ্য বিচরণভূমি ত্যাগ করে যেতে হয়ত সকরুণ ঝঙ্কার উঠেছিল হৃদয়তন্ত্রীতে।

তবু তখন কি জানতেন—মহানগরী থেকে এই তাঁর চিরবিদায়?

বিশ শতকের বিশের দশক তখন অর্ধাংশ পার হয়ে গেছে। গহর জান বিদায় নিয়ে গেলেন কলকাতা থেকে। উত্তর-ভারতের সঙ্গীত-ক্ষেত্র থেকেও।

সুদূর দাক্ষিণাত্যের মহীশূর রাজসভায় এলেন। সঙ্গীত দরবারের নিযুক্তা বাইজী গহর জান। মাসে দু হাজার টাকা তাঁর জন্যে বরাদ্দ হল।

মাসিক বেতন দু হাজার টাকা তাঁর বর্তমান অবস্থার পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ। যে দুর্বিপাকে পড়েছিলেন সে হিসাবে পর্যাপ্ত। কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী বাইজীবনের তুলনায় এ উপার্জন অল্পই বলতে হয়। কারণ আগে কখনো ছিল না এমন নির্দিষ্ট মাস-মাহিনার অধীনতা!

মাসের মধ্যে কখনো দশ-পনের দিনও আসর-পিছু হাজার টাকা মুজরো করেছেন। প্রতি মাসে ওই হারে পাঁচ-সাতদিন তো হামেশাই।

কিন্তু—গানই তো আছে—'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়···'

বাইসাহেবার বয়স তখন পঞ্চাশ পার হয়ে দু-তিন বছর হয়ত।

নতুন পরিবেশে নবরূপে গহর জান দেখা দিলেন। অতীতের সঙ্গে সব দিকের সংযোগ ছিন্ন।

মহীশূর দরবারে নর্তকী গায়িকা গহর জান। পুনরায় নব ভাবে প্রসাধন। সুরলহরীর ধারা। নৃত্যছন্দের আলিম্পনে প্রোজ্জ্বল আসরের রাজনর্তকী।

এ পর্যায়ের অধিক বৃত্তান্ত অপ্রাপ্য।

শুধু শেষের সংবাদটি আছে। মর্তের সেই অমোঘ বিধান ঘনিয়ে আসে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে।

দরবারী নটীরূপে মহীশূরেই গহর জানের সব দুঃখ সুখের অবসান হয়। বয়স তখন হয়েছিল ৫৬ বছর।

বাংলা সন ১৩৩৬ সালের ১৭ই পৌষ গহর জানের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছেছিল কলকাতার সঙ্গীত সমাজে।...

উপসংহারে, বোম্বাইয়ের সেই অনুচ্ছেদটি।

সেই যে একটি স্মৃতির সৌরভ ভারতের পশ্চিম প্রান্তের এক মণিমঞ্জুষায় সুরভিত ছিল।

তার কিছুদিন আগে সে রাজনর্তকীর মঞ্জীর ঝঙ্কার স্তব্ধ হয়েছিল মহীশূর মহারাজার দরবারে।

এমন এক সময়ে বোম্বাইতে একটি আসর বসেছে। সেখানে গান গাইছেন তরুণ গায়ক অনাথনাথ বসু। বাংলার এক উদীয়মান সঙ্গীতপ্রতিভা। একাধারে খেয়াল ঠুংরি দাদরার কুশলী শিল্পী এবং নির্ভরযোগ্য তবলিয়া। আরো একটি যুগ্ম পরিচয়ে অনাথনাথ আসরে আসরে অনন্য হয়ে দেখা দিয়েছেন। চমক সৃষ্টি করেছেন দুই বিপরীত ধ্বনির গান একই কণ্ঠে পরিবেশন করে।

রূপবান আসর-শিল্পী অনাথনাথ সে আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় এ আসরেও দিলেন। স্বাভাবিক পুরুষকণ্ঠে খেয়াল গাইবার পরেই মিহি নারীসুলভ কণ্ঠে শোনালেন ঠুংরি গান। দস্তুরমত নিপুণা বাইজীর চালে গাওয়া ঠুংরি।

তাঁর অভিনব দ্বৈতকণ্ঠে গান শুনে এখানকার শ্রোতারাও মাৎ হলেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে সাবাস দিতে লাগলেন তরুণ গায়ককে।

আর একজন শ্রোতা গানের শেষে কাছে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। মাথায় প্যাঁচদার পাগড়ি, দু কানে হীরের ফুল। নধর শরীরে সৌখীন সাজ। বেশ মজলিসী দর্শন।

অনাথনাথকে প্রশংসার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবুজী, আপনি কলকাত্তা হতে আসছেন?'

'জী, হাঁ।'

'বাইজী গহর জানকে জানেন তো? তাঁর মুখে 'রাধা কৃষ্ণ বোল্' ভজনটি শুনেছেন?'

'গহর জানকে জানি। কিন্তু ও গান আমি শুনিনি।'

'ভারি ভালো গানা বাবুজী।' তিনি মাথা একটু দুলিয়ে বললেন, 'আমি জানি ওটা। আপনি নিবেন? আপনার ওই জেনানা গলায় আচ্ছা শোনাবে, বাবুজী।'

'তা নিতে পারি।'

'তাহলে আমার বাড়ি একদিন কষ্ট করে আস্থন। আমি দিব আপনাকে।'

অনাথনাথকে তিনি ঠিকানা বুঝিয়ে দিলেন। পরের দিন যাবার কথা হল সেখানে।

সেদিন তিনি উপস্থিত হতে শেঠজী খুবই খাতির করলেন।

ফরাসে বসিয়ে দু-চার কথার পর বললেন, 'গহরের গানা আমি অনেক শুনেছি, বাবুজী। তার মধ্যে ওই ভজনটি আমার কানে এখনো লেগে আছে। তার বাংলা গানও বেশ ছিল। কিন্তু ও গানটি যা গাইত! আপনাকে দিব। দেখবেন, কত আসর মাৎ হয়ে যাবে।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'গহর আমার কাছে অনেক দিন ছিল, বাবুজী। এই কোঠিতে। তার নাচ দেখেছি। কত গান শুনেছি। আঃ, কি গলা ছিল। মনে হয়েছিল, থেকে যাবে এখানে। কিন্তু তাকে রাখতে পারলুম না, বাবুজী।'

অনাথনাথ চুপ করে শুনছিলেন।

'কেন যে কলকাত্তায় ফিরে গেল!' বলে, প্রসঙ্গটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'নিন বাবুজী, ভজনটা লিখে নিন।'

কাগজ কলম এগিয়ে দিলেন অতিথির দিকে।

শেঠজী গানের কেবল ভাষা বললেন না। গুনগুন করে গেয়ে শোনাতে লাগলেন তার সুর।

অনাথনাথ লিখে নিতে লাগলেন।

গান লেখা শেষ হতে শেঠজী জানালেন, 'এ গানের শ্যেরও আছে। এই সঙ্গেই লিখে নিতে পারেন—

'কেইসে তুম্ গণিকাকে অওগুণ না গিনে নাথ।
কেইসে তুম্ ভীলনীকে জুঠে বের খায়ে হো।
কেইসে তুম্ সভা মে দ্রৌপদীকো লাজ রাখী।
কেইসে তুম্ গজকে কায নঙ্গ্ পাগ ধারে হো।
কেইসে তুম্ উগ্রসেনকো বন্দী সে ছুড়ায়ে হো।
মেরি বের ইত্তি দেয় মুখ মিজ রহে নাথ।
হে বন্ধু দীননাথ কহে সে কহে লায়ে হো।

রাধা কৃষ্ণ বোল্॥'

শ্যের লিখিয়ে, গানটি শেঠজী আরেক বার গাইলেন। তেমনি গুনগুন করে।

তখন অনাথনাথ বললেন, 'আচ্ছা, এইবার শুনুন তো, সুর ঠিক হয় কিনা।'

বলে, লেখা দেখে দেখে তাঁর সেই মিহি গলায় গাইতে আরম্ভ করলেন—

'রাধা কৃষ্ণ বোল্ মুখসে রাধা কৃষ্ণ বোল্।
তেরা কেয়া লাগোগে মোল্।...'

প্রথম কলিটি শুনেই শেঠজী বলে উঠলেন, 'বাঃ বাঃ, আপনি ঠিক উঠিয়েছেন, বাবুজী। ঠিক উঠিয়েছেন। কোন গল্তি নেই। গহ্বর্ও এই রকম গাইত। আর এই সব শ্যের দিয়ে কত খেলিয়ে শোনাত। আপনিও আসরে শ্যের দিয়ে গাইবেন। এখন শুধু গানটি শোনান। পরে শ্যের সব ঠিকঠাক করে নিবেন।'

অনাথনাথ আবার 'বামা'কণ্ঠে গাইতে লাগলেন—

'রাধা কৃষ্ণ বোল্ মুখসে রাধা কৃষ্ণ বোল্।
মুখসে রাধা কৃষ্ণ বোল্॥

হাত পাও না হিল্ না,
দশ্ বিশকো শুনাহি চল্ না ;
কুছ্ গিরাহা গাঁঠ নাহি ছুট্না ;
তেরা মন কি ঘুণ্ডি খোল্ ॥

শেঠজী কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। গায়কের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইলেন অন্য দিকে। অনেকদিন আগেকার শোনা গানখানি নতুন করে শুনতে লাগলেন—

'কোল বাঁচানে দে আয়া ;
মায়া সে মন লুভায়া ;
ও ধুকনিকে পাল্লা ছোড় !
মুখ সে রাধা কৃষ্ণ বোল্ ॥'

শ্রোতা যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। দু চোখ বন্ধ। মাঝে মাঝে তারিফ করেছিলেন মাথা দুলিয়ে। তারপর তাও স্থির হয়ে গেল।

শুনতে শুনতে চোখ চাইলেন আবার। বড় আনমনা।

সুরের সঙ্গে তাঁর চিত্ত যেন উধাও হল। শূন্য দৃষ্টি চলে গেল জানলা দিয়ে বাইরে—দূর আকাশে।

বাঙালীবাবুর মেয়েলী গলায় গানের সঙ্গে আরেকটি কণ্ঠধ্বনি ফুটে উঠল—স্মৃতির পটে।

গানের সুরের আলোছায়া তাঁর মনের সঙ্গোপনে কি মায়াজাল বুনে চলল। স্মরণে মননে মূর্তি আর গান অন্তরে একাকার। সেই কবেকার সব সঙ্গীত ও ছন্দের লীলামাধুরী—বিচিত্ররূপিণী রঙ্গরাণী।

সুর থেকে জেগে ওঠে রূপ।

আবার রূপের ডোর সুর হয়ে মিলিয়ে যায়। দূর থেকে কোন্ সুদূরে।

দিন রজনীর পুলক-জাগানো কত হারানো প্রহরের মালা। বাঙালীবাবুর গানের রেশ ধরে কত ছবি যে জেগে ওঠে।

আরেকটি কণ্ঠের ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে স্মরণের পারাবার তীরে।

কত সঙ্গীতের আর মধুর আলোর সঙ্গ। মোহিনী—মোহিনা। কিন্তু কি কুহেলি মতি !...

সেই সুদূরেব সেই কণ্ঠের একটি বাংলা গানও যেন ভেসে আসে—

নিমেষের দেখা যদি পাই, পাই হে তোমারি...
জনমে জনমে রব আশায় তোমাবি।

ঘরের বিদ্যা বাহিরে

বড়কু মিঞা ও মহম্মদ আলী

তখন উজীর খাঁ একেকদিন এসে বসতেন। ঠিক বুঝে আসতেন বড়কু মিঞার সেই ঘরটিতে, বাজনার সময়।

রাজদরবারে নয়, অন্য কোন আসরেও নয়। বাইরের শ্রোতাদের শোনাবার জন্যে, ফরমায়েসে কিংবা বাঁধা সময়ে সংক্ষেপ বাজনাও না।

বড়কু যখন সন্ধ্যের পর একলা ঘরে বসে বাজান, যেদিন মহারাজার সভায় যাবার থাকে না, নিজেকেই শোনাবার জন্যে বাজিয়ে চলেন মনের খুশিতে, একেকটি রাগ ঢেলে বাজিয়ে ঝালিয়ে নিতে থাকেন, তখনই তো আসল বাজনা।

সেই ঘরানা চীজ শুনতে আসেন উজীর খাঁ। রামপুর থেকে কাশীতে। তারপর গঙ্গার ওপারে রামনগরে। কাশী-নরেশের দরবারী ওস্তাদ বড়কু মিঞার বাড়িতে। রামনগর প্রাসাদের কাছে যে ছোট বাড়িটি, মহারাজাই তাঁকে বাস করতে দিয়েছেন।

যেদিন দরবারে যেতে হয় না, বড়কু সন্ধ্যের পরে বসেন সেই ঘরটিতে। মিটমিটে আলোয় তাঁর বেশ মৌজ ভাব। সুরশৃঙ্গারটি নিয়ে তন্ময় হয়ে বাজাতে থাকেন। যখন একাকার হয়ে মিলে যায় সুরের সঙ্গে আফিঙের ঘোর। ঘরের এক দিকে আছেন হয়ত তারাপ্রসাদ। আর কেউ নেই। এমন সময় এসে পড়েন উজীর খাঁ। তরুণ হলেও দস্তুরমত তৈয়ারী, রামপুর দরবারের সেনীয়া বীণ্‌কার। নিঃশব্দে তারাপ্রসাদের সামনেই বসেন। একমনে শুনতে থাকেন নানাজীর বাজনা।

উজীর খাঁর শোনা মানেই শেখা। মনের পটে তুলে নেয়া। তিনি রামপুরে ঘরানাদার হয়েছেন বটে। কিন্তু বড়কু মিঞার ধারা

থেকেও আরো শিক্ষা সংগ্রহ দরকার। তাই উৎকর্ণ হয়ে বড়কুর অসামান্য সুরশৃঙ্গার শোনেন। তিনি তখন যুবক আর বড়কুর শেষ বয়েস।

উনিশ শতকও শেষ হয়ে আসছে তখন।

বড়কু মিঞা অর্থাৎ আলী মহম্মদ খাঁ সম্পর্কে উজীর খাঁর নানা। কিন্তু মাতামহ সম্বন্ধ হলে কি হয়, আলাদা 'ঘর' তো। তাই নানা বড়কুর কাছে শেখা এমন কি শোনাও কি মুখের কথা? মেজাজ মর্জি সময় অসময় কত ব্যাপার আছে।

তাই সব চেয়ে সুযোগ এই সন্ধ্যের পরে। যখন একলা ঘরে তিনি মৌজ করে বসেন আর হাতে থাকে যন্তর, নিজের ঝোঁকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়ে যান। উজীর তখন হাজির হন নানার ঘরে। যতটা শুনে নেয়া যায়। আর বড়কুও ঠিক বোঝেন তা, যতই ঝিম্ হয়ে থাকুন। সেদিকে হুঁশিয়ার।

তারাপ্রসাদ আসেন আরো আগে, বিকেলে। কাশীতে দিদিমার কাছে থাকেন। নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে আসেন ওস্তাদজীর বাজনা শুনতে। তিনিও শিক্ষার্থী। কিন্তু এলেম্ কিছুই নেই উজীরের মতন। খেটে শেখবার চেয়ে শোনার শখ অনেক বেশি। তবে ওস্তাদজীর পসন্দ্ মাফিক ভেট আনেন। একটি মোহর, এক ভরি আফিঙ আর এক হাঁড়ি টাটকা কালাকাঁদ—উত্তর-ভারতের উপাদেয় মিষ্টান্ন।

তারাপ্রসাদ তাই ঘন ঘন নয়, মাঝে মাঝে আসেন। বড় খুশি হন বড়কু। ছোকরার ওপর নেকনজর রাখেন। শেষ বয়সে আর সব ত্যাগ করে হয়েছিলেন মাত্র অহিফেনসেবী। তারাপ্রসাদের আনা কালাকাঁদ সেজন্যে ভারি মুখরোচক লাগত, মোহরের মতনই। এক ভরি আফিঙেও বেশ চলত কদিন।

রামনগরের সে অঞ্চল তখন নিশুতি, নির্জন। সন্ধ্যের পর চারদিক নিঝুম হয়ে এসেছে। খাঁ সাহেবের আফিঙের মাত্রার সঙ্গে ঠিক ঠিক

যোগ হয়েছে কালাকাঁদের অনুপান। মেজাজ শরিফ্। মৌতাত দেহে মনে মস্তিকে সঞ্চারিত হয়ে উঠেছে। দেয়ালে সেজ বাতির আলো জ্বলছে টিম্‌টিম্ করে।

নিঃসাড় ঝিম্ হয়ে বড়কু বসেছেন। তখন মৌজের আন্দাজে তাঁর হাতে সুরশৃঙ্গারটি তুলে দিয়েছেন তারাপ্রসাদ।

তার বেঁধে নিয়ে খাঁ সাহেবও ঝঙ্কার তুলেছেন। একদিকে একলা বসে মিটিমিটি আলোয় শুনছেন, দেখছেন তারাপ্রসাদ।

চোখ বুজে প্রাণের আরামে ওস্তাদজী বাজাচ্ছেন। মাথা একটুখানি ঝুঁকে। ডান হাতের জবার ওজনে বাঁ হাতের আঙুল চলছে টিপে টিপে, এক তার থেকে আরেক তারে। নায়কী থেকে গান্ধার, পঞ্চম, ঋষভ আবার পঞ্চমের তারে তারে। সা গা পা সা রে পা—ছটি তারে অঙ্গুলি চালনায় সুরের জাল বোনা। মাঝে মাঝে চিকারায় অল্প ঝঙ্কার দিচ্ছেন।

'আঃ, সে কি মিষ্টি হাত! কি অপূর্ব বাজনা! রাগেও তেমনি তাঁর দখল। আলাপে বিস্তারে এমন ভরে উঠছে যে, সুর যেন অশেষ। এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছেন। তবু যেন শেষ নেই এক একটি রাগের। অথচ একঘেয়ে নয়। কত যে রকম। ওঃ, কি সব জিনিসই শুনেছি বড়কুর হাতে! তখন যদি কিছু শিখতে পারতুম! অন্তত স্বরলিপিও করে নিতুম সঙ্গে সঙ্গে! তাহলে সে বাজনার একটু আদল থেকে যেত।...'

এমনি করে তার অনেক বছর পরে স্মৃতিচারণ করতেন তারাপ্রসাদ. নিজের বৃদ্ধ বয়সে।

কলকাতায় তাঁর বীডন স্ট্রীটের বাড়িতে তখন কত বড় বড় আসর বসে। তিনি নিজেই মুজরো দেন কত সেরা ওস্তাদ আর বাইজীকে। সেতার-সুরবাহরী এম্‌দাদ খাঁকে তো বাড়িতে হামে হাল রেখে দিয়েছেন। থেকে গেছেন কালে খাঁ। রেখেছেন ধ্রুপদী দৌলত খাঁকে। সারঙ্গী ছোটে খাঁ কতদিন তাঁর আশ্রয়ে বাস করেছেন।

তাঁরা ছাড়াও, কলকাতায় যত কলাবৎ এসেছেন, কারুর গান বাজনা শুনতে বাকি নেই তারাপ্রসাদের।

তবু নিজের শেষ বয়স পর্যন্ত তিনি ভুলতে পারেননি বড়কু মিঞার সুরশৃঙ্গার। আর সব সেতার সুরবাহার বীণার সুর ছাপিয়ে তাঁর কানে বড়কুর সেই বাজনা ভেসে আসত। তিনি তার বর্ণনা দিতেন, সুখের দিন স্মরণ করে—

'কি উঁচু দরের সেসব আলাপচারী। রাগের রূপ কি চমৎকার বিস্তার করতেন। কত সূক্ষ্ম কত মিষ্টত্ব তাঁর মিড়ের কাজে। আবার কখনো কি গভীর গম্ভীর সুরের দাপট। ঘরটা যেন গম্ গম্ করত। জোড়ের ছন্দের কত বৈচিত্র্য আর বাহার। পাহাড় ভেঙে যেন সুরের ঢল্ নেবে আসছে। হাতের জবা আর আঙুলের টিপে ঝরে পড়ছে অজস্র সুর আর ছন্দ।'

বলতে বলতে ক যুগ পার হয়ে তারাপ্রসাদ নিজেই ফিরে যান সেকালের রামনগরে। সন্ধ্যের পরে বড়কু মিঞার সেই বাজনার ঘরটিতে। নিজের কিশোর বয়সে ওস্তাদজীর সুরশৃঙ্গার বসে বসে শুনছেন। আর দেখছেন তখনকার দৃশ্য।

মাথা একটু নীচু করে চোখ বুজে বড়কু বাজাচ্ছেন। কিন্তু হুঁশ আছে ঠিক। উজীর আস্তে আস্তে এসেছেন। শুনছেন উৎকর্ণ হয়ে। সব জানেন বড়কু। কিন্তু বাজনা বন্ধ করেন না। হাজার হোক উজীর সম্পর্কে তো নওয়াশেক। ছেলেমানুষ। অল্প বয়েসে বাপকে হারিয়েছে। কিছু শুনতে জানতে এসেছে রামপুর থেকে। তবে হ্যাঁ —আমি যেমন শোনাব।

উজীর তো শুধু শুনেই ক্ষান্ত নন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেসও করে নেন তাঁর যা দরকার।

কখনো জানতে চান, 'আপনারা মালকোশ কোথা থেকে ধরেন, নানাজী?'

কখনো বা—'হিন্দোলের চলন কেমন করেন?'

ঝিমন্তু বড়কু আরো সজাগ হন। বাজনাও বাজান, দেখিয়েও দেন বটে। কিন্তু নিজের ইচ্ছা আর মর্জি মতন। দেখান, কিন্তু পুরো নয়। অর্থাৎ খানিকটা হাতে রাখেন। সম্পর্কে নাতি হলে কি হয়, আলাদা 'ঘর' তো। একেবারে আসলটা কি করে দিয়ে দেন! ওস্তাদ বলে তো উজীর বড়কুর নাম করবে না। সবাই জানবে এসব উজীর পেয়েছে হায়দর আলীর কাছে।

উজীরের আবদার করবার আরো কায়দা আছে। নিজের ওস্তাদের নাম করেও দাদার মন টলাবার চেষ্টা করেন, 'ও নানাজী, হায়দর সব বাতাতা নেহি। আপ্ থোড়া বাতাইয়ে...'

রামপুর নবাবের ভাই হায়দর আলী, বিলসীর জমিদার। নিজের ওস্তাদের ছেলে বলে উজীরকে অনেক তালিম দিয়েছেন হায়দর আলী, মুফৎ তো বটেই। তবু তাঁরই নিন্দাচ্ছলে বড়কুর কাছে প্রার্থনা।

চোখ বুজে বাজাবার মধ্যেই মনে মনে হাসেন বড়কু মিঞা। নাতিকে বাতিয়েও দেন। বেশ খেয়াল রেখেই দেখান শোনান কিছু কিছু। রাগের রসে আর আফিঙের মৌতাতে তখন আচ্ছন্ন ভাব। তবু কি হুঁশিয়ার।

উজীর ভাবেন, সব বুঝি পেলেন। কিন্তু তিনি চলে যাবার পর তারাপ্রসাদ যখন বললেন, 'ওস্তাদজী, আপনি উজীর খাঁকে এত বাতিয়ে দিলেন তো?'

তখন বোঝা গেল, ঘরানা দিকপালের আসল মনের ভাব। পেয়ারের শাগীর্দ্‌কে তিনি সরলভাবে জানালেন, 'হাঁ। লেকিন্ নওয়াশেক্‌কা তালিম য্যায়সা হোতা।'

অর্থাৎ অন্য 'ঘরে'র দৌহিত্রকে যেমন শেখানো হয় আর কি। তা কিরকম? পুত্রের মতন, কিংবা ঘরানা শিষ্যের মতন করে শিক্ষা দান নয়। রেখে ঢেকে দেওয়া তালিম। একটু সাজিয়ে মানিয়ে রঙ দিয়ে সেই ফাঁক পূরণ করা। বাইরে থেকে বোঝবার কিছু উপায় নেই।

কথাটির তাৎপর্য যদি তারাপ্রসাদ না ধরতে পারেন, তাই আরো ব্যাখ্যা করে দিলেন, 'আঁয়ে বাঁয়ে সে বাতায়া।'

টীকা—একটু এদিক ওদিক করে দেয়া। প্রাণ ধরে সব ঠিকঠাক বাতানো নয়। ঘরের বিদ্যা যেন একেবারে বাইরে চলে না যায়।

তবু বড়কু মিঞা নিজেই অপুত্রক। আর স্বভাবেও উদার, দিল্-দার। শেখাবার ব্যাপারে পেশাদারী কৃপণতা খুব প্রকট ছিল না। তবু তাঁর প্রকৃত মনোভাব এমনি। সেই পুরনো পেশাদারী রেওয়াজ। পুরুষানুক্রমে চলে আসা ব্যবসায়িক স্বার্থবোধ। দরবারী আমলের চাকুরিসূত্রেই অর্জিত হয়ত সে মতিগতি। অথচ তাঁদের বংশই তখন শেষ হবার মুখে। তানসেনেরই একটি ধারার সমাপ্তি পর্যায় দুই ভ্রাতার সঙ্গীত-জীবনে চলেছে। কিন্তু তখনো তাঁদের বিদ্যা বংশের বাইরে যাবার ভয়! পরম্পরাগত অভ্যাসের কি জড়!

বড়কু মিঞা ও মঝলু মিঞা। একজন অপুত্রক। আরেক জন নিঃসন্তান। তানসেনের এক পুত্রবংশের শেষ দুই মহাগুণী।

বড়কু মিঞা ও মঝলু মিঞা। অর্থাৎ আলী মহম্মদ খাঁ ও মহম্মদ আলী খাঁ। দুজনে সহোদর তাঁরা। একজন কনিষ্ঠ তাঁদের ছিলেন—রিয়াসৎ আলী। কিন্তু তিনি সঙ্গীতজগতের মানুষ ছিলেন না। তাই তাঁদের নাম শোনা যায় না একসঙ্গে। তাঁর নামও কেউ এঁদের সঙ্গে মনে রাখেনি। তবে তাঁর সুবাদেই মহম্মদ আলী হয়েছেন মঝলু। অর্থাৎ মেজো। আর জ্যেষ্ঠ আলী মহম্মদ খাঁ বেশি পরিচিত হন বড়কু নামে।

তাঁদের দুজনের সঙ্গেই তানসেনের একটি ঘর না শেষ হয়ে যায়। সঙ্গীত-জগতে ইতিহাস-সৃষ্টিকারী এক পরিবার এবং পরম্পরাগত এক সঙ্গীতধারারও সমাপ্তি দুই ভ্রাতার সঙ্গে। তাঁদেরও শিষ্যবর্গ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের বংশে যে উচ্চ মানের চর্চা ও যে পরিমাণ বিদ্যা ছিল, তার উত্তরাধিকার কি পেয়েছিলেন শিষ্যরা? আগেকার তুল্য শিক্ষার দানে কিংবা গ্রহণে আর তেমন গভীরতা ছিল কি পরের পর্যায়?

হয়ত তেরো পুরুষ যাবৎ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অবিচ্ছিন্ন ধারায় চর্চিত রাগ বিদ্যা। প্রায় প্রত্যেক প্রজন্মে আচার্য-স্থানীয় কলাবৎ আত্মপ্রকাশ করেছেন। প্রতি পুরুষে ঘরানাদার গুণী। শিশুকাল থেকে আমৃত্যু সঙ্গীতসেবী তাঁরা। তাঁদের অস্থিমজ্জায় সঙ্গীতের সত্তা। প্রতিভার স্ফুরণ হয় যে সাধনা, সংস্কার এবং পরিবেশে, তা তাঁদের প্রত্যেক পর্বে ছিল সগৌরবে বিদ্যমান। আরেকদিক থেকে দেখলে, পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত রক্ষিত সম্পদ। তবে কৃপণের ধনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কারণ কৃপণের উত্তরাধিকারীরা অযোগ্য হলেও ভোগে সক্ষম। কিন্তু এ বিদ্যা সাধন-সাপেক্ষ। অসাধকের আয়ত্তের বাইরে। আরো এক কথা। শেষ দুই বংশধর তাঁদের পরিবারের বহির্ভূত শিষ্যদের কি দান করতে পারলেন পূর্ববর্তীদের তুল্য? তাঁরা নিজেরা যতখানি পেয়েছিলেন? অনেকখানি কি তাঁদের নিজেদের সঙ্গে লুপ্ত হয়ে গেল না? কৃপণের ধনের মতন আগলে রেখেছিলেন। কিন্তু রেখে যেতে পারেননি পরের জন্যে।

যাই হোক, বড়কু মিঞা ও মহম্মদ আলীর পরে এতকালের সেই ঘরানা বিদ্যা পরিবারের বাইরে এসে পড়েছিল। বংশের অতিরিক্ত শিষ্যদের মধ্যে। তাঁর পূর্বপুরুষরা যা কল্পনাও করতে পারতেন না।

একটি ধারার শেষ সেনীয়া অর্থাৎ তানসেনের বংশধর তাঁরা। তবে তাঁদের পরেও তানসেনের অন্য বংশধারা ছিল। যেমন তানসেনের কন্যাবংশে উজীর খাঁ প্রমুখ। কিংবা তানসেনের অন্য পুত্রধারায় তাজ খাঁর বংশ। অবশ্য তাজ খাঁর পরে আর সে বংশে সঙ্গীত ছিল না, যেমন থাকে উজীর খাঁর ধারায়।

জয়পুরের সেতার ঘরানাও তানসেনের এক পুত্র-বংশ।

তবে সেসব অন্য প্রসঙ্গ। এখানে কথা, তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁর শেষ বংশধর নিয়ে। আলী মহম্মদ আর মহম্মদ আলী। বিলাস খাঁর ধারায় শেষ দুই দিকপাল কলাকার। কি করে তাঁদের

ঘরানা বাইরে চলে গেল তার ইতিবৃত্ত। আর সেই সঙ্গে তাঁদের পূর্বপুরুষদেরও কিছু বৃত্তান্ত।

দুজনের মধ্যে বড় গুণী বড়কুই। বেশি বিখ্যাতও তিনি, ওই বড়কু নামে। আলী মহম্মদ বললে অনেকেই তাঁকে চিনবেন না। তেমনি তাঁর ভাই সুপরিচিত মহম্মদ আলী নামে। মঝলু বলে তাঁর নিকট আত্মীয়রা ভিন্ন আর কেউ জানতেন না তাঁকে।

দরবারে আসরে তাঁরা দুজনেই যন্ত্রা। রাগের আবাহন আলাপন করেন যন্ত্রে। বড়কুর সুরশৃঙ্গার—রবাবেরই সংস্করণ। আর মহম্মদ আলীর সাবেক রবাব।

তবে মূলে তাঁরা ধ্রুপদী। তাঁদের সঙ্গীতজীবন ঘরানা ধ্রুপদী শিক্ষায় ধ্রুপদের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। ধ্রুপদ গান নিজেরা শিখেছেন রীতিমত। তানসেনের ধ্রুপদ ধারায় তাঁদের সে বংশগত শিক্ষা। ঘরে তাঁরা সেসব ধ্রুপদ গেয়েও থাকেন। ছাত্রদেরও শোনান বা দেন তালিমের সঙ্গে। আর তাঁদের আসরে বাজনাও সেই ধ্রুপদ রীতিতে বা অঙ্গে। পদ্ধতি অনুসারী, সম্পূর্ণ ধ্রুপদাঙ্গ। ঘরানা ধ্রুপদের সমস্ত রীতিনীতি মেনে বড়কুর সুরশৃঙ্গার, মহম্মদ আলীর রবাব বাজে।

আলী মহম্মদের সুরশৃঙ্গার বাজনার বর্ণনা দিয়েছেন তারাপ্রসাদ ঘোষ। তেমনি মহম্মদ আলীর ঘরোয়া ধ্রুপদ গান গাইবার কথা অন্য সূত্রে জানা যায়।

'খুবই ভাল ছিল মহম্মদ আলী সাহেবের ধ্রুপদ গান। তবে বাইরের আসরে কখনো গাইতেন না। আমাদের বাড়িতে, গৌরীপুরে আর কলকাতায় অনেকবার তাঁর গান শোনার সুযোগ পেয়েছি। আমায় শেখাবার সময়েও তিনি গেয়ে দেখাতেন। বেশ সুরেলা ছিল খাঁ সাহেবের গলা। অত বয়েসেও খারাপ হয়নি। তাঁর গলার আওয়াজ ছিল মাঝামাঝি। ঝিমও নয়, দাপটওলাও নয়। এক একদিন মধুর কণ্ঠে ধ্রুপদ গান আমাদের সামনে গাইতেন। রাগের রূপ, আলাপচারী এসব গেয়েও দেখিয়ে দিতেন।'

এমনিভাবে মঝলু মিঞার গানের বিষয়ে বলতেন তাঁর শেষ শিষ্য বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তবু তো খাঁ সাহেবের শেষ জীবনে বীরেন্দ্রকিশোর তাঁকে পেয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়েস হয়েছে প্রায় ৮৬ বছর। মহম্মদ আলীর মৃত্যুর আগে বছর দুয়েক তাঁকে দেখেন, তাঁর গান শোনেন বীরেন্দ্রকিশোর। তাহলে বয়সকালে খাঁ সাহেবের গানের গলা আন্দাজ করা যায়। এত বড় গুণীবংশের কালানুক্রমিক উত্তরাধিকারী।

অতি দীর্ঘায়ু ছিলেন মহম্মদ আলী খাঁ। দেহান্তের সময় ৮৮ বছর বয়স হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুসন ১৯২৭। সুতরাং জন্ম হয় ১৮৩৯-৪০ সালে।

আর বড়কু মিঞা প্রায় ৭০ বছরে পরলোকগত হন। তাঁর জন্ম মৃত্যু সন সঠিক জানা যায়নি। তবে তিনি বিগত হয়েছিলেন বিশ শতকের একেবারে প্রথম দিকে।

সুতরাং দুজনের জন্ম ১৮৩২-৩৩ থেকে ১৮৩৯-৪০ সালের মধ্যে ধর্তব্য।

এখানে তানসেনের সঙ্গে তাঁর এই দুই শেষ বংশধরের সময়ের হিসেবও করে নেওয়া যায়।

তানসেনের মৃত্যুবছর ১৫৮৯। এটি জানা গেছে আবুল ফজলের সরকারী বিবরণ থেকে। তানসেনের জন্মসন ১৫২০র কাছাকাছি কোন বছরে। অতএব, তাঁর সময় থেকে বড়কুদের দূরত্ব ৩০০ বছরের কিছু বেশি। অর্থাৎ তানসেন থেকে বড়কু ও মঝলু পর্যন্ত ১৩ পুরুষ ধরা চলে।

মনে রাখবার কথা, প্রথম থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত তাঁদের ঘরানা বিদ্যা ধ্রুপদসম্পদ ছিল বংশগত। পারিবারিক সাধনার ধন। একদিকে গণ্ডীবদ্ধ, স্বীকার করতে হয়। কিন্তু তাকে গভীরতা ও ঔজ্জ্বল্য দিয়েছিল সেই কারণেই। এত প্রজন্মের সঙ্গীতচর্চার সমুন্নত মান যদি স্মরণে রাখা যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

সেই প্রথম থেকেই এ বংশে দরবারী সঙ্গীতজীবন। সকল পুরুষের রাজ-আনুকূল্যের ভাগ্য অবশ্য সমান হয়নি, হওয়াও অসম্ভব। কোথায় রাজা রামচাঁদের বান্ধবগড় দরবারে তানসেন আর গিধৌড়ে মহম্মদ আলী। দরবার এবং দরবারী দুয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কারণ, তে হি নো দিবসা গতা। তা সত্ত্বেও একই প্রকৃতি ও ধারা। শেষ পর্যায় পর্যন্ত দরবার-নির্ভর সঙ্গীতচর্চা।

এতকালের দরবারী জীবনের ফলেই হয়ত পেশাদারী স্বার্থবোধের জন্ম। যেন প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা না দিতে পারে। পরেও যেন দরবারে বিশিষ্ট গুণীর স্থান পায়—পুত্র। এজন্যে বিদ্যার অধিকারী শুধু পুত্রকেই করা হত। জামাতাও সে হিসেবে অপর বংশীয়। পুত্রের অবর্তমানে জামাতার ভাগ্য প্রসন্ন হওয়া সম্ভব।

এই ছিল পেশাদারী কলাবৎ বংশে রেওয়াজ। সেনীয়ারাও ব্যতিক্রম নন।

কিন্তু পরিবর্তন ঘটে কালের গতিতে। দরবারী নির্ভরতা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে। লোপ পেয়ে যায় পরে। আর পেশার প্রয়োজনেই দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়। নতুন পরিবেশে নতুন রীতির সঙ্গীত-ব্যবসায়ী। তবু এতকালের পুরনো মানসিকতার শিকড় থেকে যায় অলক্ষ্যে। অথচ বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে-বনিয়ে নিতেও হয়। আর সেই নতুনের মধ্যেও আত্মগোপন করে থাকে পুরাতন।

বড়কুর মতন উদার স্বভাব, পুত্রও নেই। কিন্তু সেই আগেকার আমলের অভ্যাস। পেশাদারী ঐতিহ্যের রেশ। নিকট আত্মায় বংশের উজীর খাঁকেও—'আঁয়ে বাঁয়ে সে বাতায়া।'…

দরবারী আমল তখন শেষ হয়ে আসছে সঙ্গীতজগতে। সমাসন্ন আধুনিক কাল। সেই যুগান্ত বা যুগসন্ধি পর্বের প্রতিভূ দুই কলাবৎ—আলী মহম্মদ ও মহম্মদ আলী খাঁ। তাঁরা দুজনেই, বিশেষ মহম্মদ আলী, চোখের সামনেই সঙ্গীত দরবার শেষ হতে দেখেছিলেন।

দুজনে দরবারেও থাকেন নিযুক্ত কলাবৎ। আবার বংশের বাইরে পেশাগত তালিমও দেন। অনাত্মীয় ছাত্র করেন সঙ্গীত-ব্যবসায়ী হিসেবে।

তাঁদের দুজনের কলাকার জীবনে সেকালের ও একালের মেশামিশি। আরো এক প্রকার ঘটনাচক্র। অনাত্মীয় শিষ্যবর্গ তাঁরা অপুত্রক হয়ে করেছিলেন। পুত্র থাকলে কতখানি উদার হতেন, বলা কঠিন।

সে যা হোক, তাঁদের মধ্যে বড়কুর জীবনে দরবারের স্থান ছিল অনেক বেশি। সমকালীন দুটি শ্রেষ্ঠ রাজসভায় তিনি সসম্মানে কাটিয়ে যান। প্রথমে নেপালের রাণা দরবারে। তারপর কাশী-নরেশের সঙ্গীতসভায়। বারাণসীর মহারাজা তো তাঁকে সঙ্গীত-গুরুর মতন মানতেন। তবু বড়কুকে কেন শিষ্য করতে হল, তা বলা যাবে তাঁর জীবনকথায়।

জ্যেষ্ঠের মতন দরবারী দাক্ষিণ্য মহম্মদ আলী পাননি। বড়কুর মৃত্যুতে কাশী-নরেশের দরবারে থাকেন কিছুদিন। তাঁর পেশাদারী জীবনের অনেক বছর গিধৌড়েই কেটেছিল, সেখানকার জমিদারের নিযুক্ত বাদক হয়ে। তিনি ছাত্রদের শেখাবার সুবাদে লক্ষ্ণৌ, রামপুর, বাংলাদেশে ক বছর ছিলেন।

এমনি করে তিন শতাধিক বছরের উত্তরাধিকার তাঁদের হাতেই বংশের বাইরে চলে যায়।...

তানসেনের এই পুত্রবংশে ধ্রুপদ গান আর রবাব বাদন। জামাতার বংশে বীণার সাধন, ধ্রুপদ চর্চার সঙ্গেই। পুত্রধারার অন্ত পর্যায়েও শোনা গিয়েছিল রবাবের ছন্দঝঙ্কার। শেষ রবাবী মহম্মদ আলী—দরবারী যুগেরও অবশেষ।

দরবারে রবাব বাদকদের বিশিষ্ট আসন-রীতি ছিল। এই বইতে প্রকাশিত ছবিতেও সেই কায়দায় যন্ত্র নিয়ে বসেছেন মহম্মদ আলী। বাজনাটি কিন্তু রবাব নয়—শরদ। গৌরীপুরে ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়

চৌধুরীর গৃহে এই ছবি নেওয়া হয়েছিল। তখন রবাব যন্ত্রের অভাবে তিনি হাতে নেন শরদ। কিন্তু স-যন্ত্র দরবারী ধরনে বসেন। সেজন্যে চিত্রটি দরবারী আসরের স্মারক।

তানসেন-বিলাস তাঁর বংশতালিকা সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। কিন্তু শেষ পর্যায় থেকে ওপরের ক পুরুষের নাম পরিচয় জানা গেছে সঠিক-ভাবে। যেমন আলী মহম্মদ ও মহম্মদ আলীর পিতা বাসৎ খাঁ, যার মৃত্যুসন ১৮৮৭। বাসৎ খাঁর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জাফর ও প্যার। তাঁদের তিনজনের পিতা হলেন ছজু খাঁ। ছজু খাঁর পিতা গোলাব খাঁ, যিনি মোগল শক্তির ভগ্নদশার সময় বাদশা মহম্মদ শার (১৭১৯-১৭৪৮) দরবারী ছিলেন। সে সময় মহম্মদ শার দরবারে বীণ্‌কার ছিলেন তানসেনের জামাতা-বংশীয় ন্যামৎ খাঁ ওরফে সদারঙ্গ।

গোলাব খাঁর পিতার কথাও জানা যায়—হাসান খাঁ। কিন্তু হাসান খাঁর ঊর্ধ্বতন থেকে বিলাস খাঁ পর্যন্ত নিশ্চিত তালিকা পাওয়া যায়নি।

দিল্লী দরবারে তানসেনের এই পুত্রধারার শেষ গুণী গোলাব খাঁ। সঙ্গীতপ্রেমী বাদশা মহম্মদ শার পর দিল্লীর মোগল দরবার প্রায় ভেঙে যায়।

গোলাব খাঁর বংশধররাও তখন দিল্লী ত্যাগ করে যান বলে প্রকাশ। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছজু খাঁ পূরবীয়া হয়ে লক্ষ্ণৌতে বাস করতে থাকেন, শোনা যায়। তিনিও ধ্রুপদী রবাবী। ছজু খাঁ নাকি বারাণসীতেও আসতেন কখনো কখনো। তখন থেকে তাঁরা বিভিন্ন দরবারে ভাগ্যান্বেষী।

ছজু খাঁর তিন পুত্র জাফর, প্যার ও বাসতের সময় কাশীতে তাঁদের আসা-যাওয়া অনেক বেশি হত। সকলেই তাঁরা ধ্রুপদ-গায়ক, রবাব-বাদক। আর কাশীর রাজদরবারের সঙ্গেও যোগাযোগ তখন থেকে। শোনা যায়, কাশী-নরেশের একটি দরবারী আসরেই জাফর খাঁ প্রথম সুরশৃঙ্গার বাজিয়েছিলেন। রবাব থেকে

সুরশৃঙ্গারের প্রথম গঠনকর্তা তিনিই। রবাবের চামড়ার জায়গায় স্টিল প্লেট আর তাঁতের বদলে স্টিলের তার—এই হল সুরশৃঙ্গার। ধাতুর তার ও প্লেট যোগে আধুনিক এই যন্ত্রে সুর আরো সূক্ষ্ম আর রেশ হয় বেশী স্থায়ী। কিন্তু পুরনো রবাবে স্বরধ্বনির গাম্ভীর্য অধিক। ছন্দের ঐশ্বর্য দেখাবারও বেশি সুবিধা রবাব যন্ত্রে।

জাফর খাঁ রবাব ছেড়ে সুরশৃঙ্গার বাজাতে লাগলেন। তবে রবাবের চর্চাও রয়ে গেল তাঁদের বংশে। জাফরের পুত্র কাজাম আলী, ভাই বাসৎ খাঁ আর তাঁর পুত্র মহম্মদ আলী রবাব নিয়ে রইলেন। আবার বাসৎ খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বড়কু সাধন-যন্ত্র করলেন সুরশৃঙ্গারকে।

যতদূর জানা যায়, বাংলার সঙ্গে এই তানসেন বংশের প্রথম যোগাযোগ বাসৎ খাঁর সময় থেকে।

লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহকে বড়লাট লর্ড ডালহাউসি নির্বাসন দণ্ড দিয়ে পাঠালেন মেটিয়াবুরুজে। কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে, ১৮৫৬ সালে। তার দু'বছর পরে নবাবের বিখ্যাত মেটিয়া-বুরুজ দরবার গড়ে উঠল (১৮৫৮)। তার হয়ত আট-ন বছর পরে নবাব ওয়াজেদ আলী তাঁর দরবারে নিযুক্ত করলেন বাসৎ খাঁকে। বাসৎ খাঁ সপরিবারে মেটিয়াবুরুজে বাস করতে লাগলেন।

সেই সঙ্গে বড়কু আর মহম্মদ আলীও।

বাংলাদেশে বাসৎ খাঁ আর বড়কুদের বৃত্তান্ত দেবার আগে এই বংশের বিখ্যাত তন্ত্রকার কাসিম আলী খাঁর কথা একটু জানাবার আছে। কারণ তিনিও তাঁদের সমকালীন। আর বাংলায় ছিলেন তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত।

বাসৎ খাঁ নবাব ওয়াজেদ আলীর দরবারে যোগ দেবার কিছু পরেই আসেন কাসিম আলী খাঁ। তিনি হলেন বাসৎ খাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর (প্রথম সুরশৃঙ্গার বাদক) জাফর খাঁর পৌত্র।

কাসিম আলী রবাবী এবং বীণ্‌কার। এতবড় গুণী যন্ত্রী পশ্চিম থেকে বাংলায় অল্পই এসেছিলেন, এমন কথা প্রচলিত আছে।

বাসৎ খাঁর সঙ্গে মেটিয়াবুরুজে কিছুকাল থাকবার পর তিনি চলে যান অন্যত্র। বাংলায় নানা দরবারেই কাসিম আলীর জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়ে যায়। পঞ্চকোট রাজার কাশীপুর দরবারে, ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিকের রাজসভায়। শেষে ঢাকার ভাওয়াল দরবারে। ভাওয়ালের জয়দেবপুরেই কাসিম আলির জীবনান্ত হয়েছিল। তাঁর হাতের স্বর-যন্ত্রও থেকে যায় ভাওয়ালে।

গল্প আছে, বাংলারই এক রাজসভায় যখন নিযুক্ত ছিলেন কাসিম আলী, তখন সেখানে বিখ্যাত যদু ভট্টও থাকেন। যদু ভট্ট ধ্রুপদ গায়ক বটে, কিন্তু সেতারও বাজাতেন। পিতা মধুসূদন ভট্টের দৃষ্টান্তে আর শিক্ষাতেই তাঁর সেতারচর্চার সূত্রপাত। তা সেই দরবারী জীবনে কাসিম আলী যখন নিজের ঘরে বীণায় রিয়াজ করতেন, যদু ভট্ট আড়াল থেকে সব শুনতেন। আর তুলে নিতেন পরে। একদিন তিনি রাজাকে সেতার শোনাচ্ছেন। তার মধ্যে ছিল কাসিম আলীর সেই সব ঘরানা জিনিস। এমন সময় কাসিম আলী হঠাৎ সেখানে এসে পড়েন। যদু ভট্টকে জিজ্ঞেস করেন, 'এসব আপনি কোথা থেকে পেলেন ?'

যদুকে স্বীকার করতে হল, 'আপনারই শুনে শেখা।'

কাসিম আলী বললেন, 'মহারাজ, আমি আর এখানে থাকব না। আমায় বিদায় দিন।'

কোন কোন মতে, এ ঘটনা ঘটে ত্রিপুরায়। আর, কাশীর ধ্রুপদী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের 'সঙ্গীতে পরিবর্তন' পুস্তিকায় এই ধরনের বিবরণ আছে পঞ্চকোট দরবারের কথায়।

যাই হোক, কাসিম আলীর কথা, বাসৎ খাঁর প্রসঙ্গ আরেকটি কারণে স্মরণযোগ্য। তা হল, একটি সমসাময়িক বিবৃতিতে কাসিম আলীকে তানসেনের বংশধর বলে উল্লেখ।

কাসিম আলী, সুতরাং তাঁর নিকট-জ্ঞাতি বাসৎ খাঁও, যে তানসেন বংশীয় তার এই নির্ভরযোগ্য নজির উদ্ধৃত করবার মতন

এবং লক্ষণীয়। কারণ, পরবর্তীকালের কোন কোন মহলে এমন প্রচারও হয়েছে যে উক্ত গুণীরা যে তানসেনের বংশধর তার প্রমাণ কি ?

বিবরণটি দিয়েছেন উনিশ শতকের বিখ্যাত সাংবাদিক, 'Rais and Rayat,' 'Mukherjee's Magazine' প্রমুখ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তা ছাড়া, মুর্শিদাবাদ দরবার, পঞ্চকোট রাজা আর ত্রিপুরা মহারাজারও দেওয়ানী কাজ শম্ভুচন্দ্র করেছিলেন। কাসিম আলীর কথা তিনি এইভাবে লিখেছেন তাঁর 'Travels and Voyages between Calcutta and Independent Tripura' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৪৬)—'…a celebrated musician, Kasim Ali Khan by name, descendant of the historic Tansen of Akbar's court…The Mussalmans of Lucknow, from which Kasim Ali comes—via the King of Oudh's colony, Calcutta—are famous for 'tall talk' and Kasem Ali Khan avails himself to the full of his birthright, but for drawing the long bow, this adopted son of Aesculapius from Mymensingh will be a match for all the Muhammedan musicians any day…His woman of a wife (as he latterly made her, who had been a public singer and of course of the demi monde)…'

এখানে 'তানসেনের বংশধর' বলে বিবৃত কাসেম আলীর খুল্ল পিতামহ বাসৎ খাঁও অতএব সেনীয়া।

এখন বাসৎ খাঁ ও তাঁর পুত্রদের কথা। সে সময় তাঁরা রয়েছেন মেটিয়াবুরুজে।

বাসৎ খাঁ শুধু নবাব ওয়াজেদ আলীর দরবারেই যুক্ত ছিলেন না। তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল কলকাতার সঙ্গীতসমাজের সঙ্গেও।

১৮৬৭ সালে যে বৃহৎ সঙ্গীত সম্মেলন হয়েছিল কলকাতায়, সেখানেও তাঁর যোগ দেবার কথা জানা যায়। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-প্রাসাদের সেই মহতী অনুষ্ঠানের উদ্‌যোগী ছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। সম্মেলনের সঙ্গীত-তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা, সিদ্ধান্ত ইত্যাদির ফলে রচিত এবং পরের বছর প্রকাশিত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর 'সঙ্গীতসার' পুস্তকে বাসৎ খাঁর লেখা একটি প্রশংসাপত্রও দেখা যায়। এ সবই বাসৎ খাঁর সঙ্গে বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রের সংযোগের উদাহরণ।

বাসৎ খাঁ মেটিয়াবুরুজে কতদিন থাকেন, জানা যায় না। সে সময় বড়কুর বয়স ৩০ উত্তীর্ণ এবং মহম্মদ আলীরও ২০ বছরের বেশি। সুতরাং তাঁদের পিতার কাছে তালিম অনেকখানিই হয়েছিল, অনুমান করা যায়। সঙ্গীত-ব্যবসায়ীর বংশে বাল্যকাল থেকেই তো সঙ্গীত শিক্ষার সূচনা। মহম্মদ আলী পিতার কাছে শিক্ষা যে পরে তাঁদের গয়া অঞ্চলে বাস করবার সময়েও পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে যথাস্থানে উল্লেখ থাকবে।

মেটিয়াবুরুজ বাসের পর বাসৎ খাঁ বাংলার আরেকটি সঙ্গীতকেন্দ্র রাণাঘাটেও থাকেন। এখানে তিনি ছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রেমী পরিবার পাল চৌধুরীদের আশ্রয়ে, তাঁদের সঙ্গীতসভায় নিযুক্ত হয়ে।

রাণাঘাটে থাকবার পর বাসৎ খাঁ বাংলা দেশ থেকে বিদায় নেন। সেই শেষ পর্বে তিনি হন টিকারী নিবাসী।

বিষ্ণুতীর্থ গয়াধামের আট ক্রোশ দূরে টিকারী জমিদারী। সেই সঙ্গীতপ্রিয় ভূম্যধিকারীর আনুকূল্যে বাসৎ খাঁর অবশিষ্ট জীবন স্বচ্ছন্দে চলে যায়। এমন সাচ্ছল্য তথা নিরাপত্তা তিনি পাননি কখনো।

বাসৎ খাঁ শুধু সঙ্গীতপ্রবীণ ছিলেন না। পণ্ডিত ব্যক্তিও, সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ। একটি সঙ্গীত-গ্রন্থ তিনি সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেন ফার্সীতে। মহম্মদ আলীর কাছে সেই পাণ্ডুলিপি ছিল।

টিকারীর জমিদার বাসৎ খাঁকে অনেক বিষয়সম্পত্তি দেন গয়া জেলায়। ভাল আয়ের ব্যবস্থা করেন তাঁর জন্যে।

বড় সুখে শান্তিতে শেষ জীবন পর্যন্ত সঙ্গীত সেবা করে যান বাসৎ খাঁ। সেই টিকারীতে। খুব বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বেশ সক্ষম ছিলেন। বংশানুক্রমে তিনিও ধ্রুপদী, রবাবী। তবে ডান হাতের বাত-ব্যাধিতে ত্যাগ করতে হয় রবাব বাজনা। কিন্তু ধ্রুপদ গানের চর্চা বরাবরই রাখেন। টিকারীতে শেষ পর্বেও। আর, দুই পুত্রকে গড়ে দেন বংশের যোগ্য করে। দুজনেই পান ধ্রুপদের সঙ্গে রবাবের ঘরানা তালিম।

সঙ্গীতস্বভাবেও বাসৎ খাঁর উদারতার পরিচয় আছে। তাঁর এক ছাত্র হয়েছিলেন বংশের বাইরে। মেটিয়াবুরুজে থাকবার সময় শরদী নিয়ামৎ উল্লাকে তিনি তালিম দিয়েছিলেন। আর, রাণাঘাটে পাল চৌধুরীদের সভায় থাকবার সময় সেতারী বামাচরণ ভট্টাচার্যকেও কিছু দিন। এ বিষয়ে বাসৎ খাঁ নিয়মের ব্যতিক্রম বলা যায়।

বাসৎ খাঁর পরমায়ু ছিল খুব।

মহম্মদ আলী বলতেন, 'বাবার বয়েস হয়েছিল একশো বছর।'

যদি কিছু অতিশয়োক্তি হয়, তাহলেও তার কাছাকাছি মনে করা চলে। বাসৎ খাঁর মৃত্যুসাল নিশ্চিত জানা যায়—১৮৮৭।

টিকারীতে যখন বাসৎ খাঁর মৃত্যু হল, বড়কুর বয়স সে সময় ৫০ পার হয়ে গেছে। আর মহম্মদ আলীর এসেছে পঞ্চাশের কাছে।

তখন দুজনে সঙ্গীতেও প্রবীণ। আর, বিশেষ বড়কুর নাম ওয়াকিবহাল দরবারে আসরে পরিচিত ছিল। বংশের গৌরবে আর নিজের সঙ্গীতগুণেও। দুজনেই ধ্রুপদে প্রাজ্ঞ এবং আসরে যন্ত্রী। বড়কু নিয়েছিলেন সুরশৃঙ্গার। আর মহম্মদ আলী রবাবই রেখেছিলেন। দুজনের মধ্যে মহত্তর গুণী হয়েছিলেন বড়কু।

বাসৎ খাঁ যা বিষয়সম্পত্তি রেখে যান, পুত্রদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সবই নষ্ট হয়ে যায় বড়কুর জন্যে।

পিতার মৃত্যুর পরই বড়কুর অন্য স্বভাব প্রকাশ পায়। তিনি যেমন ভোগবিলাসী তেমনি দিলদরিয়া, অমিতব্যয়ী হয়ে উঠলেন। নিজে অপচয়ের সঙ্গে ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে খাই খিলাই ইত্যাদি করতে লাগলেন মহা ধুমধামে।

এইভাবে টিকারী রাজার দেয়া ধনসম্পত্তি দু'বছরের মধ্যেই বড়কু নিঃশেষ করে দিলেন।

সর্বস্বান্ত অবস্থা হল বটে। কিন্তু শিল্পী হিসেবে আত্মসচেতন, আপন ব্যবসায়িক মূল্য বিষয়ে সজাগ বড়কু। জানতেন, অনেক দরবারই তাঁর গুণের কদর করবে। বিপাকে পড়বেন না অর্থাভাবে।

তখনো দরবারী যুগে একেবারে যবনিকা পড়েনি।

বড়কু খবর পাঠাতে লাগলেন পেশাদার মহলে। ভাল দরবার হলে তিনি যোগ দিতে পারেন। দরবারী কলাকার হতে আপত্তি নেই তাঁর।

কিছুদিনের মধ্যেই নেপাল থেকে আমন্ত্রণ এসে গেল। নেপালের প্রধান মন্ত্রীর রাণা দরবার। সেই হিমালয় রাজ্যে তখনো রাজার চেয়ে প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা অনেক বেশি। রাজদরবারের চেয়ে রাণা দরবারের গৌরবও তেমনি। রাণারা ভারতীয় সঙ্গীতের রীতিমত আদর করেন। ভারতের কয়েকজন নামী গুণীকে সম্মানের সঙ্গে রেখেছেন দরবারে। উচ্চমানের সঙ্গীতচর্চা সেখানে হয়ে থাকে।

সেই রাণা দরবার থেকে আহ্বান পেলেন বড়কু মিঞা। আর রাজি হয়ে নেপাল চলে গেলেন।

সে দরবারে রয়েছেন তখন সেনীয়া গায়ক তাজ খাঁ, প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার গায়ক-বাদক রামসেবক মিশ্র, তানসেনের মাতুল গদাধর মিশ্রের মহাগুণী বংশধর লছমনদাস মিশ্র, শরদী নিয়ামৎ উল্লা খাঁ প্রমুখ দিকপালরা।

আলী মহম্মদ খাঁ সে সভার শোভা আরো বৃদ্ধি করলেন। সসম্মানে রইলেন রাণা দরবারে।

কিন্তু খুব বেশিদিন বড়কু নেপালে থাকতে পারলেন না। তাঁর নিজের অসুবিধের জন্যেই। প্রচণ্ড শীত এই হিমগিরি রাজধানীতে। তখন তাঁর বয়েসও হয়েছে। কষ্ট হয় এত ঠাণ্ডায়। তা ছাড়া, তাঁর ভাল লাগে অন্য ধরনের জীবন। অন্য ধরনে থাকা। অনেকের সঙ্গে মিলে বেশ খরচপত্র করে আমোদে কাটানো। কাঠমাণ্ডুতে হয়ত তেমন পরিবেশের অভাব বোধ করলেন।

তখন তাঁর মনে পড়ল কাশীর কথা।

বারাণসীর রাজাদের সঙ্গে তাঁদের অনেক দিনের খাতিরের সম্পর্ক। আগেকার পুরুষ থেকে কাশী দরবারের সঙ্গে সম্বন্ধ।

এখন প্রভু নারায়ণ সিং কাশী-নরেশ (১৮৮৯-১৯৩২)।

তাঁর কাছে প্রশ্নের আকারে সংবাদ এল :—বড়কুকে কি তাঁর দরবারে প্রয়োজন হতে পারে? তিনি পর্বত-রাজ্য থেকে নেমে সমতলের কোন দরবারে যুক্ত থাকতে ইচ্ছুক।

বিলক্ষণ। এ তো আনন্দের কথা কাশী দরবারের পক্ষে। সেনীয়া ঘরের এক রত্ন, বাসৎ খাঁর হাতে গড়া জ্যেষ্ঠ পুত্র। এ দরবারে তাঁকে নিশ্চয় প্রয়োজন। বারাণসীতে তিনি স্বাগত।

বড়কু তখন প্রবীণ-বয়সী। কাশী-নরেশের সভায় সেই যে এলেন, জীবনান্ত পর্যন্ত স্থায়ীভাবেই রয়ে গেলেন।

মহারাজা প্রভু নারায়ণের রামনগর দরবারে তখন ছিলেন কজন বিখ্যাত কলাবৎ। ধ্রুপদী আলী বখ্‌স্, ধ্রুপদী দৌলৎ খাঁ, তাজ খাঁর ভাগিনা তসদ্দ্‌ক হোসেন প্রমুখ। তাঁদের মধ্যমণি হলেন আলী মহম্মদ।

কাশী-নরেশ তাঁকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করলেন। সঙ্গীত-গুরুর মর্যাদা দিলেন, যা আগে এ দরবারে পেয়েছিলেন বীণ্‌কার সাদিক আলী। বড়কুদেরই বংশের তিনি। জাফর খাঁর মহগুণী পুত্র সাদিক আলী।

প্রাসাদের কাছেই মহারাজা বড়কুকে বাসস্থানও দিলেন। দরবারে

যোগ দেয়া ছাড়াও শিষ্য করবার তিনি সুবিধা পেলেন বারাণসীতে। কারণ তাঁর আরো অর্থের প্রয়োজন। বড়ই সুখ-ভোগী, বিলাসী তাঁর স্বভাব। তা তাঁর সব অভাব কাশীতে মিটল।

বড়কু বাস করতে লাগলেন মনের আরামে। বারাণসীর গঙ্গাপারে রামনগরে।

বিশাল তোরণ-গৃহ থেকে আরম্ভ করে নানা ভবন প্রাঙ্গণ সমবায়ে কাশী-নরেশের প্রাসাদ এলাকা, রামনগরে। তার মধ্যে গঙ্গাতীরের এক অট্টালিকায় তাঁর সঙ্গীতের দরবার বসে। দোতলার সেই বিরাট সুসজ্জিত কক্ষে। সামনেই উন্মুক্ত গঙ্গা-দৃশ্য।

রামনগরের সে দরবারী চিত্রশোভার মধ্যে ঝাড়লণ্ঠন দেয়াল-গিরির নীচে শুরু হয় বড়কুর আসর। সুরশৃঙ্গারে তাঁর সুমিষ্ট হাতের রাগালাপ। কত সন্ধ্যা কত রাত মায়াময় হয়ে ওঠে কাশী-নরেশের দরবার।...

আলী মহম্মদের সব শিষ্যই বারাণসী বাসের পর্বে। রামনগরে সেই বাড়িটিতেই তাঁর শিষ্য-সেবকরা আসেন।

শাগীর্দ্, খিদ্মদ্গাররা আসা-যাওয়া সেবাযত্ন করবে, ভেট দেবে তৃপ্তিকর—এসব ভালবাসেন বড়কু। কাশীতে সেসব বেশ হতে থাকে। অনেকেই আসে শিক্ষার আশায়। যার যোগ্যতা আছে সে-ই পায়।

সেই অনেকের মধ্যে তাঁর উল্লেখ করবার মতন শিষ্য কয়েকজন মাত্র। তাঁদের নাম করা যায় এখানে। এ ব্যাপারে একটি লক্ষ্য করবার বিষয়—দারিদ্র্য-দোষ তাঁর কোন শিষ্যর নেই। তাঁরা সকলেই অভিজাত, ধনীর পুত্র কিংবা বিশেষ সচ্ছল, সৌখীন।

বড়কু মিঞার প্রধান আর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য—সৈয়দ মীর। জলন্ধরের এক বনিয়াদী পরিবারের সন্তান তিনি। বারাণসী নিবাসী হয়ে কয়েক বছর বড়কুর তালিম ভালভাবে পান। নৌকাযোগে নিয়মিত সৈয়দ মীর যেতেন রামনগরে। ওস্তাদজীর আস্তানায়

উপযুক্ত উপঢৌকন আনতেন। উপরন্তু মেজাজী বড়কুকে পরিতুষ্ট রাখতেন খিদ্‌মদ্‌গারিতে। আর সেনীঘরের ধ্রুপদ, রাগালাপ যথাসাধ্য লাভ করতেন।

পাটনার জমিদার, সৌখীন সেতারী প্যারে নবাব খাঁ ওস্তাদজীর আর এক ছাত্র।

তখনকার প্রতিষ্ঠিত বীণ্‌কার নান্নে খাঁও পান বড়কুর শিক্ষা।

বারাণসীর গুণী বীণাবাদক মিঠাইলালেরও অন্যতম ওস্তাদ তিনি।

কাশীর সম্পন্ন জৈন পান্নালালও বড়কুর কাছে শেখেন।

বারাণসীর কৃতী কবিরাজ অর্জুনদাস বৈদ্য তাঁর আরেক শিষ্য। অর্জুন বৈদ্য চিকিৎসক বলে বড়কুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। তারপর চিকিৎসার সঙ্গে তাঁর শিক্ষায় হন সৌখীন সেতারবাদক।

আরো কয়েকজন ছাত্র থাকেন বড়কুর। কিন্তু মেধা বা সাধনার অভাবে তাঁরা কিছু লাভ করতে পারেননি।

রামপুরের উজীর খাঁর কথা বলা হয়েছে প্রথমেই। তিনিও তাঁর কাছে একরকমে শেখেন। প্রতিভাবান তন্ত্রকার, তানসেনের জামাতা বংশের শেষ দিকের এক রত্ন। রামপুরে হায়দর আলীর হাতে গড়ে ওঠেন উজীর। তবু রামপুর থেকে মাঝেমাঝেই কাশীতে আসেন। হাজির হন বড়কুর ঘরে।

আর একটি কিশোরও আলী মহম্মদের কাছে শিক্ষার্থী হয়ে আসেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীতে একমাত্র বাঙালী। নাম তারাপ্রসাদ ঘোষ। কলকাতার এক অভিজাত, সংস্কৃতিবান বংশের সন্তান তিনি। ইংরাজীতে কবিতা রচনার জন্যে প্রসিদ্ধ, 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' সাপ্তাহিক পত্রের (প্রথম প্রকাশ ১৮৪৬, ১৬ই নভেম্বর) প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষের পৌত্র তারাপ্রসাদ। হেদুয়া-বীডন স্ট্রীটের উত্তরে তাঁদের প্রাসাদোপম ভবন কাশীপ্রসাদের সাংস্কৃতিক নানা কার্যধারায় স্মৃতি-ধন্য। পরবর্তীকালের কলকাতায় তারা-প্রসাদের উচ্চমানের সঙ্গীতাসরের জন্যেও প্রসিদ্ধ হয় সে বিশাল স্তম্ভ-

শোভন সদনটি। তারাপ্রসাদের পিতামহ কাশীপ্রসাদ (১৮০৯-১৮৭৩) বাংলা টপ্পা গান, ইংরেজী কবিতা-পুস্তক 'শায়ির অ্যাণ্ড্ আদার পোয়েমস' (১৮৩০), প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'মেময়ার্স অফ নেটিভ ইণ্ডিয়ান ডিনাস্টিস' (১৮৩৪) প্রভৃতির রচয়িতা-রূপেও বিখ্যাত। অতি রূপবান পুরুষ কাশীপ্রসাদ বহিরঙ্গ সৌন্দর্যের জন্যে কলকাতার সাহেব-মেম সমাজেও প্রিয় ছিলেন বলে কথিত।

সেই কাশীপ্রসাদের বিধবা পত্নী শেষজীবনে কাশীবাস করতেন। তখন তাঁর সঙ্গে থাকতেন আদরের পৌত্র তারাপ্রসাদ। তাই কিশোর বয়সেই বারাণসীতে তাঁর সঙ্গীতচর্চারও সূচনা। সেসময় শ্রীরামপুরের গোস্বামী বংশীয় ধ্রুপদগুণী রামদাস গোস্বামীও কাশী-নিবাসী ছিলেন। তাই প্রথম জীবনে তারাপ্রসাদ কিছুদিন ধ্রুপদ গান শেখেন রামদাসের কাছে, কাশীতে।

তারপর তারাপ্রসাদ বড়কুর কাছে যেতেন। তখনো তাঁর অতি তরুণ বয়স। সঙ্গীতে আকর্ষণ আছে, শিক্ষাতেও আগ্রহ। কিন্তু ধনীর দুলাল, শ্রমে অপারগ। তাই বড়কুর সুরশৃঙ্গারের টানে গঙ্গা পার হয়ে আসা আর বাজনা শোনা পর্যন্তই হয়। আর থাকে তার মূল্যবান স্মৃতি।

একটি মোহর, এক ভরি আফিঙ আর এক হাঁড়ি কালাকাঁদ ভেট দিয়ে তারাপ্রসাদ বসে বসে শোনেন বড়কু মিঞার সুরশৃঙ্গার।

তাঁর সামনেই এক-একদিন এসে বসেন উজীর খাঁ। নানাকে কখনো জিজ্ঞেস করে নেন, 'আপনাদের মালকোশ কোথা থেকে ধরেন?' কিংবা 'হিন্দোলের চলন কেমন হয়?'

আফিঙের মৌতাতের সঙ্গে বাজাতে বাজাতে দেখিয়েও দেন বড়কু।

তারপর উজীর খাঁ চলে গেলে তারাপ্রসাদের কথায় জানান, 'আঁয়ে বাঁয়ে সে বাতায়া।'

এমনিভাবে বড়কু মিঞার দিন যায় শেষ জীবনে, রামনগরে।

তাঁর শিষ্য বলা চলে, আগে যাঁদের নাম করা হয়েছে। তাঁরা সবাই অনাত্মীয়, বংশের বাইরের লোক।

তাঁর পুত্রসন্তান ছিল না, কেবল এক কন্যা। বড়কুর নিজের দৌহিত্রের সঙ্গীতজীবন বলতে কিছুই হয়নি।

বিশ শতকের প্রথম দিকে বড়কুর মৃত্যু হল রামনগরে। মহম্মদ আলী তখন গিধৌড়ে।

বড়কু যেমন নেপাল আর বারাণসীর দরবারে আশ্রয় পান, তেমন ভাগ্য মহম্মদ আলীর দেখা যায়নি। তবে তাঁর প্রয়োজনের মাত্রাও বড়কুর মতন ছিল না আর তিনি একলা মানুষ বলে খুব কষ্টে পড়েননি কখনো।

মহম্মদ আলীর পরিণত জীবনের সময় যুগপরিবর্তনের পদসঞ্চার ঘটছিল। দরবারী সঙ্গীতচর্চায় আর তার কলাকারদের জীবনে। দরবারের সংখ্যা আর দাক্ষিণ্য ক্রম-সঙ্কুচিত। এতকালের গুণী পোষণের ধারা শুষ্কপ্রায়। অথচ সাধারণ্যেও সঙ্গীতপ্রেম এমন নয় যে, কলাবন্তের জীবনে নিরাপত্তা সম্ভব।

সেই সন্ধিক্ষণের অনিশ্চয়তার মধ্যে মহম্মদ আলীকে পড়তে হয়েছিল। পুরনো ধারার বিশীর্ণ প্রবাহেই তিনি একাকী বেয়ে চলেন জীবনতরণী। এক প্রাচীন ঐতিহ্যের শেষ দৃশ্য তাঁর জীবনের সমাপ্তি পর্বেই অভিনীত হয়ে যায়।

বাসৎ খাঁর মৃত্যুর দু বছরের মধ্যে বড়কু পৈতৃক বিষয়আশয় উড্ডীন করে ফেললে, বিপাকে পড়েন মহম্মদ আলী। তারপর ক'বছর তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। সেসময় নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ছিলেন না, অনুমান হয়। না হলে এক কথায় গিধৌড়ে চলে যান কি করে?

তা হল, ১৮৯৭-৯৮ সালের কথা। বাসৎ খাঁর মৃত্যুর পর তখন দশ বছর চলে গেছে।

সেবার শোনপুরে হরিহরছত্রের মেলায় এসেছেন গিধৌড়ের

দেওয়ান। জমিদারের জন্যে হাতি কিনবেন। আরো যদি কিছু পছন্দসই জিনিস পাওয়া যায়, নেবেন তাঁর জন্যে।

সে যাত্রায় কি করে তাঁর মহম্মদ আলীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আলাপ থেকে পরিচয়। দেওয়ানজী তাঁর প্রভুর মতন নিজেও সঙ্গীতপ্রিয় এবং বোদ্ধা। অনেক গুণীজনের সংবাদও রাখেন।

কথায় কথায় শুনলেন মহম্মদ আলীর বৃত্তান্ত। তাঁর রবাব বাদনে গুণপণাও দেখলেন।

সন্তুষ্ট হয়ে দেওয়ানজী মহম্মদ আলীর কাছে প্রস্তাব করলেন, 'খাঁ সাব, আপনি আমাদের গিধৌড় দরবারে থাকবেন চলুন।'

মহম্মদ আলী তখনি রাজি হলেন। বললেন, 'বেশ, তাই হবে।'

সেই হরিহরছত্রের মেলা থেকেই মহম্মদ আলী গিধৌড় চলে গেলেন, দেওয়ানজীর সঙ্গে।

গিধৌড়ে রাজদরবার নেই। তবে সিংজীর ভাল আয়ের জমিদারী সেখানে। ছোটখাটো রাজার মতনই অবস্থা। আর সঙ্গীতের জন্যে জমিদারের প্রেম যেমন, তেমনি মুক্ত-হস্ত।

বিহারের একটি গণ্ডগ্রাম গিধৌড়। ঝাঁঝা-শিমুলতলার কাছে। সেখান থেকে অনেক দূর অঞ্চলেও সিংহজীর জমিদারী বিস্তৃত। তাঁরই দেওয়ান হরিহরছত্রের মেলায় গিয়েছিলেন হাতি কিনতে। সেই সঙ্গে মহম্মদ আলী গিধৌড়ে এলেন।

খাঁ সাহেবের সঙ্গীতগুণে অনুরাগী, শ্রদ্ধাবান হলেন সিংহজী। তাঁকে সঙ্গীতসভায় স্থায়ীভাবে রেখে দিলেন।

মফস্বলের হলেও তাঁর দরবারের সাঙ্গীতিক মান বেশ উচ্চাঙ্গের। দশেরার উপলক্ষে এখানে সঙ্গীতের বিরাট উৎসব হয় এক পক্ষকাল। সেই ১৫ দিনের আসরের জন্যে তিনি ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করে থাকেন। ভারতের নানা কেন্দ্রের কলাবৎরা তখন আমন্ত্রিত হয়ে আসেন গিধৌড়ে। সেখানে যাঁরা গান-বাজনা করে গেছেন তাঁদের মধ্যে ইন্দোরের বীণ্‌কার বন্দে আলী খাঁ, সেতারী সুরবাহারী এমদাদ

খাঁ, শরদী করামৎউল্লা খাঁ, শরদী কৌকব খাঁ, ধ্রুপদ-খেয়াল-গুণী রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামী, গোয়ালিয়রের সেতারী আমীর খাঁ, বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পাগায়ক ও সুরবাহার-বাদক রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম করা যায়।

মহম্মদ আলী যোগ দেবার পর দশেরার আসরে তো বাজাতেনই রবাব। তা ছাড়া, সারা বছরের নিয়মিত কলাকার রইলেন।

বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা গিধৌড়। এখানে জীবনের ৩০ বছর মহম্মদ আলী থেকে যান। প্রায় ৮৮ বছরে মৃত্যু পর্যন্ত বাস করেছিলেন খুব সুস্থ শরীরে, একেবারে শেষের কিছুদিন ছাড়া অবশ্য।

তবে ৩০ বছর তিনি এখানে থাকেননি একাদিক্রমে।

কারণ গিধৌড় বাসের সময়েই মহম্মদ আলী তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। গিধৌড় থেকে তখন চলে যেতেন শিষ্যদের কাছে। সেসব জায়গায় অবস্থান করে তাঁদের শিক্ষা দিতেন। কয়েক মাস সেখানে থেকে, ফিরে আসতেন গিধৌড়ে।

যেমন বড়কুর তেমনি তাঁরও সব ছাত্ররা অনাত্মীয়। তাঁদের বিদ্যা দান করতে মহম্মদ আলী যেতেন রামপুর, লক্ষ্ণৌ, গৌরীপুর আর কলকাতায়।

বড়কুর তুলনায় তাঁর শিষ্যসংখ্যাও আরো কম। বলতে গেলে, চারজন মাত্র। তাঁদের মধ্যে কেবল দুজন ক্রিয়াশীল সুরশৃঙ্গার-বাদক। একজন সৌখীন ধ্রুপদী, প্রধানত তাত্ত্বিক। আর একজনের শিক্ষার চেয়ে খাতায় ধ্রুপদ সংগ্রহেই আগ্রহ ছিল বেশী।

মহম্মদ আলীর প্রথম প্রধান শিষ্য রামপুরের সাদৎ আলী খাঁ। ছম্মন সাহেব নামে যিনি সঙ্গীতজগতে সুপরিচিত। রামপুর নবাব বংশীয় হায়দর আলীর পুত্র তিনি। সেনীয়া এক দিকপাল সুরশৃঙ্গারবাদক বাহাদুর হোসেনের শিষ্য হায়দর আলী। সেই পিতার তালিমেই গড়া ছম্মন সাহেব।

শিক্ষা, সাধনা এবং প্রতিভা—সবই ছম্মনের উচ্চ মানের ছিল।

তবু হায়দর আলী নিজেই পুত্রকে বলেছিলেন, 'যতই হোক, তানসেন বংশের কারুর কাছে তালিমও দরকার।'

তানসেনের বংশে এদিকে তখন মহম্মদ আলী ভিন্ন আর কাউকে তাঁরা পাননি। তাঁর কাছেই বন্দোবস্ত হল ছম্মনের আরো সেনী ঘরানা শিক্ষার।

ছম্মন সাহেব মহম্মদ আলীর রীতিমত নাড়া-বাঁধা শিষ্য হলেন।

গিধৌড় থেকে মাঝে মাঝে রামপুর আসতেন মহম্মদ আলী। বেশ কিছুদিন, কখনো কয়েক মাস থেকে ছম্মনকে তাঁর দরকার মতন ধ্রুপদ গান আর আলাপ পদ্ধতি দিতেন। তখন ছ-সাত বছরের মধ্যে একেকবার ক'মাস করে মহম্মদ আলী থাকতেন রামপুরে। শিষ্যদের মধ্যে ছম্মন সাহেবই ওস্তাদের কাছে সব চেয়ে বেশি পেয়েছিলেন।

মহম্মদ আলীর দ্বিতীয় শিষ্যও রামপুরে। তিনি হলেন ডাক্তার লক্ষ্মণ গঙ্গাধর নাটু। ছম্মন সাহেবের জন্যে রামপুরে থাকবার সময় তাঁকেও মহম্মদ আলী বিদ্যাদান করতেন। এখানকার নবাব পরিবারের চিকিৎসক লক্ষ্মণ গদাধর নাটু। লক্ষ্ণৌয়ে তাঁর পৈতৃক নিবাস। সেখান থেকে চিকিৎসার কাজে রামপুরে আসেন। সঙ্গে নিয়ে সঙ্গীতের অনুরাগ, নিষ্ঠা ও আগ্রহ। বহু ঘরানা ধ্রুপদ ও আলাপচারী খাঁ সাহেবের কাছে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। তবে ধ্রুপদ গায়ক হননি ডাক্তার নাটু।

মহম্মদ আলীর তৃতীয় শিষ্য ঠাকুর নবাব আলী। সঙ্গীত-বিষয়ক নানা কার্যধারার জন্যে ঠাকুর নবাব আলী লক্ষ্ণৌতে সুপরিচিত হয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌর নিকটে যে আকবরপুর তারই জমিদার বংশীয় তিনি। ক'পুরুষ আগে তাঁরা হিন্দু ছিলেন, তারই স্মারক 'ঠাকুর' উপাধিটি তাঁদের নামের সঙ্গে যুক্ত থেকে যায়। সৌখীন হলেও সত্যিকার গুণী নবাব আলী। ছম্মন সাহেবের অকালমৃত্যুর পর নবাব আলীকে ধ্রুপদ গান ও রাগালাপ দিয়েছিলেন মহম্মদ আলী,

লক্ষ্ণৌতেই। গায়ক না হলেও ঠাকুর নবাব আলী ধ্রুপদ ও আলাপ পদ্ধতিতে প্রবীণ হয়েছিলেন। সঙ্গীতে ছিল তাঁর বিদ্বানের অন্তর্দৃষ্টি। 'ম আরি ফুন্নাগমাৎ' নামে একটি সঙ্গীত-গ্রন্থের লেখক তিনি। মহম্মদ আলীর দেওয়া শতাধিক ধ্রুপদ নবাব আলী প্রকাশ করেছিলেন সে পুস্তকে। লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজ প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্‌যোগী এবং পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাটখণ্ডের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলেও ঠাকুর নবাব আলী স্মরণীয় হয়ে আছেন।

মহম্মদ আলীর কনিষ্ঠতম শিষ্য বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। বাংলার সুপরিচিত সুরশৃঙ্গার, বীণা ও রবাব বাদক। বীরেন্দ্র-কিশোরের সমকালে রবাব বাজাতে আর কাউকে বিশেষ দেখা যায়নি। রবাবের তালিম তিনি ধ্রুপদ গানের সঙ্গে পেয়েছিলেন মহম্মদ আলীর কাছেই।

ওস্তাদজী তাঁর শিষ্যদের কথায় বীরেন্দ্রকিশোরকে বলতেন 'চৌথা'। অর্থাৎ মহম্মদ আলীর তিনি চতুর্থ শিষ্য। তানসেন বংশের এই ধারার শেষ গুণীকে তাঁর জীবনসায়াহ্নে বীরেন্দ্রকিশোর পেয়েছিলেন। মহম্মদ আলীর মৃত্যুর দেড় বছর আগে, বয়স তখন তাঁর পঁচাশি-ছিয়াশি বছর। তরুণ বীরেন্দ্রকিশোরের তখন প্রথম সঙ্গীত-জীবন। তা হল, ১৯২৫ সালের কথা। তাঁর পিতা ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের ভূম্যধিকারী ব্রজেন্দ্রকিশোর সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতসেবক এবং সঙ্গীতগুণীদের উদার পৃষ্ঠপোষক। মহম্মদ আলীকেও ব্রজেন্দ্রকিশোর গৌরীপুরের সঙ্গীত-সভায় নিযুক্ত করেন। বীরেন্দ্রকিশোরকে শিক্ষাদানের জন্যে।

মহম্মদ আলী সেই বৃদ্ধ বয়সেও বেশ সক্ষম শরীর ছিলেন। স্মৃতি-শক্তি অক্ষুন্ন, শিক্ষাদানে পটু এবং তৎপর। প্রথম বার তিনি ক'সপ্তা গিধোড় থেকে ছুটি নিয়ে গৌরীপুরে থাকেন, বীরেন্দ্রকিশোরকে তালিম দেবার জন্যে। পরের বার মাস তিনেকের জন্যে কলকাতায় ও গৌরীপুরে আসেন। ব্রজেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে থেকে শেখান তাঁর পুত্রকে। তৃতীয় বার তাঁদের সঙ্গে কলকাতা ও গিরিডিতে মাস

চারেক থেকে যান। এই কয়েকবারই মহম্মদ আলীর তালিম পান তরুণ বীরেন্দ্রকিশোর।

মহম্মদ আলীর পরে আরো অনেক প্রথম শ্রেণীর কলাবতের কাছে বীরেন্দ্রকিশোর শিক্ষা করেছিলেন। যেমন, দারবঙ্গের শরদী আবদুল্লা খাঁ, তাঁর পুত্র শরদী আমীর খাঁ, শরদী করামৎ উল্লা খাঁ, সেতারী এনায়েৎ খাঁ, স্বনামপ্রসিদ্ধ আলাউদ্দিন খাঁ, শরদী হাফিজ আলী খাঁ, বীণ্‌কার দবীর খাঁ প্রমুখ। তবু জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত রায়চৌধুরী মহাশয়ের মনে উজ্জ্বল হয়ে ছিল মহম্মদ আলীর সঙ্গীতস্মৃতি। খাঁ সাহেবের কাছে পাওয়া ধ্রুপদ গান বীরেন্দ্রকিশোর গেয়ে শোনাতেন। সুরশৃঙ্গারে বাজিয়ে দেখাতেন মহম্মদ আলীর আলাপচারীর পদ্ধতি। তাঁর সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা বীরেন্দ্র-কিশোরের বরাবরই ছিল। ওস্তাদজীর সঙ্গীতসঙ্গ তাঁর সঙ্গীত-জীবনের এক শ্রেষ্ঠ অধ্যায় স্বরূপ জ্ঞান করতেন তিনি।

মহম্মদ আলী তৃতীয় বার তাঁর কাছে থাকবার পর লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলেন। তখনো তিনি এমন সুস্থ-দেহ যে একলা বেশ ট্রেনযাত্রা করতেন গিধৌড় থেকে কলকাতা। এখান থেকে গিরিডি। কলকাতা থেকে লক্ষ্ণৌ। কিন্তু সেবার লক্ষ্ণৌতে কিছুদিন পরেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

তখন তাঁকে কলকাতায় আনা হল চিকিৎসার জন্যে। মেডিক্যাল কলেজে পরীক্ষা করে তাঁর রোগের বিষয়ে জানাও গেল। সে ব্যাধির চিকিৎসা তখনকার দিনে ছিল না। ক্যান্‌সার, পাকস্থলীতে।

কিন্তু খাঁ সাহেবকে রোগের নাম জানানো হয়নি।

করবার কিছু নেই। অন্তিম ক্ষণ আসন্ন।

তখন কথা হল—পরিবারবিহীন ওস্তাদজী কোথায় থাকবেন? কার কাছে পাবেন শেষ কয়েকটি দিনের সেবা যত্ন শুশ্রূষা—আশ্রয়?

কিন্তু এই তানসেন বংশধরের তেমন কোন আত্মীয়স্বজনকে দেখা গেল না।

তখন সকলে ভাবলেন গিধৌড়ের কথা।

সেখানে আছে মহম্মদ আলীর দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অভ্যস্ত অনুকূল পরিবেশ। সিংহজীর অকৃপণ দাক্ষিণ্য, সহৃদয়তা। তাঁর সহায়তায় খাঁ সাহেবের জানাশোনা সেবকও সেখানে পাওয়া যাবে। বিশেষ তাঁর সেই পুরনো খিদ্‌মদ্‌গারকে। সব দিক থেকেই গিধৌড় তাঁর উপযুক্ত স্থান। তিনি নিজেও সেখানে থাকতে ইচ্ছুক।

সুতরাং গিধৌড়েই তাঁকে পাঠিয়ে দেয়া হল।

তানসেন বিলাস খাঁর ধারায় শেষ দিক্‌পাল ধ্রুপদী-রবাবী মহম্মদ আলী। সরলপ্রাণ নিরভিমান কলাবৎ। সেই ১৯২৭ সালের গিধৌড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।...

তাঁদের ঘরানা ধ্রুপদ-সম্পদ বাংলায় কিছু পান বীরেন্দ্রকিশোর। আর এক সূত্রেও তা বাংলাদেশে আসে। আরো কিছু পরে। মহম্মদ আলীর কাছ থেকেই তা প্রাপ্ত, কিন্তু পরোক্ষে।

সে প্রসঙ্গের বিবরণ এইরকম—

মহম্মদ আলী তখন গিধৌড়ে কয়েক বছর বাস করছেন। এমন সময়কার কথা। নিঃসঙ্গ বর্ষীয়ান খাঁ সাহেবকে সেবা পরিচর্যা করবার জন্যে একজনকে পাওয়া যায় সেখানে। সেই দরিদ্র খিদ্‌মদ্‌গারটি হিন্দু ছিল। গিধৌড়ের হাটে একজন তৈল বৃত্তিধারী। সেই সূত্রেই দুজনের মধ্যে আলাপ-পরিচয়। ওস্তাদজী তাকে স্থানীয় হাটে প্রথমে পেয়েছিলেন।

তারপর মহম্মদ আলী তাঁর আস্তানায় নিয়ে আসতেন তাকে। তেল মালিশ থেকে নানা সেবাযত্ন করিয়ে নিতেন। ক্রমে সেই সেবককে গৃহেও স্থান দিলেন আত্মজনের মতন। তার এক পুত্র ও একটি কন্যা। তারাও সেই সঙ্গে খাঁ সাহেবের আশ্রয়ে আসে।

ওস্তাদজীর আশ্রয়ে বাস করবার ক'বছর পরে দেখা যায় মুসলমান হয়ে গেছে লোকটি। কিভাবে ধর্মান্তরিত হয় এবং তা অনুষ্ঠানিক কিনা, সে বৃত্তান্ত জানা যায়নি। মুসলমান সংসর্গে, একই

গৃহে বাস করার ফলে হিন্দুসমাজচ্যুত হয়ে যায় হয়ত। খাঁ সাহেবের অন্তিমকালেও সে নিকট আত্মীয়ের মতন কাছে থাকে। সেবা শুশ্রূষা যত্ন করে শেষ পর্যন্ত। বয়সে তাকে খাঁ সাহেবের পুত্র পর্যায়ের বলা যায়। আর তাঁর স্নেহও লাভ করে পুত্রবৎ।

সে ব্যক্তির সঙ্গীতে কোন প্রবণতা বা চর্চা ছিল না, একথা বলা দরকার। অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, তার সেই পুত্রের পরে সঙ্গীতজ্ঞ এবং তন্ত্রকাররূপে পরিচিতি হয়েছিল।

মহম্মদ আলীর ধর্মান্তরিত সেবকের সেই পুত্র শৈশবে থাকে তাঁর পরিবেশের প্রভাবে। হয়ত তারই ফলে এবং স্বভাবের প্রেরণায় বালকের সঙ্গীত-জীবনের স্ফুরণ হয়। বয়সের সঙ্গে বিকশিত হয়ে ওঠে তার সঙ্গীত-সত্তা।

মহম্মদ আলীর আশ্রিত সে কিশোরটিকে পরবর্তীকালের কলকাতায় যন্ত্রবাদকরূপে দেখা যায়। নাম সৌকত আলী। সুর-শৃঙ্গার যন্ত্রের শিল্পী হিসাবে পরিচিত হন কলকাতার সঙ্গীতসমাজে। সৌকত আলীর কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হওয়া ছাড়া সঙ্গীত বিষয়ে আরো কার্যাবলী উল্লেখ করবার যোগ্য। তার আগে, একথা বলে রাখা যায় যে, মহম্মদ আলী গত হয়েছিলেন সৌকতের বাল্যকালে। তার বয়স তখন হবে সাত বছর। ওস্তাদজীর তালিমের সুযোগ বালকের হয়নি।

তবে বয়ঃপ্রাপ্ত সৌকত আলী লাভ করেছিলেন এই সেনীয়া বংশধরের অনেক ধ্রুপদ সংগ্রহ। মহম্মদ আলীর নিকটে যে ধ্রুপদ গীতাবলী সংগৃহীত ছিল তার পাণ্ডুলিপি। তারও কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত আছে।

মহম্মদ আলীর সেই খাতাপত্র মূল্যবান সংগ্রহ ছিল, বলা বাহুল্য। সেজন্যে তাঁর কোন কোন আত্মীয়ের সেদিকে নজর ছিল, শোনা যায়; যদিও তাঁকে সেবাযত্ন করবার কিংবা শেষ বয়সে তাঁর দায়িত্ব নেবার জন্যে কাউকে পাওয়া যায়নি।

হয়ত সেকথা বিবেচনা করেই মহম্মদ আলী স্বেচ্ছায় সেসব পাণ্ডুলিপি দান করেন তাঁর সেবককে।

কিন্তু সে দানে খাঁ সাহেবের ভাগিনার আপত্তির কথা জানা যায়, 'মামা, ঘরের দামী জিনিসপত্র সব আপনি পরকে দিয়ে দিচ্ছেন?'

তিনি জবাব দেন, 'হ্যাঁ, কেন দেব না? আমার আপনার লোক তো কেউ আমায় দেখলে না। ও আমার সেবা করে। দেখাশোনা করে। আর এতকাল ধরে খিদ্‌মদ্‌গারি করেছে। তাই ওকেই এসব আমি দিয়ে যাচ্ছি।'

সেই সব লিখিত বিদ্যার উত্তরাধিকারী হন সৌকত আলী। পরে সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে পাণ্ডুলিপিগুলির সদ্ব্যবহারও করেছিলেন।

সৌকত আলী কলকাতাবাসী হয়েছিলেন পেশাদারী সঙ্গীত-জীবনে। বীরেন্দ্রকিশোর তখন পরিণতবয়সী এবং সঙ্গীতজগতে সুপ্রতিষ্ঠ, সম্মানিত গুণী। সঙ্গীতজ্ঞদের সম্পর্কে পিতা ব্রজেন্দ্র-কিশোরের উপযুক্ত উদার স্বভাব তিনি লাভ করেছিলেন। সৌকতকে তিনি আনুকূল্য করেন নানাভাবে, মহম্মদ আলীর উত্তরাধিকারী জ্ঞানেও। বীরেন্দ্রকিশোরের স্বীকৃতি ও সৌজন্যের ফলে সৌকত কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে স্থান পেতে থাকেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্রে সুরশৃঙ্গার ও বীণা যন্ত্রবাদনের নিয়মিত শিল্পী দেখা যায় তাঁকে। 'সেনী সঙ্গীত সমাজ' নামে একটি সংস্থা আর 'সঙ্গীত প্রেস'ও সৌকত আলী স্থাপন করেন। দুটিই উত্তর কলকাতায় হরি ঘোষ স্ট্রীটে, তাঁর বাসাবাড়িতে। বেশ করিৎকর্মা ছিলেন সৌকত আলী এবং একনিষ্ঠ সঙ্গীত-সেবী। নিজের সেই মুদ্রণালয়ে মহম্মদ আলীর পাণ্ডুলিপি থেকে ধ্রুপদগুলি তিনি পর্যায়ক্রমে মুদ্রিত করতে থাকেন। বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন তানসেনের সেসব ঘরানা ধ্রুপদ গীতাবলী। সেজন্যে সৌকত নতুন করে বাংলা শেখেন, কারণ বাংলা তাঁর মাতৃভাষা ছিল না। এইভাবে, বীরেন্দ্রকিশোরের সহায়তায়, তিনি কয়েক খণ্ড প্রকাশ করেন 'সেনী গীতিমালা'।

ধ্রুপদের স্বরলিপিও সৌকত আলী সেই সঙ্গে দেন। কিন্তু সেই গ্রন্থাবলী প্রকাশ সম্পূর্ণ হবার আগেই সৌকত আলীর মৃত্যু ঘটে কলকাতায়, ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ বছর বয়সে।

মহম্মদ আলীর ঘরানা ধ্রুপদ গানের কিছু পরিচয় সেই 'সেনী গীতিমালা' খণ্ডগুলিতে পাওয়া যাবে। সৌকত আলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত না করলে সে সমস্তই লুপ্ত হয়ে যেত, যেমন অনেক কিছু গেছে অনেক সঙ্গীতসাধকের দেহপটের সঙ্গে।...

এখন মহম্মদ আলী খাঁর আর কটি স্মৃতিকথা জানাবার আছে।

জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি তখন প্রথম এসেছেন ব্রজেন্দ্র-কিশোরের গৌরীপুর আবাসে। বীরেন্দ্রকিশোরের তালিম তাঁর কাছে আরম্ভ হয়েছে। খাঁ সাহেবের সেই ছিয়াশি বছর বয়সেও ছিল বেশ সুস্থ, সুপটু শরীর। প্রতিদিন তিনি দেড়-দু ক্রোশ অক্লেশে ভ্রমণ করতেন।

গৌরবর্ণ ঈষৎ খর্বকায়, মেদ-বাহুল্য বর্জিত শরীর তাঁর। বেশভূষায় সাধাসিধা। কিন্তু ভোজন-বিলাসী। তাঁর নিজেরই নানাপ্রকার রন্ধনে নৈপুণ্য দেখা যেত। আর সখ ছিল মাছ ধরার। আর স্বভাবে, সঙ্গীতের ধ্যানী। ধীর, শান্তিপ্রিয়, অহমিকাশূন্য অন্তর। যথার্থ শিল্পীপ্রাণ। এইরূপেই সে সময় দেখা যায় তাঁকে। আর তাঁর স্মৃতি-চারণের সূত্রে পূর্ব বৃত্তান্তও কিছু জানা যায়। মহম্মদ আলীর পুরনো দিনের সঙ্গীতজগতের নানা কাহিনী। সেই সঙ্গে তাঁদের পারিবারিক সঙ্গীতচর্চার কিছু কথাও।

যেমন তাঁর পিতা বাসৎ খাঁর প্রসঙ্গ। বাসৎ খাঁর কাছে তিনি কিরকম ভাবে তালিম পেতেন তাও একদিন বলেছিলেন। তাঁর শেখার হিসেব।

'বাবার কাছে মাসে চারটি রাগের তালিম পেয়েছি। বছরে পঞ্চাশটি।'

সেই ভাবে চোদ্দ-পনের বছর তিনি বাসৎ খাঁর কাছে শেখেন,

টিকারীতে থাকবার সময়। তার আগে, মেটিয়াবুরুজেও অবশ্য শিক্ষা তাঁর হয়েছিল, বড়কুর সঙ্গে।

মহম্মদ আলী নিজেও বীরেন্দ্রকিশোরকে বেশ যত্ন করে শেখাতেন। গেয়ে দেখাতেন রাগের আলাপচারী। ধ্রুপদের বন্দাশ শোনাতেন। তাঁর গলার আওয়াজ মাঝামাঝি। অর্থাৎ ঝিম্‌ও নয়, তেজীও নয়। আর মিষ্টত্ব ছিল। শুনে দ্রুত স্বরলিপি করে নিতেন বীরেন্দ্রকিশোর। সে ক্ষমতা তাঁর প্রথম থেকেই দেখা যায়। তিনি রবাবেরও তালিম পেয়েছিলেন ওস্তাদজীর কাছে।

এমনিভাবে বীরেন্দ্রকিশোর খাঁ সাহেবের কাছে পান ইমন কল্যাণ, হাম্বীর, শুদ্ধ কল্যাণ, দরবারী কানাড়া, দেশ, মূলতান, ভীমপলশ্রী প্রভৃতি।

মহম্মদ আলী এই 'চৌথা' শিষ্যকে প্রথমে দিয়েছিলেন হাম্বীর আর ভীমপলশ্রী।

হাম্বীর ওস্তাদজীর বড় প্রিয় ছিল। শুধু হাম্বীর না বলে, তিনি বলতেন—হাম্বীর কল্যাণ।

অনেকবারই তাঁর মুখে শোনা যায়, 'হাম্বীর কল্যাণ আমি খুব বাজাই। এটা আমার সখ।'

সে হাম্বীরে কল্যাণই বেশি। শুদ্ধ মধ্যম দিয়ে উত্তরাঙ্গে তার আবাহন, রূপায়ণ।

মহম্মদ আলী স্নেহ করতেন তরুণ বীরেন্দ্রকিশোরকে। তাঁর ব্যবহারে আন্তরিকতা ছিল।

সেই শেষবার লক্ষ্ণৌ যাবার সময় বলেছিলেন 'ফিরে এসে তোমায় বিলাসখানি তোড়ি দেব। এটা আমাদের ঘরের জিনিস।'

তাঁরই পূর্বপুরুষ তো বিলাস খাঁ, তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র। একথা তিনি অনেকদিন বলেছেন। আর তোড়ি রাগের এই প্রকার-ভেদ বিলাস খাঁর গঠন।

কিন্তু সে বিলাসখানি তোড়ি দেবার অবসর আর পাননি বিলাস খাঁর এই শেষ বংশধর।

লক্ষ্ণৌ থেকেই ক্যানসার-আক্রান্ত দেহে কলকাতায় ফিরলেন। তারপর গিধৌড়ে সেই শেষযাত্রা।···

বংশের ধারায়, আজীবন সাধনায় মহম্মদ আলীর সঙ্গীত বিষয়ে যে অন্তর্দৃষ্টি জন্মেছিল, তার পরিচয় অনেক সময় পাওয়া যেত।

তেমনি একটি অমূল্য কথা তিনি অন্তিম পর্বের শিষ্য বীরেন্দ্র-কিশোরকে জানিয়েছিলেন, 'ধুরাপদ হ্যায় কুঞ্জি।' অর্থাৎ ধ্রুপদ হল এখনকার ভারতীয় সঙ্গীত ভাণ্ডারের চাবিকাঠি। ধ্রুপদ জ্ঞানের চাবির সাহায্যে রাগবিদ্যার ধারণা করা যায়। ধ্রুপদ সঠিক আয়ত্ত হলে রাগের গঠন, চলন জানবার বোঝবার কোন অসুবিধা আর হবে না। ধ্রুপদের চলনের দৃষ্টান্ত মহম্মদ আলী দেখাতেন রাগালাপে।

রাগ সঙ্গীতের ভিত্তি হল ধ্রুপদ।

তানসেন-বিলাস খাঁর বংশ থেকে সেই কুঞ্জি বেরিয়ে এসেছে।

রাগবিদ্যার মহাতোরণ উন্মুক্ত করবার চাবি এখন প্রকাশ্য, বৃহত্তর ক্ষেত্রে। ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য তারই সাধনলব্ধ হওয়া সম্ভব— 'যে তাহারে দিতে পারে মান।'

ভুলে গেলে বলে বলে দিও

লালচাঁদ বড়াল

গ্রামোফোনের একবারে প্রথম দিকের কথা। কলকাতায় রেকর্ড তৈরী তখন সবে আরম্ভ হয়েছে। সে সময় খুবই বিখ্যাত হয়েছিল এই গানখানি। কিন্তু রেকর্ডটির একটি জায়গা শুনে বড় মজা লাগত। গানটির সুখ্যাতি করত সবাই। তবে সেই কথাটি নিয়ে খুব হাসাহাসি হত।

গানের মধ্যেই যখন গায়ক হঠাৎ বলে উঠেছেন—'ভুলে গেলে বলে বলে দিও।'

এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! তারপরই আবার গান ধরেছেন যথারীতি।

সেকালে অনেক কাণ্ড করতে হত একটি রেকর্ড তৈরির জন্যে। তাই আবার নতুন করে রেকর্ড হল না। গানের মধ্যেই রয়ে গেল— 'ভুলে গেলে বলে বলে দিও' গায়কের এই সুরহীন কথা ক'টি।

শ্রোতাদের অনেকেরই কিন্তু জানা ছিল না তার কারণ কি। বাইরে থেকে কৌতুকের মনে হলেও অন্যদিকে তা কি বিয়োগান্তক! গায়কের ঘনিষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ মহলই কেবল জেনেছিলেন।

সেই যে শঙ্করা রাগের রেকর্ডটি। দাদরা তালের একটি বাংলা খেয়াল—

তোমার ভাল তোমাতে থাক···

গেয়েছিলেন সেকালের খুবই জনপ্রিয় এক গায়ক।

কেমন যেন অস্বাভাবিকভাবে গানখানি আরম্ভ করেছিলেন। অনেকটা তারানার তোম্ তায় নোম্ ধরনের শোনায় বটে। কিন্তু সতর্ক হয়ে শুনলে বোঝা যায় তারানার বোল্ নয়। গায়ক জড়িত কণ্ঠে সুর ধরেছেন এই বলে—'এ তারে ভোল কেন'···

ওইটুকু স্খলিত স্বরের পরই গানের আরম্ভ—

'তোমার ভাল তোমাতে থাক'···

কিন্তু কি আশ্চর্য! স্থায়ীর এই প্রথম পঙক্তি গেয়েই তিনি বলে উঠলেন, 'ভুলে গেলে বলে বলে দিও।'

তারপরই ঠিক গাইলেন স্থায়ীর বাকি অংশটি—

'আমায় ত তার ভাগ দেবে না॥'

আর কোন গোলযোগ নেই। যথারীতি আবার 'তোমার ভাল তোমাতে থাক। আমায় ত তার ভাগ দেবে না' গেয়ে, উদাত্ত কণ্ঠে ধরলেন অন্তরা—

'যে আগুনে জ্বল্‌ছি রে প্রাণ
বুঝেও তুমি তা বোঝ না॥'

গানের ডৌল ঠিক এসে গেছে। তেমনি ওজস্বী গলায় এবার শিল্পী গাইতে লাগলেন—

'এ জ্বালাতে জ্বল্‌ছি যত
বুঝেও তুমি বুঝ না ত,
আমি কাঁদছি যত তুমি হাসছ তত'

ইত্যাদির শেষে 'বুক ফাটে ত মুখ ফাটে না।'

পরে আর একবার গানের মুখটি গেয়ে, সমের ঝোঁকটি সশব্দে দেখিয়ে সমাপ্ত করলেন। গান-ভঙ্গ আর হল না।

সেকালের শ্রোতাদের প্রিয় ছিল গানখানি। কিন্তু কেন যে গায়ক গান থামিয়ে 'ভুলে গেলে বলে বলে দিও' বলে ওঠেন, আবার গান ধরেন, অনেকের কাছেই তা রহস্য থেকে যায়। ভুলে তো সত্যিই যাননি। গানখানি শেষ পর্যন্ত গেয়েছিলেন সঠিক।···

সময়টি হল বিশ শতকের সূচনা। গ্রামোফোন ব্যবসায়ের আদি পর্ব তখন। আর গায়কের নাম—লালচাঁদ বড়াল। রেকর্ড জগতে সেসময় অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা তাঁর।

শুধু গ্রামোফোনে নয়। বৃহত্তর সঙ্গীতক্ষেত্রেও লালচাঁদ এক

স্বনামধন্য শিল্পী। ওজস শক্তিতে পূর্ণ তাঁর সঙ্গীত-কণ্ঠ। আর দৃপ্ত তান কর্তবের জন্যেই চিহ্নিত ছিলেন তিনি। সেই ভরাট গলায় বৈদ্যুতিক তান তরঙ্গ বাংলা গানের জগতে আলোড়ন এনেছিল। তাঁর আগে আর কোন বাঙালী শিল্পী এমন তানের ঝলক দেখাননি। বাংলা গানের মধ্যেই তিনি প্রদর্শন করেন অভিনব টপ্‌খেয়াল চালের তান-লীলা। খেয়াল অঙ্গে টপ্পার দানাদার তান। সংক্ষিপ্ত আকারের বাংলা খেয়াল ধরনের গানে তিনি অতি সার্থক শিল্পী ছিলেন সে যুগে। তাঁর প্রসাদে, দৃষ্টান্তে বাংলা টপ্‌খেয়াল ও ছোট খেয়াল আসরে সসম্মানে স্থান পায়।

লালচাঁদের প্রাণবন্ত তানবৈচিত্র্য শক্তি সঞ্চার করেছিল বাংলা গানে। আর গ্রামোফোন রেকর্ড তাঁর প্রতিভার এক বাহন হয়েছিল।

লালচাঁদের সেই সব গানের রেকর্ডগুলি 'রেকর্ড' করেছিল বিক্রয়ের হিসাবে। জনপ্রিয়তায়ও। তাঁর নানা রেকর্ড কয়েকবার পুনর্মুদ্রণ করতে হয়, যার নজির সে যুগে ছিল না। তাঁর গানের বিপুল চাহিদার জন্যেই গ্রামোফোন ব্যবসা এগিয়ে যায় লাভের পথে। লালচাঁদ যোগ দেবার আগে এ প্রতিষ্ঠানে লোকসানের পালা চলেছিল। গ্রামোফোন রেকর্ড আদরের স্থান পায়নি সঙ্গীতপ্রিয় সমাজে।

লালচাঁদ মোট ২৭টি গান রেকর্ড করেছিলেন। সংখ্যাটি কম নয় সেকালের পক্ষে। কোন পুরুষ শিল্পীর এত গান সে আমলে রেকর্ড হয়নি। শুধু তিন প্রসিদ্ধা গায়িকার রেকর্ড হয়েছিল তাঁর চেয়ে বেশি। তাঁরা হলেন পান্নাময়ী, মানদাসুন্দরী ও কৃষ্ণভামিনা। তবে লালচাঁদ যদি আয়ুষ্মান হতেন, তাহলে সংখ্যার দিকে হয়ত শীর্ষস্থান পেতেন।

তাঁর এই ২৭খানি গান প্রায় সবই ছোট খেয়াল ও টপ্‌খেয়াল চালের আর বাংলা ভাষায়। দুখানি হিন্দী—শ্যাম রাগে 'ছুঁকি

আইরে ম্যয়' ও সুরটে 'এহো রাজা জাতি হ্যায়।' কীর্তন দুটি মাত্র —'যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী' ও 'মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব'। বাকি ২৩খানি বিভিন্ন রাগের বাংলা খেয়াল ও টপ্‌খেয়াল। তার কোন-কোনটির আবেদন কালের পারাবার পার হয়ে আজও সুররসিকদের প্রাণে সাড়া জাগাতে পারে। যেমন, বাগেশ্রীর সেই

এ কি রূপ হেরি হরি তুমি ধরেছ যোগীর বেশ।
কিবা রূপ, কিবা ভূষা তুমি ত্যেজেছ চাঁচর চিকুর কেশ॥
মুরলি ত্যজিয়া হরি পিনাক ত্রিশূলধারী,
বনমালা পরিহরি হাড়ের মালিনী বেশ॥
পৃথিবী করেছ রাঙা, এমন সোনার চকিত অঙ্গে,
তুমি মেখেছ বিভূতি নিয়ে শুন ওহে পৃথ্বীশ॥

গানখানির সুরবিহার তথা স্বর-তরঙ্গ চিত্তাকর্ষক। প্রথম পঙক্তির 'বেশ' কথাটিতে সুরে আরোহণের সময় বাগীশ্বরীর স্বর সমারোহ সকরুণ রসে মনকে আপ্লুত করে।

লালচাঁদের সম্পূর্ণ রেকর্ড তালিকা এখানে দেওয়া হল—

(১) ছঁকি আইরে ম্যায়—শ্যাম, খেম্‌টা।
(২) এহো রাজা জাতি হ্যায়—সুরট, আড়াঠেকা।
(৩) ওঁমা কেমন মা তা কে জানে—সিন্ধু কাফি, দাদ্‌রা।
(৪) আমারে আসতে বলে—সিন্ধু মিশ্র, যৎ।
(৫) আমার আর কিছু ভাল লাগে না—সুরট কাওয়ালী।
(৬) হর হর হর বোম্ বোম্ বোম্—রামকেলী।
(৭) তোমার ভাল তোমাতে থাক—শঙ্করা, দাদ্‌রা।
(৮) তারা পরমেশ্বরী—বেহাগ, ঠেকা।
(৯) নবমী নিশি গো তুমি আর পোহায়ো না—সিন্ধু।
(১০) তুমি কাদের কুলের বৌ—ভৈরবী, দাদ্‌রা।
(১১) হৃদয় রাস মন্দিরে (যদু ভট্টের রচনা)—কাফি সিন্ধু।

(১২) তনয়ে তার তারিণী—কাফি সিন্ধু।

(১৩) অনুগত জনে কেন তুমি—কাফি সিন্ধু, যৎ।

(১৪) দিদি গো—ভূপালী, দাদ্‌রা।

(১৫) একি রূপ হেরি হরি—বাগেশ্রী।

(১৬) আমার সাধ না মিটিল—ললিতা-গৌরী, একতালা।

(১৭) আঁখির আশা মিটল না—ভৈরবী, দাদ্‌রা।

(১৮) বিদেশিনী কে সাজালে—খাম্বাজ, মধ্যমান।

(১৯) ছুটো কথা কি তোমার প্রাণে—পরজ মিশ্র, তাল ফেরতা।

(২০) সইলো তোর খবর চমৎকার—খাম্বাজ।

(২১) মনের বাসনা শ্যামা—ভূপালী, বাগেশ্রী।

(২২) একটু রসান দে—খাম্বাজ, মিশ্র খেম্‌টা।

(২৩) ছি ছি ছি ছি তুমি।

(২৪) ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা—সিন্ধু, দাদ্‌রা।

(২৫) তারা তারা তারা বলে—ছায়ানট, তেতালা।

(২৬) মরিব মরিব সখি—কীর্তন।

(২৭) যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী—কীর্তন।

তাঁর আরো গানের রেকর্ড নিশ্চয় হত, যদি না অল্পায়ু হতেন। মৃত্যু হয়েছিল মাত্র ৩৭ বছরে। তিনি একত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সে প্রথম রেকর্ড করেন। ওই ২৭খানি গানের রেকর্ড হয় বছর পাঁচকের মধ্যে। আর তাও শেষ বয়সে। শরীর মনের ওই অসুস্থ অবস্থায়।

সেই যে কারণে রেকর্ডিংএর সময়েই বলে ফেলেছিলেন 'ভুলে গেলে বলে বলে দিও,' তা-ই তাঁর অকাল প্রয়াণের বীজ। তাঁর গুণমুগ্ধ শ্রোতাদের ধারণা ছিল না, কি আচ্ছন্ন হয়ে তিনি থাকতেন। এমন কি গান রেকর্ড করবার সময়েও সে সম্পর্কে তাঁর নিজেরও জ্ঞান ছিল। সেদিন হয়ত ভেবেছিলেন, মনে পড়বে না গানের ভাষা। কিন্তু ভুলে যাননি। প্রয়োজনও হয়নি 'বলে বলে' দেবার।

সেই ঘোরের মধ্যেও তিনি সপ্রতিভ থাকতেন, যা দীর্ঘকালের সাধনার ফল। তাই তাঁর গায়ন হত ত্রুটিবিচ্যুতিহীন। কি প্রকাশ্য আসরে, কি গ্রামোফোনে। দৃশ্য অদৃশ্য অসংখ্য শ্রোতাদের তিনি পরিতৃপ্ত করতেন।

গ্রামোফোনে তাঁর একটির পর একটি নিটোল গান একেকখানি রেকর্ডে মূর্ত হয়ে ঘরে ঘরে মুখর হত। কিন্তু শ্রোতাদের আরো গান আরো সুর আরো তান লহরী শোনার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রেখে ইহ-জগৎ থেকে বিদায় নেন লালচাঁদ।

অতি খ্যাতিমান ও উচ্চ মানের গুণী হলেও তিনি সৌখিন অর্থাৎ অপেশাদার ছিলেন। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র। ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত, বর্ধিত। গ্রামোফোন কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধেও কখনো তিনি অর্থ গ্রহণ করেননি।

সঙ্গীত ছিল তাঁর প্রাণের আরাম। নিষ্ঠার সাধন। আত্ম-প্রকাশের মাধ্যম। বহু বাধা বেদনার মধ্যে দিয়ে তিনি সঙ্গীতের সাধ চরিতার্থ করেছিলেন। অনেক আশাভঙ্গ উত্তীর্ণ হয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন আপন কৃতিত্বে। সঙ্গীত ভিন্ন জীবনে তাঁর অন্য ধ্যান বা কাম্য ছিল না।

সঙ্গীতের প্রেরণা লালচাঁদের ছিল সহজাত। বাল্যকালেই তাঁর গায়কজীবনের সূত্রপাত। কিন্তু তা বিকশিত হতে পারেনি অবাধে। স্বয়ং পিতাই সে বিষয়ে অন্তরায় হয়েছিলেন।

তখনকার সুপ্রতিষ্ঠ অ্যাটর্নি নবীনচাঁদ বড়ালের পুত্র, প্রেমচাঁদের পৌত্র লালচাঁদের জন্ম হয় ১৮৭০ সালে। কলকাতায়। লালচাঁদের মাতামহ হলেন সাগরলাল দত্ত। সুবর্ণ বণিক সমাজের এক নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি তিনি। বিখ্যাত বদান্য ও বিত্তবান সমাজহিতৈষীরূপে সাগরলাল বহু-সম্মানিত ছিলেন।

বালক লালচাঁদের গান আরম্ভ হয়েছিল স্বভাবের প্রেরণায়। পিতার বাধা তখন ছিল না। পরিবারের কর্তা সে সময় পিতামহ

প্রেমচাঁদ। আর সেই বয়সে লালচাঁদ গাইতেন ব্রহ্মসঙ্গীত, ব্রাহ্ম-সমাজের একটি শাখার অধিবেশনে। প্রেমচাঁদের সে বিষয়ে সহযোগ ও সমর্থন খুবই ছিল। কারণ পৌত্রের সেসব গান হত নিজেদেরই বাড়িতে, তাঁর সামনে।

প্রেমচাঁদ ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের এক অনুগামী ভক্ত। অনেক পরে, বৌবাজার অঞ্চলে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট বলে যে পথের নামকরণ হয় তাঁর স্মৃতিতে, তার ৯৮ সংখ্যক গৃহে তাঁদের তখন বাস ছিল। সেখানেই আদি সমাজের শাখা-অধিবেশন হত প্রতি সপ্তায়। তার অনুষ্ঠানে বালক লালচাঁদ ব্রহ্মসঙ্গীত শোনাতেন। তা ভিন্ন সঙ্গীতচর্চার কোন পরিবেশ ছিল না বাড়িতে। এ বংশেও আগে কোন সঙ্গীতজ্ঞ দেখা যায়নি। লালচাঁদ বাল্যকালে সেই সব ব্রহ্ম-সঙ্গীত কিভাবে বা কার কাছে শেখেন, জানা যায়নি। হয়ত পিতামহের সঙ্গে যেতে পারেন মূল সমাজ মন্দিরে। সেখানে আদি সমাজের গায়কদের শুনেও হয়ত তাঁর গান শেখা সম্ভব।

বাংলা সাহিত্যের স্বনামপ্রসিদ্ধ লেখক প্রমথ চৌধুরী ছিলেন স্কুলপাঠ্য বয়সে লালচাঁদ বড়ালের বন্ধু। তাঁর সেই প্রথম জীবনের সঙ্গীতচর্চার কথা চৌধুরী মশায়ের 'আত্মকথা'য় পাওয়া যায়। প্রমথ-নাথ ছাত্রজীবনে কলকাতাবাসী হওয়ার সময় থেকে দুজনের বন্ধুত্বের সূত্রপাত। প্রথম জনের সঙ্গীতপ্রিয়তার জন্যেই লাল-চাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। চৌধুরী মশায় ভারতীয় সঙ্গীতের যেমন রসিক তেমনি ভাবুক। তার পরিচয় যেমন 'আত্মকথা'য় তেমনি পত্নী ইন্দিরার সহযোগে প্রণীত 'হিন্দু সঙ্গীত' পুস্তিকাতেও সুপ্রকাশ। বৃদ্ধ বয়সে তিনি লালচাঁদের স্মৃতিচারণে লেখেন—

'হিন্দু স্কুলে নারায়ণপ্রসাদ শীল···আমাকে গায়ক লালচাঁদ বড়ালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, যিনি ক্রমে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে ওঠেন। লালচাঁদ অল্প বয়স থেকে গান গাইতেন, এস্রাজ হারমোনিয়ম ও বাঁয়া তবলা বাজাতেন। পরে তিনি একজন গাইয়ে-

বাজিয়ে হয়ে ওঠেন। তাঁর গান ছিল জাঁদরেলী আর বাজনায় হাত ছিল কড়া। পরে দুই-ই অনেকটা মোলায়েম হয়ে আসে।···লালচাঁদ ···গাইত সেকালে প্রচলিত ব্রহ্মসঙ্গীত। আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত ব্রহ্মসঙ্গীত সে জানত। লালচাঁদের ঠাকুরদা প্রেমচাঁদ বড়াল ছিলেন একজন আদি ব্রাহ্ম ; তাদের বাড়িতে হপ্তায় একদিন যে সমাজ হত তাতে লালচাঁদকে অল্প বয়স থেকেই গান গাইতে হত। আমি তার সঙ্গে মিশে বহু গান-বাজনার আসরে উপস্থিত থাকতুম। আমার মনে আছে যে আমি লালচাঁদের সঙ্গে মহেন্দ্র চাটুজ্জ্যে নামক জনৈক হারমোনিয়াম বাদকের বাড়িতে গিয়েছি।···আমি এবং আমার ভাই মন্মথ বোধহয় প্রথম বাঙ্গালী ছেলে যারা ফুটবলে পদাঘাত করে।··· ক্রমে আরও পাঁচজন ছেলে এই ফুটবল খেলায় মত্ত হয়ে ওঠে। লাল-চাঁদ বড়ালও এই খেলোয়াড়দের ভিতর একজন ছিল। (আত্মকথা, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৯, ৭৭)।

লালচাঁদের শুধু প্রথম জীবনের কথা প্রমথ চৌধুরী বলেছেন। ক্রমে আর একটু বড় হলেন ব্রহ্মসঙ্গীতের কিশোর গায়কটি। আর, সঙ্গীতের অন্যান্য ধারা তাঁর মন আকর্ষণ করতে লাগল। এদিকে পরিবারের কর্তা ও পুত্রের অভিভাবক হয়েছেন নবীনচাঁদ। অ্যাটর্নি হিসেবে তিনি যেমন সফল, কলকাতায় তেমনি একজন মান্যগণ্য ব্যক্তিও। নিজের বৃত্তিতে পশার বৃদ্ধির সঙ্গে অনেক ধনসম্পত্তি অর্জন করেছেন। ৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে টেম্পল্ চেম্বার্স তাঁর কার্যালয়। নাম তার এন্. সি. বড়াল অ্যাণ্ড পাইন।

নবীনচাঁদের একটি সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সংবাদও আছে। আর সেই সূত্রে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের প্রসঙ্গও। লালচাঁদ তখন ২০ বছরের তরুণ। সেই সময় 'হিতবাদী' সাপ্তাহিক সাহিত্য-পত্রটি প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সালে। তার জন্যে যে যৌথ সংস্থার পত্তন হয়েছিল, নবীনচাঁদ তার প্রধান অংশী ও পরিচালক। পত্রিকার মূল সম্পাদক হন মনীষী শিক্ষাবিদ কৃষ্ণকমল

ভট্টাচার্য আর সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক যুবক রবীন্দ্রনাথ। স্বল্প-স্থায়ী হলেও 'হিতবাদী'র স্থান রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। কারণ এই সাপ্তাহিকের পর পর ছ সংখ্যায় আত্ম-প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথের ছটি বিশিষ্ট ছোটগল্প : দেনাপাওনা, গিন্নী, পোস্টমাস্টার, তারাচরণের কীর্তি, ব্যবধান, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা। 'হিতবাদী'র তহবিলে নবীনচাঁদ এবং প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ৫০০ টাকা করে দেন। ২৫০ টাকা হিসেবে দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জানকীনাথ ঘোষাল প্রমুখ। হিতবাদী নামকরণ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সঙ্গীতে কিন্তু নবীনচাঁদ বীতরাগ। আর লালচাঁদের ছাত্র-জীবনে সঙ্গীতচর্চায় তিনি ঘোরতর বিরোধী। পুত্র অনন্যমনা হয়ে বিদ্যাশিক্ষা করবে, এ-ই তিনি চেয়েছিলেন। হিন্দু স্কুলে ও পরে সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি করেন লালচাঁদকে।

কিন্তু তাঁর লেখাপড়ায় মন বিশেষ ছিল না। অদম্য আগ্রহ ও আকর্ষণ শুধু সঙ্গীতে। বিনা সঙ্গীতে তাঁর দিনচর্যাই অভাবনীয়। তাই তাঁর এ বিষয়ে চর্চা হত পিতার অজ্ঞাতে, গোপনে। বাড়িতে তা সম্ভব নয়। তাই ব্যবস্থা করেছিলেন অন্যত্র।

স্কুল-পর্বের শেষ দিক থেকেই তিনি পাখোয়াজ বাজাতেন। শিখতেন মুরারিমোহন গুপ্তের কাছে। হিন্দু স্কুলে যাবার পথে এক মুদির দোকান ছিল। সেখানেই থাকত লালচাঁদের যন্ত্রটি। আর দোকানের ভেতর দিকে আড়ালে বসে পাখোয়াজ সাধতেন তিনি।

সুতরাং নবীনচাঁদ এসবের বিন্দুবিসর্গও জানতেন না।

ক্রমে লালচাঁদের হাত তৈরি হয়ে গেল পাখোয়াজে।

হিন্দু স্কুল থেকে এনট্রান্স পাস করে সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র হলেন। তাঁর পাখোয়াজ চর্চা তো ছিলই। এখন আরম্ভ হল

পাশ্চাত্য সঙ্গীত। সেণ্ট্‌ জেভিয়াসে´ই সে সুযোগ পেলেন। পিয়ানো আর গান শেখবারও ব্যবস্থা ছিল এখানে।

লালচাঁদ পিয়ানো শিখতে আরম্ভ করলেন। তারপর ইংরাজী গানও। পাখোয়াজ বাদনও বন্ধ হয়নি। সঙ্গীতে তাঁর প্রবণতা আর নৈপুণ্য ছিল স্বভাবদত্ত। তাই পিয়ানো বাজনাতেও দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগলেন। এও নবীনচাঁদের অজ্ঞাতে। টেম্প্‌ল্‌ চেম্বাসে´ই তাঁর অনেক সময় যেত। বাড়িতেও দুবেলা মক্কেলদের সঙ্গে কাজের কথা। লালচাঁদের সঙ্গে তাঁর দেখাই হত কম।

সঙ্গীতচর্চার একটি খরচের দিক্‌ও আছে। পাখোয়াজ যন্ত্র কেনা থেকে সে সংক্রান্ত সমস্তই তিনি পেতেন মায়ের কাছে। পুত্রের সঙ্গীতগুণের জন্যে জননী খুশি হতেন। গৌরব বোধ করতেন। তবে দাক্ষিণ্য দেখাতেন গোপনে।

স্বামীর সঙ্গীত সম্পর্কে কঠিন মনোভাব নরম করবারও তিনি চেষ্টা করতেন। বলতেন, 'গান বাজনা তো আজকাল অনেক বাড়ির ছেলেই করে। একটু-আধটু করলে দোষ কি?' এই ধরনের কথা।

নবীনচাঁদ জানাতেন, 'না না, গান বাজনা করা ভাল নয়। কলেজের পড়ার ক্ষতি হবে।'

কর্মব্যস্ত অ্যাটর্নী। পুত্রের বিদ্যাশিক্ষায় অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন বটে। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য রাখতে পারতেন না সময়াভাবে। তবু বুঝতেন, লালচাঁদের মতিগতি বিদ্যার দিকে নেই। তবে সঙ্গীতে তিনি যে অতখানি মগ্ন তা ছিল তাঁর ধারণার অতীত।

ছুটির দিনে কিংবা কোন দুর্লভ অবসরে জিজ্ঞেস করতেন পুত্রের কথা।

'লালচাঁদ কোথায়? ওকে আজকাল বাড়িতে তো দেখতে পাই না।' বেরিয়েছেন শুনে বলতেন, 'ও কোথায় যায়? পড়াশুনো করে না?'

এই পর্যন্ত। তারপর আবার আইনের কাজে দিনের পর দিন যায়।

ওদিকে লালচাঁদ তখন পাখোয়াজ বাদনে প্রায় সিদ্ধ-হস্ত। সঙ্গতও আরম্ভ করেছেন কোন কোন আসরে। কলকাতায় তখন ধ্রুপদের যথেষ্ট আদর ও চলন। তরুণ পাখোয়াজী লালচাঁদের কিছু নামও হয়েছে। নবীনচাঁদ অন্য জগতের মানুষ। তাই তাঁর কানে সেসব সংবাদ পৌঁছত না।

লালচাঁদ প্রায়ই পাখোয়াজ বাজাতেন তাঁর বন্ধু হরিনাথের গানের সঙ্গে। এণ্টালি-নিবাসী সুমিষ্ট-কণ্ঠ ধ্রুপদ-গায়ক হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বনামধন্য ধ্রুপদী অঘোরনাথ চক্রবর্তীর প্রিয় শিষ্য হরিনাথ।

লালচাঁদের সঙ্গে তাঁর অল্পবয়স থেকেই বন্ধুত্ব। হরিনাথের গুরুর গান কতবার লালচাঁদ শুনেছেন এণ্টালির দেব-গৃহে। এখানেই অঘোরনাথ কতদিন হরিনাথকে গান শিখিয়েছেন।

হরিনাথের সঙ্গে লালচাঁদের গান বাজনা বেশ চলছে তখন। এমন সময় একটি ঘটনা ঘটল। আর তার ফলে পাখোয়াজ ছেড়ে লালচাঁদের সঙ্গীতচর্চা ঘুরে গেল অন্যদিকে।

তখন লালচাঁদের বড় ইচ্ছে হয়েছিল অঘোরনাথের গানে সঙ্গত করবার।

খবর নিলেন, চক্রবর্তী মশায় এখন রয়েছেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে। এই পরিবারের আত্মীয় রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর (রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র) ছিলেন লালচাঁদের বিশেষ বন্ধু।

তাঁকে লালচাঁদ বললেন, 'অঘোরবাবুর গানের সঙ্গে একদিন বাজাব। তুমি ব্যবস্থা করে দাও।'

রণেন্দ্রমোহন অঘোরনাথকে বলে একটি দিন স্থির করলেন।

নিজের যন্ত্র নিয়ে সেদিন লালচাঁদ উপস্থিত হলেন চক্রবর্তী মশায়ের কাছে।

কিন্তু লালচাঁদের এত অল্প বয়স দেখে, বা কি কারণে, অঘোরনাথ গান গাইলেন না। বললেন, 'কাল এস।'

পরের দিন যথাসময়ে পাখোয়াজ নিয়ে লালচাঁদ হাজির হলেন। কিন্তু সেদিনও গানের মেজাজ হল না চক্রবর্তী মশায়ের।

বললেন, 'আর একদিন এস।'

তৃতীয় দিনেও গিয়ে নিরাশ হলেন লালচাঁদ। অঘোরনাথের সঙ্গে বাজাবার সুযোগ পেলেন না।

পর. পর তিন দিন বিফলমনোরথ। এক প্রকার অপমানও। অত্যন্ত মানসিক আঘাত পেলেন লালচাঁদ। তাঁর ক্ষুণ্ণ মনে বার বার এই চিন্তা জাগতে লাগল এত পরিশ্রমে এমন জিনিস শিখেছি যা একেবারে পরনির্ভর। গায়কের মর্জি না হলে বাজনাই হবে না। এমন বাজনা শেখার দরকার কি ?

সেই থেকেই লালচাঁদ পাখোয়াজ বাজনা ত্যাগ করলেন। আর গায়ক হবার প্রতিজ্ঞা করলেন মনে মনে।

প্রথমে বন্ধু হরিনাথের কাছে ধ্রুপদ শিক্ষার ইচ্ছা জানালেন। হরিনাথ কিন্তু ভরসা দিলেন না লালচাঁদকে। সরল মনে হেসে বললেন, 'বেশ তো পাখোয়াজ বাজাচ্ছিস। ওই হেঁড়ে গলায় আবার গান শেখা কেন ?'

লালচাঁদ গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'তুই না শেখাস না শেখাবি। কিন্তু দেখে নিস, গান আমি শিখবই। গাইবই।'

লালচাঁদ এবার পেশাদার ওস্তাদের কাছে শিক্ষার সঙ্কল্প করলেন। তালিম নিতে হবে রীতিমতভাবে। কণ্ঠ সাধনার জন্যে একটি নিজস্ব স্থান দরকার। সেই সঙ্গে ওস্তাদের দক্ষিণাও। সুতরাং জননীর শরণাপন্ন হলেন।

প্রায় সেই সময়েই একটি নাটকীয় ব্যাপার ঘটল তাঁর জীবনে। তাঁর বয়স তখন আঠার-উনিশ বছর। সেণ্ট জেভিয়ার্সের জনৈক ইউরোপীয়ের কাছে পিয়ানো বাদনেও বেশ কৃতী হয়েছেন। সেখান

থেকে তাঁর নামও হয় ভাল পিয়ানো-বাদক বলে। ইংরেজী গানও শিখেছেন।

তখন কলকাতায় ফ্রী ম্যাসনদের একটি সম্মিলনী ছিল—লজ অ্যাঙ্কর। সরকারী মহলে গণ্যমান্য কিছু বাঙালী এবং পদস্থ রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ইংরেজরা তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

লজের বার্ষিক মিলন অনুষ্ঠান হত সাড়ম্বরে। সম্মানিত অতিথিদের সঙ্গে বাংলার গভর্নর উপস্থিত থাকতেন। কখনো বড়লাটও। কার্যক্রমে ইউরোপীয় সঙ্গীতের বিশেষ ব্যবস্থা থাকত। সে বছর লজের গ্র্যাণ্ড মাস্টার ছিলেন (চেয়ারম্যান বা সভাপতির সমতুল্য) নবীনচাঁদ বড়াল।

ওদিকে সেণ্ট জেভিয়ার্সের সূত্রে লজের উদ্‌যোক্তারা লালচাঁদের কথা শুনেছিলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, 'তুমি এবারের প্রোগ্রামে পিয়ানো বাজাবে। গানও গেও।' অর্থাৎ ইংরেজী গান। শ্রোতাদের মধ্যে অন্যান্য সাহেব-মেমদের সঙ্গে গভর্নরও থাকবেন। সেজন্যই বিশেষভাবে ইংরেজী গানের আয়োজন।

লালচাঁদ প্রথমে সম্মত হননি। লজের গ্র্যাণ্ড মাস্টার পিতাও তো উপস্থিত থাকবেন সম্মেলনে। কিন্তু আপত্তির কারণটা তিনি উদ্‌যোক্তাদের জানাতেও সঙ্কোচবোধ করলেন।

শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজি হতে হল তাঁদের বিশেষ অনুরোধে।

নবীনচাঁদ এসব কিছুই জানতেন না।

যথাসময়ে লজের বার্ষিক সম্মেলন আরম্ভ হল গভর্নর প্রমুখের উপস্থিতিতে। গ্র্যাণ্ড মাস্টার নবীনচাঁদও রয়েছেন।

অনুষ্ঠান সূচীর মধ্যে একসময় হঠাৎ তিনি ঘোষণা শুনলেন—এবার পিয়ানো বাদন হবে। বাদকের নাম লালচাঁদ বড়াল।

নিজের কানকে নবীনচাঁদ যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। কিন্তু চোখের দৃষ্টিকে অবিশ্বাস করবার উপায় নেই।

সভাস্থলের একদিকে ছিল একটি গ্র্যাণ্ড পিয়ানো। লালচাঁদ ধীর পায়ে এসে বসলেন তাঁর ছোট টুলটিতে। তারপর দক্ষ হাতে পিয়ানোয় সুরঝঙ্কার তুললেন। আর বিস্ময়ের সীমা রইল না নবীনচাঁদের। যত আশ্চর্য হলেন, তত ক্ষুব্ধ বিরক্ত ক্রুদ্ধও।

ওদিকে লালচাঁদ চমৎকার পিয়ানো বাজিয়ে চলেছেন। সভাকক্ষ পূর্ণ হয়ে উঠেছে পিয়ানোর সুমিষ্ট স্বর-তরঙ্গে। সকল বিশিষ্ট শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনছেন। ব্যতিক্রম শুধু নবীনচাঁদ।

বাজনা শেষ হতেই করতালি-ধ্বনিতে শ্রোতারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানালেন।

তারপর একটি ইংরেজী গান গাইলেন লালচাঁদ। ইংরেজ শ্রোতৃবর্গ এবারও পরিতোষ লাভ করলেন। আর নবীনচাঁদের বিরস অন্তর পরিপূর্ণ হল বিক্ষোভে। কিন্তু সংযত হয়ে সবই সহ্য করলেন। আবার সভার শেষে শুনলেন একটি বিশেষ ঘোষণা। উদ্‌যোক্তারা এর মধ্যে নিজেরা পরামর্শ করে নেন। গভর্ণরের সঙ্গেও একবার কথা বলতে দেখা যায় তাঁদের।

ঘোষণাটি হল—তরুণ ভারতীয় বাদক লালচাঁদের গুণপনার জন্যে এই পিয়ানো যন্ত্র তাঁকে উপহার দেওয়া হবে। লজের পক্ষে পুরস্কারটি দান করবেন সম্মানিত অতিথি গভর্ণর বাহাদুর।

তারপর বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে লালচাঁদকে উপহার দেওয়া হল।...

অনুষ্ঠানের শেষে পিতা-পুত্র বাড়ি ফিরলেন একই গাড়িতে।

সমস্ত পথ নবীনচাঁদ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। একবার শুধু সরোষে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথা থেকে শিখেছিস এসব গান-বাজনা?'

লালচাঁদ নতমুখে জানালেন, 'সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে।'

দারুণ আশ্চর্য বোধ করলেন নবীনচাঁদ।

'সেণ্ট জেভিয়ার্সে গান-বাজনা শেখানো হয়? আচ্ছা আমি কালই দেখা করছি রেক্টরের সঙ্গে।'

বাড়ি এসে স্ত্রীর কাছে রুদ্ধ ক্রোধ প্রকাশ করলেন, 'ছেলে পিয়ানো বাজিয়ে ইংরেজী গান গেয়েছে। গভর্ণর পিয়ানো উপহার দিয়েছেন।'

'তা এ তো বেশ ভাল কথা।'

'ভাল কথা? এই লেখাপড়ার বয়সে গান-বাজনা? তুমিই ওর মাথা খাচ্ছ।'

পুত্রের হয়ে লালচাঁদ-জননী স্বামীকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করেন, 'একটু গান-বাজনা করলে ক্ষতি কি? তুমি এজন্যে অত ভেব না!'

'এরকম করলে ওর লেখাপড়া হবে না, দেখো।'···

পুত্রের সঙ্গীত-চর্চা কিন্তু তিনি বন্ধ করতে পারলেন না। লালচাঁদের যেমন অদম্য উৎসাহ ও একাগ্রতা, তেমনি তাঁরও লক্ষ্য দেবার সময়াভাব।

তবে উপযুক্ত জায়গার অভাবে লালচাঁদের সাধনার বড়ই অসুবিধা হতে লাগল। পাখোয়াজ মুদির দোকানে চলতে পারে। কিন্তু গলা সাধবার জন্যে নিজস্ব ঘর না হলেই নয়। এসব কণ্ঠসঙ্গীতের পর্ব।

লালচাঁদের হয়ে জননী এবার স্বামীর কাছে আবেদন করেন, 'তুমি ওকে আলাদা একটু বসবার জায়গা করে দাও না। সেখানে ও পড়াশোনা করবে। আর তোমার চোখের আড়ালে গানও করুক না, এত যখন ওর ইচ্ছে।'

নবীনচাঁদ প্রথমে সম্মত হলেন না। আপত্তি করে বললেন, 'না না, বোঝ না। ছাত্রবয়সে গান-বাজনা করা উচিত নয়।'

তাঁর এই অনমনীয় মনোভাব কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকেনি। পত্নীর বার বার অনুরোধের ফলে অন্যত্র ঘরের ব্যবস্থা হল লালচাঁদের জন্যে। কাছেই, ২১ মদনগোপাল লেনে নবীনচাঁদের একটি বাড়ি ছিল। সেটি আসলে আস্তাবল। একতলায় বাড়ির ঘোড়া, জুড়ি গাড়ি, ইত্যাদির জায়গা। ওপরে বৈঠকখানার হলঘর।

সেই দোতলায় লালচাঁদ সঙ্গীতচর্চার অনুমতি পেলেন। পাখোয়াজ (এবং ইউরোপীয় সঙ্গীতও) ত্যাগ করে এবার তিনি গান শিক্ষা আরম্ভ করলেন মনপ্রাণ দিয়ে। রাগসঙ্গীতের ভিত্তিতে ধ্রুপদ। সুতরাং তিনি প্রথমে ধ্রুপদ শিক্ষা করতে লাগলেন।

কলকাতায় তখন পশ্চিমের নানা গুণী ধ্রুপদী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বারাণসীর কলাবত কাশীনাথ মিশ্রের কাছে নিতে লাগলেন ধ্রুপদের পাঠ।

কাশীরই আর এক ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাওয়ের সে সময় ধামার গানে যথেষ্ট নাম। বাংলার সঙ্গীতজগতে তিনি সাড়া জাগিয়েছিলেন। বিশ্বনাথজীর ধামারে বাঁটের নিপুণ কারুকর্ম এবং তারানায় ও সার্গমে ছিল রীতিমত অভিনবত্ব। তাঁর কাছে লালচাঁদ শিখতে লাগলেন ধামার, তারানা ও সার্গম। দুই কলাবতের কাছে লাল-চাঁদের সঙ্গীত-শিক্ষা একই কালে অগ্রসর হতে থাকে।

কিছুদিনের মধ্যে মধুকণ্ঠ টপ্পা-গুণী রমজান খাঁর নিকটে শিক্ষা আরম্ভ করলেন টপ্পা অঙ্গ। রমজান সে যুগে টপ্পা ও টপ্‌খেয়াল গানে বাংলার আসর মাৎ করছিলেন। তাঁর বাঙালী শিষ্যগোষ্ঠীও গড়ে উঠছিল। লালচাঁদও হলেন তাঁর অন্যতম শিষ্য এবং প্রিয় শিষ্য। কারণ লালচাঁদ পরে প্রাধান্য দেন টপ্‌খেয়াল রীতিকেই। টপ্‌খেয়াল গানের জন্যেই তাঁর প্রসিদ্ধি। তবে শিক্ষাপর্বে তিনি কাশীনাথের ধ্রুপদ, বিশ্বনাথের ধামার, সার্গম, তারানা এবং রমজানের টপ্পাঙ্গ একই সঙ্গে সাধন করতে থাকেন। সঙ্গীতে নিমগ্ন হলেন একান্তভাবে।

সেই তিনজনের পরে আরো একজন দিকপাল গুণীর কাছেও তিনি খেয়াল শিখেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রধান সভাগায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী। কলকাতায় তখন এত বড় খেয়াল গায়ক আর বিশেষ ছিলেন না। চক্রবর্তী মহাশয় ধ্রুপদ ও টপ্পা গায়কও ছিলেন, কিন্তু খেয়ালের জন্যেই তাঁর নাম ছিল বেশি। তাঁর অনেক শিষ্যের মধ্যে লালচাঁদও একজন হলেন।

ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, খেয়াল—বিচিত্র ধারায় লালচাঁদের সঙ্গীতচর্চা অগ্রসর হয় ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। রাগসঙ্গীতকে আয়ত্ত করবার দুর্জয় পণ তিনি করেছিলেন। আর তা সফল করতে উদ্‌যোগী হয়ে রইলেন সেই আস্তাবল-বাড়ির দোতলায়। এমনি নিরলস সাধনায়, ওই সব অঙ্গের অভিজ্ঞতায় গড়ে ওঠে তাঁর সঙ্গীতজীবনের পাকা বনিয়াদ—তারপর পরিণতিতে একটি বিশিষ্ট গীতি-রীতিতে লালচাঁদ আত্মস্থ হলেন। অন্তরের প্রেরণায়, প্রবণতায় নিজের গানের জন্যে স্থির করে নিলেন একটি শৈলী। খেয়ালের মতন তার তান কর্তব, তবে সেই সঙ্গে টপ্পার অলঙ্কার। খেয়ালের তানকারীতে টপ্পায় দানাদার নকসার মনোরম মিশ্রণ। বলা যায়, টপ্‌খেয়াল। সে যুগের আসরে এই টপ্‌খেয়াল গানের বড়ই আদর ছিল। লাল-চাঁদের সমকালীন (ভাগলপুরের) সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার একজন নামী গুণী ছিলেন টপ্‌খেয়াল গানে। আর সে যুগের গায়িকাদের মধ্যে এই চালের দুজন সুপ্রসিদ্ধা কলাবতী—মানদাসুন্দরী ও কৃষ্ণভামিনী।

লালচাঁদ নিজস্ব চালে টপ্‌খেয়াল গাইতেন। সেই বিদ্যুৎবৎ তানলহরী আর ওজস্বী গায়নরীতি তাঁর আপন সাধনায় গঠিত। রমজান খাঁ কিংবা গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী কাউকেই লালচাঁদ অনুকরণ করতেন না। বাংলা টপ্‌খেয়াল ও ছোট খেয়ালের তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট প্রচলন-কর্তা। এই ধরনের যত গান তিনি রেকর্ড করেছেন কিংবা আসরে গেয়েছেন সকলেরই সুরকার তিনি স্বয়ং। বিজলীর ঝলকতুল্য এমন তানধারার উৎসার সেকালে আর কারো ছিল না।

লালচাঁদ পণ রক্ষা করেছিলেন সিদ্ধ গায়ক হয়ে। অক্লান্ত সাধনার ফলে—প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়—'তাঁর গলা···পরে অনেকটা মোলায়েম হয়ে আসে।' যা আগে ছিল 'জাঁদরেলি'।···

সঙ্গীতজীবনের বিচিত্র রঙ্গ। সেই অঘোরনাথ চক্রবর্তীর সামনেই একদিন তাঁর গান হল। অনেকদিন আগেকার উপেক্ষার

কথা বিঁধে ছিল লালচাঁদের মনে। তিনি ভোলেননি। আসরে চক্রবর্তী মশায়কে দেখেই বহুদিনের অভিমান জেগে উঠল নতুন করে। এতদিন পরে এসেছে তাঁর শিল্পীজীবনের এক শুভলগ্ন। গুণপনা দেখাবার, আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ।

লালচাঁদ সেখানে অঘোরনাথের সামনে তন্নিষ্ঠ হয়ে গাইলেন। গানে মাৎ করে দিলেন আসর। শ্রোতারা সকলেই খুশি। অনেকে উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করতে লাগলেন। বিশেষ প্রশংসা করলেন অঘোরনাথ। আশীর্বাদ করলেন।

তখন লালচাঁদ তাঁকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিলেন সেদিনের ঘটনা। তাঁর পাখোয়াজ না বাজাবার কথা।

বললেন, 'সেই তারপর থেকেই আমি পাখোয়াজ ছেড়ে দিয়েছি। আপনার জন্যেই আমার গান শেখা আরম্ভ।'

শুনে অঘোরনাথ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। একটু ভেবে বললেন, 'আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'...

লালচাঁদের সব সংবাদ পেতেন না নবীনচাঁদ। তবে এটুকু জানতে পারেন যে লালচাঁদের আর বিদ্যাশিক্ষা অসম্ভব। তিনি বিশেষ চিন্তিত হলেন পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে। আর উপায় হিসেবে নিজের অ্যাটর্নী অফিসে তাঁকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। এখানে কাজকর্ম শিখুক, দেখাশোনা করুক। তাও ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল।

লালচাঁদ পিতার সঙ্গে যেতে লাগলেন টেম্পল্ চেম্বার্সে। কিন্তু নবীনচাঁদ তাঁকে বিকেল পাঁচটার পরে অফিসে আর রাখতে পারতেন না। তিনি নিজে রাত পর্যন্ত থাকতেন সেখানে—প্রচুর 'ব্রিফ' তাঁর।

লালচাঁদ পাঁচটা বাজলেই চলে আসতেন, নানা আসরে যোগ দিতে। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন তাঁর গানের আসর হত। লালচাঁদ শুনতেন, গাইতেন। যেদিন বাইরে আসর না হত, বসতেন নিজের বৈঠকখানার সঙ্গীতচর্চায়।

নবীনচাঁদ তাঁর বিবাহও দিয়ে দেন জোড়াসাঁকোর মল্লিক পরিবারে। যে গৃহে পরে গহর জানের সেই আশ্চর্য আসর হয়েছিল।...

এদিকে কলকাতায় গ্রামোফোন সংস্থার ব্যবসায় ১৯০১ সালে পত্তন হল। লালচাঁদ তখন ৩১ বছর বয়সী সুপ্রতিষ্ঠিত, সিদ্ধ গায়ক। কলকাতার আসরে আসরে তখন তাঁর রীতিমত প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা।

সে যুগে গায়ক বাদকরা ঘরোয়া আসরেই সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। সেই সব অনুষ্ঠানে গুণপনা দেখিয়ে তাঁরা রসিক ও বোদ্ধাদের স্বীকৃতি পেতেন সঙ্গীতসমাজে।

কলকাতার কয়েকটি সঙ্গীত-সভার নাম এখানে করা যায়, তাঁর সঙ্গীতচর্চার সম্পর্কে।

লালচাঁদ যেসব আসর থেকে নাম করলেন, তার মধ্যে এণ্টালির 'দেবগৃহ' একটি প্রধান গুণীজন সমাগমের কেন্দ্র ছিল। অতিশয় সঙ্গীতপ্রেমী ও ধনী এই দেবপরিবারের প্রাসাদোপম ভবনে ছিল বাংলার একটি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতসভা। বাংলার এবং পশ্চিমাঞ্চল থেকে সমাগত এমন কলাবত হয়ত কেউ ছিলেন না যাঁর আসর এখানে হয়নি। এই পরিবারের ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব গায়ক হয়েছিলেন গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর শিক্ষায়। প্রতিবেশী তরুণ গায়ক অসামান্য সুকণ্ঠ হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেবগৃহের কল্যাণেই অঘোরনাথের শিক্ষা-লাভের সুযোগ পান। এখানকার আসরে প্রায়ই গাইতেন লালচাঁদ।

পাথুরিয়াঘাটায় যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিখ্যাত সঙ্গীতসভায়ও তাঁর গান হত।

রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর প্রিয় সুহৃদ। সেখানেই বোধহয় সব চেয়ে বেশি আসর করেছেন লালচাঁদ।

নাটোর মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের ল্যান্সডাউন রোডের

বাড়িতেও তিনি অনেকবার গেয়েছেন। জগদিন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর গানের একজন অনুরাগী শ্রোতা।

সঙ্গীতবিদ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সঙ্গে লালচাঁদের বন্ধুত্ব ছিল। গুণমুগ্ধ ব্রজেন্দ্রকিশোরের আসরেও গান গাইতেন তিনি।

এণ্টালি অঞ্চলে মিঃ গারার বাড়ি। এই ইহুদী ভদ্রলোক ভারতীয় সঙ্গীতের একজন রসগ্রাহী শ্রোতা। তাঁর সাদর আহ্বানে লালচাঁদ এণ্টালিতে মাঝে মাঝেই গান শোনাতে যেতেন।

পরে তাঁর একটি নিয়মিত আসর হত শিকদার পাড়া স্ট্রীটে। গোরাচাঁদ মল্লিকের গৃহে। গোরাচাঁদ ছিলেন তাঁর বৈবাহিক (কন্যার শ্বশুর)।

কলকাতার আরো নানা আসর থেকে লালচাঁদের যশ বিস্তৃত হতে থাকে। সকলের নাম করা সম্ভব নয়। আর বলা বাহুল্য, এইসব আসরে হিন্দী গানও যথেষ্ট গাইতেন তিনি।

তবে গ্রামোফোন রেকর্ডই হয় তাঁর জনপ্রিয়তার প্রধান বাহন। বৃহত্তর সঙ্গীতপ্রিয় সমাজে। কলকাতা থেকে বহুদূর মফস্বল শহরে, গ্রামাঞ্চলেও।

গ্রামোফোনের আগে লালচাঁদের ঘরোয়া রেকর্ডিংও ক'বার হয়। এ ব্যাপারে এণ্টালির দেবগৃহই প্রথম।

তবে এইচ. বসু নামে সুপরিচিত হেমেন্দ্রনাথই এ বিষয়ে বিশেষ স্মরণীয়। তিনি নিজের তৈরি যন্ত্রে লালচাঁদের গান রেকর্ড করেছিলেন, সে কারণেই শুধু নয়। তাঁর দূরদৃষ্টির ফলেই লালচাঁদের নাম ও কণ্ঠ রক্ষিত হয় ভাবীকালের জন্যে। গ্রামোফোন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ এইচ. বসুই করিয়ে দেন।

নিজের তৈরী রেকর্ডে লালচাঁদের গান শুনে খুবই উৎসাহ পান হেমেন্দ্রনাথ।

লালচাঁদকে বলেন, 'বাঃ, তোমার গানের এ তো বেশ চমৎকার রেকর্ড হয়েছে। চলো, তোমায় গ্রামোফোনে নিয়ে যাই।'

তিনি উদ্‌যোগী না হলে নিজে থেকে যেতেন না লালচাঁদ। এখানে বলে রাখা যায় যে, এইচ. বসু হলেন বিখ্যাত কুন্তলিন সুগন্ধী তৈলের ব্যবসায়ী। লালচাঁদের তিনি বিশেষ বন্ধুও।

গ্রামোফোনের ব্যবসায় তার কিছুকাল আগে আরম্ভ হয়েছিল বটে। কিন্তু তখনো লাভের মুখ দেখেননি কর্তৃপক্ষ। গ্রামোফোনকে লোকে তখনো ভালোভাবে নেয়নি।

এমন দিনে লালচাঁদকে গ্রামোফোন সংস্থায় নিয়ে এলেন হেমেন্দ্রনাথ। সে প্রতিষ্ঠানের বড় সাহেবের সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করিয়ে দিলেন। জানালেন তাঁর সঙ্গীতগুণের কথা।

সাহেব লালচাঁদকে অনুরোধ করলেন, 'আমাদের কম্পানীতে আপনার গান রেকর্ড করুন।'

রাজি হলেন লালচাঁদ। কিন্তু দক্ষিণা নিতে অসম্মতি জানালেন।

তারপর এখান থেকে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর গানের রেকর্ড। একটির পর একটি। আর তিনি সাধারণ্যে খ্যাতিমান হতে থাকেন।

লালচাঁদের জনপ্রিয়তার ফলে গ্রামোফোন রেকর্ড আর বাজাবার যন্ত্র বিক্রয়ও বৃদ্ধি পায় বহুগুণ।

শুধু কলকাতায় নয়, অখণ্ড বাংলার নানা স্থানে। এমন কি বাংলার বাইরেও অনেক দূরে। বাংলার মধ্যে অনেক শহরে, নানা গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে লালচাঁদের গানের রেকর্ড। তাঁর গানের তুল্য চাহিদা আগে কখনো দেখা যায়নি।

এখানে লালচাঁদের যোগ দেবার আগে একাধিক গুণীর গান রেকর্ড হয়ে বেরিয়েছিল। গ্রামোফোনের কিন্তু ব্যবসায়িক লোকসান বাঁচাতে পারেনি তাঁদের রেকর্ড।

এখন লালচাঁদের সুনাম ও গ্রামোফোন ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর উন্নতি একযোগে ঘটতে লাগল। সেজন্যে কর্তৃপক্ষ অশেষ কৃতজ্ঞ

বোধ করলেন লালচাঁদের প্রতি। তাঁকে অর্থ নিতে নতুন করে অনুরোধ জানালেন। পীড়াপীড়ি করেন তাঁর রেকর্ডের লাভের অংশ নিতে।

কিন্তু লালচাঁদ সবিনয়ে অসম্মতি জানান। টাকা কিছুতেই নেবেন না সঙ্গীত সেবার বিনিময়ে।

পেশাদার গায়ক তিনি নন। সঙ্গীত তাঁর সখের সাধের আরাধনার ধন। অন্তরের আনন্দ সত্তা। অর্থকরী বৃত্তি নয়।

গুণীজনের স্বীকৃতি লাভ করেছেন। শ্রোতাদের প্রীতি-ধন্য হয়েছেন। প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন বৃহত্তর সঙ্গীতসমাজে। এই সার্থকতার অনুভবেই পরিতৃপ্ত লালচাঁদের শিল্পীপ্রাণ। অন্য কোন মূল্যে তাঁর আকাঙ্ক্ষা নেই।

সবই ভাল। কিন্তু গায়ন-শিল্পীর পক্ষে যা মারাত্মক ক্ষতিকর তারই একান্ত বশীভূত হয়ে পড়েন লালচাঁদ। জীবনের সেই পরিপূর্ণ বিকাশের পর্বে। প্রদীপ্ত প্রতিভার অন্তরালে তাঁর জীবনের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে। প্রথমে আত্মজনদের অলক্ষ্যে থেকে ক্রমে প্রকাশ পায় এই ঘোরের অবস্থা। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও পান দোষ থেকে মুক্ত করা যায়নি তাঁকে। এ নেশার তিনি একেবারে শিকার হয়ে পড়েন। কেউ রোধ করতে পারেননি তার কালান্তক পরিণতি।

অনেক সময়েই ছায়াচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন লালচাঁদ। তবু তাঁর গান অন্তর্ধান করেনি, শিল্পীসত্তা সুপ্ত হয়নি। চেতনার সেই পর্যায়েও গান রেকর্ড করেছেন যথারীতি। সেখানে তিনি বলে রাখতেন, 'আমায় নিজের মনে গাইতে দাও। শুধু সময় শেষ হবার আগে ইসারায় জানিয়ে দিও।'

সেই ভাবেই তাঁর গান রেকর্ডিং হত। কখনো বিচ্যুতি ঘটেনি সুরে তালে কিংবা গায়ন রীতিতে। গানের সময় ঠিক সপ্রতিভ থাকতেন। শুধু ওই যা একবার বলে ফেলেছিলেন—'ভুলে গেলে বলে বলে দিও।'

কেবল বাংলা গান নয়। হিন্দী খেয়াল অঙ্গেও লালচাঁদ গেয়েছেন অনেক আসরে। তুখানি হিন্দী গান সুরট ও শ্যাম রাগে রেকর্ডও করেছেন। সেই সব গানে তাঁর খ্যাতি যে পশ্চিমেও কতদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, শিল্পী নিজেও তা জানতেন না।

তার একটি স্মরণীয় পরিচয় পাওয়া গেল তাঁর জীবনের অকাল সায়াহ্নে।

একদিন খবর এল, আফগানিস্থানের আমীর লালচাঁদের গান সামনে বসে শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমীরের সচিব সেই অনুরোধের কথা গায়ককে তাঁর গৃহে জানাতে উপস্থিত হলেন। তখনো তাঁদের বাস সেই ৯৮, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের বাড়িতে। তখন তাঁর শয্যাশায়ী অবস্থা। তাহলেও পরিবারের সকলেই তাঁর এ যাত্রা রক্ষা পাবার আশা করেছিলেন। লালচাঁদের মনেও জীবনের আশঙ্কা জাগেনি। তাই আফগান দূতকে বলেছিলেন, 'ভাল হয়ে উঠলেই আমীর সাহেবকে গান শোনাব। তাঁকে আমার সেলাম জানাবেন।'

কিন্তু সুস্থ আর হননি তিনি। আমীরকে গান শোনাবার সুযোগ লালচাঁদের জীবনে আর আসেনি।

আরো একটি ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে লালচাঁদের। নিজের সৌখীন রুচির পরিকল্পনায় একটি নতুন গৃহ নির্মাণ করছিলেন। এক কণ্ট্রাক্টর বন্ধুর সহায়তায় নকসা প্রস্তুত করে তার কাজ আরম্ভ হয়। ১।১ প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে (পরবর্তীকালে তাঁর বংশধরদের যা বাসস্থল হয়েছিল। যেখানে তাঁর কিষণচাঁদ, বিষণচাঁদ, রাইচাঁদ পুত্রত্রয় পিতার স্মৃতিতে বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠান করতেন লালচাঁদ উৎসব নামে) তার ভিত্তি শেষ করে একতলের অংশ মাত্র হয়েছিল তখন। এমন সময় লালচাঁদের জীবননাট্যে যবনিকাপতন হল।

পিতা মাতা পত্নী এবং পুত্রদের নিয়ে পরিপূর্ণ সংসার। তারই মধ্যে থেকে মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিলে। আচম্বিতে অশনিপাত ঘটে গেল নবীনচাঁদের সংসারে।

তার দুদিন পরের পরের কথা।

শোকস্তব্ধ, নিথর হয়ে ছিল বাড়িটা।

এমন সময় একটি চকচকে নতুন ফোর্ড গাড়ি এসে দরজায় দাঁড়াল।

গ্রামোফোনের কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রিয় গায়ক লালচাঁদ বড়ালকে উপহার পাঠিয়েছেন গাড়িখানি। দুঃসংবাদটি তখনো তাঁরা পাননি।

গ্রামোফোনের সাহেবটির সঙ্গে নবীনচাঁদ দেখা করলেন। অভিভূত স্বরে কোনক্রমে বললেন, 'সে তো আর এ পৃথিবীতে নেই। তোমাদের উপহার ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

বিদায় নেবার আগে সাহেব মাথা নত করে স্বর্গত গায়কের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানালেন। এঞ্জিনের ধকধক শব্দে চলে গেল ফোর্ড গাড়িটা।

আর শোকার্ত নবীনচাঁদের মর্মে নতুন করে আর এক আঘাত লাগল। এত বড় গায়ক হয়েছিল লালচাঁদ! এত নাম, এমন সম্মান! আমি তো কখনো জানতে পারিনি এসব কথা। তার গান-বাজনায় শুধু বাধা দিয়ে এসেছি চিরদিন। কত অসুবিধার মধ্যে দিয়ে সে চর্চা করে গেছে। ওই আস্তাবলের ওপরে বসে গান শিখেছে। গলা সেধেছে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস। কষ্ট পেয়েছে হয়ত।

আর একটা বোধ তাঁর মনে হয়ত জাগল—যদি তাকে সুযোগ সুবিধা দিতুম, এই বাড়িতেই যদি সে মনের সাধে গান গাইতে পেত হয়ত আরো বড় গায়ক হতে পারত। হয়ত তার জীবন এমনভাবে শেষ হয়ে যেত না। কে জানে! সে শুধু গঞ্জনাই সয়ে গেছে গান-বাজনার জন্যে।

শোক, স্মৃতি, শোচনা, সহানুভূতি—নানা ভাবের অনুরণনে উদ্বেল হতে থাকে নবীনচাঁদের মর্মস্থল।

লালচাঁদের মৃত্যুর পর বছর পাঁচেক তিনি জীবিত ছিলেন।

কিন্তু এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা যায় তাঁর স্বভাবে।

নবীনচাঁদের পুত্রস্নেহ লালচাঁদের সঙ্গীত-কীর্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী মিশে যেতে চায়।

পরিবারের সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখেন, সেই নবীনচাঁদ এখন হয়েছেন সঙ্গীতপ্রিয়। লালচাঁদের স্মৃতিকে ধরে রাখতে চাইছেন তাঁরই সঙ্গীত-সম্পর্ক দিয়ে।

এতকালের সঙ্গীত-বিরোধীর মনে পড়ে গেল সেই প্রকাণ্ড পিয়ানোর কথা। গ্র্যাণ্ড অ্যাঙ্করের সভায় গভর্ণরের হাত থেকে লালচাঁদের উপহার পাওয়া পিয়ানো। এতদিন নবীনচাঁদ সেটিকে মণিরামপুরের বাগানবাড়িতে রেখে দিয়েছিলেন।

এখন এক এক রবিবার নবীনচাঁদ চলে যান সেখানে। ব্যারাকপুরের গঙ্গার ধারে। মণিরামপুরে সেই বাগানবাড়িতে। তিনটি পৌত্রকে গাড়িতে সঙ্গে করে নেন। লালচাঁদের তিন নাবালক পুত্র কিষণ, বিষণ, রাই। পিতার মৃত্যুকালে তাদের বয়স ১০, ৮ ও ৪ বছর ছিল।

. বাগানবাড়িতে তাদের নিয়ে এসে নবীনচাঁদ পিয়ানোটির সামনে দাঁড়ান। তার ডালা তুলে তাদের দেখান—সারি সারি সাদা কালো সুরের চাবি।

তারপর তাদের আদর করে টুলে বসিয়ে বলেন, 'বাজা, এইখানে হাত দিয়ে বাজা।'

নেহাৎ বালক তারা। কি শিখেছে যে বাজাবে? যা হোক এলোমেলো তারা বাজিয়ে দেয়। তবু যেন বড় মিষ্টি শোনায়। টুংটাং, টুংটাং বেজে যায় পিয়ানোর পর্দায়। আর নির্বাক নবীনচাঁদ, এতকালের সঙ্গীত-বিরাগী নবীনচাঁদ, সেই অর্থহীন স্বরধ্বনিই কি তৃপ্তির সঙ্গে শোনেন। আনন্দ পান কি? তাহলে কেন চোখে আসে অশ্রু?

খানিক যথেচ্ছ বাজিয়ে ক্ষুদে বাদকদের হয়ত এদিকে দৃষ্টি পড়ে। আর তারা অবাক হয়ে যায়—একি, দাদু কাঁদছেন কেন?

নবীনচাঁদ মুখ ফিরিয়ে নেন অশ্রু গোপন করতে। চোখ মুছে আবার তাদের বলেন, 'বাজা না, থামলি কেন? বাজা, পিয়ানো বাজা।'

লালচাঁদের ছেলেদের হাতে তাঁর সেই উপহার-পাওয়া পিয়ানো এতকাল পরে বাজতে থাকে।...

শুধু পিয়ানো নয়। নবীনচাঁদ খোঁজ করেন পুত্রের সব গানের রেকর্ড। বাড়িতে সেসব বাজাবার কথা এতদিন কেউ ভাবতেও পারতেন না।

লালচাঁদের সমস্ত গানের রেকর্ড বাড়িতে যত্ন করে রাখা আছে। কিন্তু এখন তো সে নবীনচাঁদ নন। অন্য মানুষ যেন। তাই সেসব গানে এখন কোন আপত্তি করেন না। যার ইচ্ছা শুনতে পারে। শুধু কি তাই? কখনো বাড়ির সকলে অবাক হয়ে দেখেন লালচাঁদেরই উপহার পাওয়া গ্রামোফোন যন্ত্রে তাঁরই গানের রেকর্ড বাজাতে বসেছেন নবীনচাঁদ স্বয়ং। সজল চোখে শুনছেন পুত্রের গানগুলি। কোন কোনদিন লালচাঁদের কণ্ঠে সেই ললিতা-গৌরীর সুরে হয়ত ভেসে আসে—

আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা।
আমি জনমের শোধ ডাকি মা তোরে
তুই কোলে নিতে আয় মা॥
পৃথিবীর কেউ আমায় ভাল তো বাসে না,
এই পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা॥

একমনে শোনেন নবীনচাঁদ।

এক অব্যক্ত বিষাদে অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এই ভাষা, এই সুরের আবেদন আকুল করে তোলে মন।

পুত্রের জীবিতকালে তাঁর গানের প্রতি খড়্গহস্ত পিতা এখন তাঁরই গানের রেকর্ড শুনতে চান। যাঁকে আর কোনদিন দেখা যাবে না, যাঁর কণ্ঠস্বর আর কখনো কানে আসবে না—তাঁরই সান্নিধ্য যেন।

লালচাঁদের কণ্ঠ তাঁরই গ্রামোফোন যন্ত্রে শোনেন নবীনচাঁদ। গ্রামোফোনের কর্তৃপক্ষ লালচাঁদকে এটি উপহার দিয়েছিলেন। তিনি কিন্তু পিতার ভয়ে বাড়িতে আনতে পারেননি যন্ত্রটি। আস্তাবলের ওপরে সেই বৈঠকখানায় রাখেন। সেখানেই বাজাতেন।

তাঁর মৃত্যুর পর সেখান থেকে সঙ্গীতের সব সরঞ্জাম গৃহে আনেন নবীনচাঁদ। তানপুরা তবলা পাখোয়াজ হারমোনিয়ম। আর সেই সঙ্গে গ্রামোফোনটিও। লালাচঁদের স্মৃতির পরশে এ সবই এখন শোক-জর্জর পিতার কাছে অতি আদরের হয়েছে।

ধুলোর আস্তরণ পড়েছিল গ্রামোফোনটিতে। নবীনচাঁদ নিজের হাতে পরম যত্নে মুছে পরিষ্কার করেছেন। সেই যন্ত্রেই বাজান লালচাঁদের গান।

তাঁর হয়ত ধারণা, পুত্রের গান তিনি এই প্রথম শুনছেন।

কিন্তু তা নয়। লালচাঁদের গান তিনি আগে একদিন শুনেছেন একই ঘরে, তার সামনে বসে। গানের আসরেই। তবে নবীনচাঁদ তখন তা জানতেন না। কারণ চিনতে পারেননি গায়ককে।

সে নাটকীয় ঘটনাটি বলবার মতন।

লালচাঁদের তখন যৌবনকাল।

একটু নাম করেছেন গায়ক বলে। আসরে গাওয়াও আরম্ভ করেছেন। আত্মীয়স্বজনরা জেনেছেন সে কথা। আর এও জানেন, নবীনচাঁদ কিরকম সঙ্গীত-বিদ্বেষী। লালচাঁদের সঙ্গীতচর্চায় কি ভীষণ তাঁর আপত্তি। তাই পুত্রের গানের গুণ লুকনো থাকে তাঁর কাছে। লালচাঁদের কোন শুভার্থী ঘুণাক্ষরেও তাঁর সঙ্গীত প্রসঙ্গ নবীনচাঁদকে জানান না।

এমনি সময়ে একটি গানের আসর হল তাঁদের এক জ্ঞাতির

বাড়িতে। তাঁর নাম গোকুলচাঁদ বড়াল, লালচাঁদের সম্পর্কে কাকা। তিনি দুর্গাপূজা করছেন তাঁর ৮, হিদারাম ব্যানার্জী লেনের গৃহে। সেই উপলক্ষ্যে সেখানে গানের আসর হবে।

সেখানকার আত্মীয়রা লালচাঁদকে বললেন, 'তোমায় এবার গাইতে হবে।'

লালচাঁদ আপত্তি করলেন—'সে কি? এখানে তো বাবা আসবেন। আমি গাইব কি করে?'

কিন্তু তাঁরা সেকথা কানে নিলেন না। বিশেষ অনুরোধ জানালেন, 'আমাদের বাড়িতে আসর হবে, আর তুমি গাইবে না? তা কি হয়! তবে তোমার বাবা যাতে না জানতে পারেন, সেদিকেও অবিশ্যি দেখতে হবে। তিনি তো সন্ধ্যের সময় আসবেন। তিনি চলে যাবার পর আসর আরম্ভ করা যাবে। কোন ভয় নেই। তুমি এস ঠিক।'

লালচাঁদ আর এড়াতে পারলেন না তাঁদের সকলের কথা। রাজি হতে হল।

পূজোর দিন সময় মতন তিনি এলেন গোকুলচাঁদের বাড়িতে। অপেক্ষা করতে লাগলেন, পিতা কখন আসবেন। তিনি চলে গেলে তো গানের আসর বসবে।

কিন্তু পার হয়ে গেল সন্ধ্যে। রাত হল। তখনো আসতে পারলেন না নবীনচাঁদ। তিনি তখনো বাড়িতে কাজে ব্যস্ত। তাঁর কাছে মক্কেলরা উপস্থিত। মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখা, কথাবার্তা চলেছে। পূজো-বাড়িতে যাবার কথা তাঁর মনে আছে। কিন্তু উঠতে পারছেন না।

তিনি গোকুলচাঁদের বাড়িতে লোক পাঠালেন সংবাদ দিয়ে—একটু দেরি হচ্ছে, খানিক পরেই আসবেন।

ওদিকে পূজো-বাড়ির ধূমধাম। নিমন্ত্রিত আত্মীয়-কুটুম্ব-বন্ধু-বান্ধবরা এসেছেন। যে-ঘরে আসর সাজানো হয়েছে সেখানেই বসেছেন সকলে। গানের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

অনেক দেরি 'হয়ে যাচ্ছে দেখে লালচাঁদকে বলা হল গান আরম্ভ করতে।

লালচাঁদ প্রমাদ গণলেন। এখন কি করে গান ধরবেন? বাবা তো খবর পাঠিয়েছেন একটু পরেই আসবেন। তিনি গাইতে দেখলেই হুলুস্থূল কাণ্ড হবে।

না। গান এখন অসম্ভব।

কিন্তু এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে। এত সব অতিথি অপেক্ষা করে রয়েছেন। আর তো দেরি করা চলে না। কি করা যায়?

বাড়ির সকলে পরামর্শ করে একটা উপায় ঠিক করলেন। আর অনেক বুঝিয়ে সেইমতন রাজিও করানো হল লালচাঁদকে। গানও আরম্ভ হবে। তারপর এসে পড়লে ধরতে পারবেন না নবীনচাঁদ।

পরিকল্পনাটি হল:

লালচাঁদকে একেবারে অন্য বেশে সাজিয়ে দেওয়া হবে। একমুখ দাড়ি। কপাল থেকে মাথা ঘাড় ঢেকে প্রকাণ্ড পাগড়ি। এমনি ছদ্মবেশী হয়ে তিনি আসরে গাইবেন। কড়িকাঠে সব ঝাড়-লণ্ঠনের বাতি নেভানো হবে। শুধু একটি ঝাড়ের আলো থাকবে। তাহলে আবছা দেখা যাবে লালচাঁদকে। তা ছাড়া, লালচাঁদের বসে গাইবার জায়গা হবে একধারে। সেখান থেকে নবীনচাঁদ বেশ খানিক দূরেই বসবেন। লালচাঁদের মুখের পাশটি শুধু দেখা যাবে। আরো সাবধানতা নেওয়া হবে। লালচাঁদকে তিনদিকে ঘিরে থাকবেন— তবল্‌চী, তানপুরা ছাড়বার লোক, আরো ক'জন।

চট্‌পট এই রকম ব্যবস্থা তাঁরা করে দিলেন। আর পটের সাজে, যেন নাট্য পরিবেশে গান আরম্ভ করলেন লালচাঁদ।

খানিকক্ষণের মধ্যেই নবীনচাঁদ এ-বাড়িতে উপস্থিত।

প্রতিমা প্রণামের পর তাঁকে আপ্যায়ন করে আসরে আনা হল। যেখানে তাঁর বসা দরকার, সেখানেই তাঁকে বসালেন এ-বাড়ির লোকেরা।

নবীনচাঁদ সেই আলো-আঁধারিতে দেখলেন, এক অদ্ভুত চেহারার গাইয়ের গান হচ্ছে।

গানের মানুষ তো আদৌ নন তিনি। তাই সেদিকে কান দিলেন না।

তটস্থ হয়ে গেয়ে চললেন লালচাঁদ।

যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁদের প্রায় রুদ্ধশ্বাস অবস্থা। নবীনচাঁদের দিকে একদৃষ্টে তাঁরা লক্ষ্য রেখেছেন। দুর্গানাম জপ করছেন কেউবা। সময়টুকু যেন নির্বিঘ্নে কেটে যায়। তা আর কিছু ঘটল না বটে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নবীনচাঁদ উঠে পড়লেন। বসে বসে গান শুনবেন কি? এসব তাঁর পোষায় না। নেহাত আত্মীয়তার খাতিরে এসেছিলেন আসরে।

তাঁকে সসম্ভ্রমে সাদরে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া হল।

তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বাড়ির সবাই।

লালচাঁদেরও যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

খুলে ফেললেন দাড়ি আর পাগড়ির বাঁধন। স্বচ্ছন্দ হলেন।

এবার জ্বলে উঠল সব ঝাড়-লণ্ঠনের বাতি। ঘর আলোয় আলো।

লালচাঁদ এবার প্রাণের আরামে গাইতে লাগলেন।

আসর জমজমাট হল নতুন করে।

নবীনচাঁদ এ বৃত্তান্ত কখনো জানতে পারেননি।

রাগে বাজে অর্কেস্ট্রা

দক্ষিণাচরণ সেন

গড়ের মাঠের চেহারাই সেদিন বদলে গেছে। এমন দৃশ্য কখনো দেখা যায়নি সেখানে। কলকাতার ময়দানের ফাঁকা সবুজ কোথাও চোখে পড়ে না। সব ঢেকে দিয়েছে কাতারে কাতারে মানুষ।

সকলের সামনে দিয়ে সেই শোভাযাত্রা চলেছে। যেমন বিরাট তেমনি বর্ণাঢ্য। আর সামরিক কায়দায় সুশৃঙ্খল। কি উজ্জ্বল রঙের সব পোশাক! কত বাহারী রঙীন টুপী, পাগড়ি! সারি সারি এক এক রকমের সাজ!

জাঁকজমক আড়ম্বরে সে কি প্রদর্শনী! শুধু দেখবার নয় শোনবার জন্যেও কত রকমারি আয়োজন!

সমারোহের চূড়ান্ত সেদিন গড়ের মাঠে।

১৯১২ সালের ৫ই জানুয়ারি। কনকনে শীতের দুপুর আরামের রোদে ঝলমল করছে। তার মধ্যে ফোর্ট উইলিয়মের পাশে 'পেজেণ্ট শো'। বৃটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জের সেই সংবর্ধনায় মহানগরীতে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

কদিন আগেই নতুন রাজধানীতে ছিলেন পঞ্চম জর্জ। ১৯১১ সালের সেই দিল্লী দরবারও তখন সাড়ম্বরে বসেছিল। অধীন প্রজাকুলকে দেখানো হয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের মহিমা। সম্রাট ও রাণী মেরী তারপর জয়পুর ইত্যাদি রাজ্যে গেলেন। শেষে তাঁরা এলেন কলকাতায়।

এখানে ছ'দিনের কর্মসূচী। তার মধ্যে একদিন ৫ই জানুয়ারি, ময়দানের পেজেণ্ট্ শো। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। যেমন বৃহৎ তেমনি বিচিত্র তার তালিকা। কয়েকদিন আগে থেকেই প্রচার

হয়েছে তার নানা ধূমধামের বিবরণ। সরকারী মহল কলকাতাবাসীদের বৃটিশ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দিতে চান। এত বড় উপলক্ষ্য আর আসেনি আগে।

দুপুর আড়াইটে থেকে আরম্ভ হবার কথা। কিন্তু তার অনেক আগেই গড়ের মাঠে জনস্রোত দেখা দিয়েছে। সকাল থেকে এ অঞ্চলের সব পথে ভিড়। চতুর্দিকে জনতা। ময়দানে সাধারণের সমস্ত জায়গায় লোকারণ্য। কলকাতা আর তার আশপাশে কেউ যেন আর ঘরে নেই। সকলেই এখানে হাজির।

বিশেষ চোখে পড়ে বাঙালী মহিলাদের। এই বিপুল জনসমাবেশে তাদের সংখ্যাও কম নয়। এত অন্তঃপুরিকাদের কখনো দেখা যায়নি কোন প্রকাশ্য স্থানে। ময়দানে তো নয়ই।

নির্দিষ্ট জায়গায় সুদৃশ্য প্যাভিলিয়ন। সেখানেই পঞ্চম জর্জ ও মেরির জন্যে সাজানো হয়েছে সিংহাসন। জনতার উৎসুক দৃষ্টি এখন সেইদিকে।

বেলা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দুপুর হয়ে এল। কিন্তু সজ্জিত মঞ্চ তখনো শূন্য। উপস্থিত হননি মাননীয় অতিথিরা।

তবে, অনুষ্ঠানের ভূমিকা পর্ব আরম্ভ হল।

ঝম্‌ম্ ঝম্‌ম্ শব্দে বেজে উঠল মিলিটারি ব্যাণ্ড। আকাশ বাতাস তার আওয়াজে ভরে গেল। এবার উৎসবের সাড়া জাগল ময়দানে। জনতার অঙ্গে অঙ্গে চাঞ্চল্য।

সেই শোভাযাত্রা এবার আরম্ভ হল।

প্রথম দৃশ্য হাতি আর ঘোড়াদের নিয়ে। সামনেই দেখা গেল বাহারি পোশাকে সারি সারি ঘোড়া। তাদের পরেই সারবন্দী হাতি, তাদেরও সাজ দেখবার মতন। আবার হাতিদের মাঝে মাঝে চোপদার, মাথায় তাদের নীল হলদে রঙের পাগড়ি। তারপর টকটকে লাল পোশাকে একদল গোরা সৈন্য। আর একটি দল দেশী সেপাই, তাদের খাঁকি সাজ। তাদের সঙ্গে নিজেদের ব্যাণ্ড পার্টি। তার পরে এল

একজোড়া ভবনগর রথ। ত্রিপুরার হাতিরা রথ দুটিকে টেনে নিয়ে চলেছে। তাদের পেছনে আসছে পাইক বরকন্দাজ। উটের দল, ঘোড়ার দল আর অন্য হাতিরা।

সর্বসমেত এক জমজমাট প্রদর্শনী।

তার কিছুক্ষণ পরেই রাজ-দম্পতিকে দেখা গেল। তাঁরা রাজকীয় যান থেকে নেমে এলেন প্যাভিলিয়নে। তারপরেই মূল অনুষ্ঠানের পালা।

উল্লাসের সুরে বেজে উঠল বিউগল্। আর নানা চলন্ত চমৎকার দৃশ্যাবলী রাজা-রাণীর সামনে দেখা দিতে লাগল।

প্রথম এল নওরোজ শোভাযাত্রা। তারপরই এক অপূর্ব সঙ্গীতযজ্ঞ যেন। তা যেমন দর্শনীয় তেমনি শোনবার। সে এক বিরাট অর্কেস্ট্রা। কত রকমের যন্ত্র একই সঙ্গে বাজছে ভিন্ন ভিন্ন ধরনে। বাদকের দল বাজিয়ে চলেছেন। তাঁদের সংখ্যা একশোর কম নয়।

কলকাতার সঙ্গীত-জগতেও তা এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

বাজিয়েরা সকলেই বাঙালী। তেমনি সেই সুবৃহৎ দলের নেতাও। তিনি হলেন দক্ষিণাচরণ সেন। সঙ্গীতজগতের আরো এক আশ্চর্য ঘটনা—সেই অর্কেস্ট্রার প্রত্যেক যন্ত্রই স্বদেশী। একটিও ইউরোপের বাদ্যযন্ত্র নেই, যদিও বাজছে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির অর্কেস্ট্রা।

দর্শকদের অনেকে জানে, অনেকে জানে না—দক্ষিণাচরণ সেনের সেই বিখ্যাত ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা।

একদিকে প্যাভিলিয়নের সিংহাসনে পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরী। অন্যদিকে বিশাল জনসমষ্টি। তার মাঝখানে একশ'জনের বিরাট বাদকদল। দক্ষিণাচরণের নেতৃত্বে বেজে চলেছে ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা। তার মধুর বিচিত্র সুরলহরীতে চতুর্দিক প্লাবিত হয়ে গেছে।

এত বড় জনসমাবেশ শান্ত। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছে এই অভিনব যন্ত্রসঙ্গীত।

বৃটিশ সম্রাটও আকৃষ্ট হয়েছেন।

শোভাযাত্রার অন্য সব অংশের মধ্যে এই অর্কেস্ট্রা তাঁর চিত্তাকর্ষণ করেছে সর্বাধিক।

যতক্ষণ বাজনা হল তিনি কৌতূহলী হয়ে শুনলেন।

তারপর অর্কেস্ট্রা শেষ হতে জানালেন, 'আমি আর একবার এই ব্যাণ্ড শুনতে চাই।'

তাই পরের দিন ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা আর একবার বাজল। বিশেষ করে পঞ্চম জর্জের জন্যে, লাটপ্রাসাদে। শোনবার পর তিনি উচ্চ প্রশংসা করলেন দক্ষিণাচরণকে। সম্রাটের ব্যাণ্ড মাস্টার মিঃ বুকেনারও মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছিলেন। অর্কেস্ট্রার স্বরলিপিও লিখে নেন তিনি।

ময়দানের সেই পেজেণ্ট শোতে অর্কেস্ট্রার পরে নাচও দেখবার মতন হয়েছিল। সে নৃত্য দেখাল উড়িষ্যার পাইক নর্তক দল। ময়ূরভঞ্জের এই কুশলী নৃত্য ময়ূরভঞ্জ রাজাই পরিচালনা করেন। কিন্তু সেসব বিবরণের প্রয়োজন নেই এখানে।

সেদিনের ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রার কথাই বলবার। ভারতীয় সঙ্গীতে সেই অর্কেস্ট্রা পরের দিন সংবাদপত্রের বিষয় হয়েছিল। তার বর্ণনা আছে নানা দৈনিকে।

যেমন, অমৃতবাজার পত্রিকায় ৬।১।১৯১২ তারিখে দেখা যায়—

'Babu Dakshinacharan Sen's band party stood in the middle playing a sweet gat, a tune.'

ওই তারিখেরই Statesman-এর সংবাদ—

'Both processions were headed by Maharaja Tagore's Indian band, which played under the direction of Hon. Superintendent Babu Gopal Chandra Mukherjee and band masters professor Dakshina Charan Sen and Babu Gopal Chandra Banerjee—Indian music resembling in character the chants of

western music. It also played at the end the National Anthem, the effect, in the Indian instruments being rather weird but by no means unpleasing. After heading the processions as far as the pavilion this band took up the position immediately in front of the throne and played at intervals as the processions passed.'

স্টেট্‌স্‌ম্যানের এই বিবরণ থেকে পাওয়া গেল যে, দক্ষিণাচরণ প্রমুখের নেতৃত্বে বাদকরা দেশী যন্ত্রে বাজিয়েছিলেন, তাঁরা যে ভারতীয় সঙ্গীত বাজান তা পশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের ধরনে হয়, তাঁরা শেষে যে National Anthem শোনান তাও উপভোগ্য হয়েছিল, পঞ্চম জর্জ ও মেরীর সিংহাসনের সামনেই ছিলেন অর্কেস্ট্রা বাদকদের দল এবং সাময়িক বিরতির পরে পরে কয়েকবারই তাঁরা শুনিয়েছিলেন অর্কেস্ট্রা।

প্রতিবেদনে সামান্য একটি ভুল আছে। অপর নেতা গোপালচন্দ্রের পদবী বন্দ্যোপাধ্যায় নয়—চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতেও অভিজ্ঞ ছিলেন গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কাছে ইউরোপীয় সঙ্গীতের শিক্ষা দক্ষিণাচরণ প্রথম জীবনে পেয়েছিলেন। আর, বিবরণে যে National Anthem উল্লেখ করা হয়েছে, বৃটিশ আমলের সেই 'জাতীয় সঙ্গীত' অবশ্যই 'God save the King Emperor!'

যন্ত্রসঙ্গীতের সেই বিরাট অনুষ্ঠানের বর্ণনা আরো বিশদভাবে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ করে।

কতজন বাদক ছিলেন তার উল্লেখের সঙ্গে কি কি রাগ সেই বৃন্দবাদনে বেজেছিল, কোন্ কোন্ ভারতীয় যন্ত্র বাজে তাদের নামও দেওয়া আছে ওই (৬.১.১৯১২) দিনের পত্রিকায়—

The ancient Indian band of 100 performers has

been equipped and trained under the supervision of Maharaja Tagore. The instruments of the band have all been specially made from ancient models for the present occasion for the Imperial Reception Committee.

(1) Ragini Sarang (Composed by Maharaja Tagore).

(2) Ragini Imon Kalyan (Composed by Maharaja Tagore).

(3) Ragini Shankara (Composed by Professor Sen).

(4) Indian March (Composed by Professor Sen).

The following Indian musical instruments were used in this band :

(1) Banshi—bamboo flute—an ancient wind instrmment of the Hindus.

(2) Tubri—a pastoral wind instrument with double tubes. Also used by snake charmers.

(3) Kartaul—cymbals.

(4) Ghanta—cup shaped bells.

(5) Surmangal—true Hindu origin.

(6) Jagajhampa.

(7) Kara.

(8) Tichara.

(9) Dhak.

(10) Saringee.

(11) Shankha.

(12) Mridanga.

(13) Nakara.

(14) Kartar—of two pieces of wood.

(15) Pillagovi or Murali.

(16) Nagasvar.

(17) Mukh-vina.

(18) Mozhumd or Bazana.

(19) Turi bheri.

(20) Rabab.

(21) Saradiya vina, etc.

শ'খানেক যন্ত্রের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শুধু বলা যায়, প্রত্যেকটি বাদ্যই প্রাচ্যের।

আর একটি কথা। এই প্রতিবেদনের মহারাজা টেগোর হলেন পাথুরিয়াঘাটার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর। তিনি রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের পুত্র এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উত্তরাধিকারী পোষ্যপুত্র। প্রদ্যোৎকুমার পারিবারিক সূত্রে, আবাল্য পরিবেশে সঙ্গীতজ্ঞ হতে পারেন। ওই একশ'জন যন্ত্রীর বাদনগোষ্ঠী তাঁর আনুকুল্যে, অর্থব্যয়ে গঠিত হয় একথাও হয়ত ঠিক। কিন্তু তাঁদের এ অর্কেস্ট্রাটি 'মহারাজা টেগোরের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত' একথা আক্ষরিক অর্থে নেবার প্রয়োজন নেই। তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন, এই ধারণাই সমীচীন। সেই বিরাট বাদকবৃন্দের শিক্ষা দেন দক্ষিণাচরণ। কারণ তিনিই ছিলেন যন্ত্রী সম্প্রদায়টির প্রকৃত সংগঠক ও সুর-সংযোজক। প্রদ্যোৎকুমার তেমন ক্রিয়াসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ ছিলেন না। সেদিনের বাজানো সারঙ্গ ও ইমন কল্যাণ অংশ দুটির সুরকার বলে তাঁর নাম মুদ্রিত হলেও সন্দেহ জাগে একই কারণে। শঙ্করা এবং ইণ্ডিয়ান মার্চের মতন ও দুটিও দক্ষিণাচরণের রচনা হবারই সম্ভাবনা। সেকালে কখনো কখনো একের কৃতিত্ব অপরের প্রতি আরোপিত

হত। তার দৃষ্টান্ত অপ্রাপ্য নয়—সাহিত্যক্ষেত্রের মতন সঙ্গীত জগতেও।

থাক সে কথা। দক্ষিণাচরণের অর্কেস্ট্রার প্রসঙ্গ আরম্ভ করা যাক।

দক্ষিণাচরণ সেন যে ১৯১১ সালের উৎসবে প্রথম অর্কেস্ট্রা শুনিয়েছিলেন, তা নয়।

সেই পেজেন্ট শো-র প্রায় ৩০ বছর আগে তিনি পত্তন করেন অর্কেস্ট্রা। তাঁর ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা। এই দীর্ঘকালে অতি প্রসিদ্ধ হয়েছিল সেই বৃন্দবাদন। ভারতীয় সঙ্গীতে ইউরোপীয় ধরনে প্রথম অর্কেস্ট্রা গড়ে তোলা সম্পূর্ণ রাগকে (অর্থাৎ যাতে বিবাদী বা বর্জিত স্বর নেই) পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে 'হার্মনাইজ' করে বাজানো, সেজন্যে দলের সকল যন্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া—এসবের জন্যেই দক্ষিণাচরণ স্মরণীয় হয়ে আছেন।

তাঁর ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা এদেশে এক অভিনব সৃষ্টি। ময়দানের শো-র আগে তা এত বিখ্যাত ছিল বলেই সেই বৃহৎ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব তিনি পান। আর তা পালন করেন সুযোগ্যভাবে।

পঞ্চম জর্জ বা বড়লাটের সামনে যে তাঁর অর্কেস্ট্রা বাজে আর প্রশংসা পায়, এজন্যেই দক্ষিণাচরণের গৌরব নয়। রাগ হার্মনাইজ করা বৃন্দবাদনের তিনি প্রবর্তক ও শ্রেষ্ঠ গুণী। এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রতিনিধিরূপেই তিনি আসেন। এটি তাঁর গুণেরই স্বীকৃতি। পেজেণ্ট শো-র বর্ণনা করা হল সেই কারণে।

ভারতীয় রাগে হার্মনাইজ করার কথা আরো কিছু আছে। এ প্রসঙ্গে মনে আসে তাঁর পূর্ববর্তী ইউরোপীয় সঙ্গীতের বাঙালী গুণী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম।

দক্ষিণাচরণের ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রার পত্তন হয় ১৮৮৩ সালে। তবে রাগ হার্মনাইজ করার উদাহরণ আরো আগে পাওয়া যায়। এই কলকাতা শহরেই। দক্ষিণাচরণের ১৫ বছর আগে। কৃষ্ণধন

বন্দ্যোপাধ্যায় তখন একুশ-বাইশ বছরের তরুণ। কিন্তু সেই বয়সেই ভারতীয় ও ইউরোপীয় দুই রীতির সঙ্গীত রাজ্যেই তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছেন। তিনিই প্রথম হার্মনাইজ করেন ১৮৬৭-৬৮ সালে। তাঁর Hindusthani Airs Arranged for the Piano Forte' বইখানিতে (১৮৬৮-তে প্রকাশিত) তার নিদর্শন আছে।

তবে, তখন কিংবা পরেও অর্কেস্ট্রা গঠন করেননি কৃষ্ণধন। সে গৌরবের প্রথম অধিকারী দক্ষিণাচরণ সেন।

৪৫ বছর ব্যাপী দীর্ঘ সঙ্গীতজীবন দক্ষিণাচরণের। অর্কেস্ট্রা গঠন, পরিচালনাতেই তা উদ্‌যাপিত হয়ে যায়। তাঁর শিল্পীপ্রাণের ধ্রুব লক্ষ্যই ছিল সেদিকে। সম্পূর্ণ রাগের ভিত্তিতে অর্কেস্ট্রার সাধনায় সারাজীবন তিনি মগ্ন থাকেন।

সেদিন ময়দানে একশ'জন যন্ত্রীকে নিয়ে বৃন্দবাদন শোনান তিনি। এর জন্যে বহুদিনের প্রস্তুতি ছিল। এত বড় সংগঠনের অর্থাদি সম্বল ছিল না তাঁর। মহারাজা প্রদ্যোৎকুমারের দাক্ষিণ্যেই তা সম্ভব হয়। দক্ষিণাচরণ ছিলেন তার শিল্পী সংগঠক। এতগুলি যন্ত্র বাজবে। তার উপযুক্ত 'পীস্' রচনা, এত প্রকার যন্ত্রের জন্যে হার্মনাইজ করা, এত বিভিন্ন যন্ত্রীদের প্রত্যেককে তৈরি করে নেওয়া—এসবই ছিল তাঁর করণীয়। আর কত সুষ্ঠুভাবে যে তা সম্পন্ন করেন, তার পরিচয়ও পাওয়া যায় সেদিন গড়ের মাঠে। সেই মহান সুরঝঙ্কারে বিশাল জনসমাবেশে সাড়া পড়ে যায়। আর এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করেন পঞ্চম জর্জ। পুনরায় এই অর্কেস্ট্রা শোনবার ইচ্ছা জানান।

সমবেত সেই একশ' যন্ত্রের সুরকার দক্ষিণাচরণ।

কিন্তু অন্য সময়ে এত যন্ত্রীর সহযোগিতা পাননি তিনি।

তাঁর নিজস্ব অর্কেস্ট্রা কখনো এত বড় আকারের হতে পারেনি। তাও ওই সঙ্গতির অভাবে। তিনি নিজেও ধনী ছিলেন না। এমন প্রতিভাধর হয়েও তাঁর উপযুক্ত উপার্জন ছিল না। দেশের অবস্থাই

তখন তাই। অর্কেস্ট্রার আর অর্থকরা মূল্য কি এমন? সেজন্যে তাঁর বহু-বিখ্যাত ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রার বাদক থাকতেন মাত্র এগার-বারজন। এত কম যন্ত্রী নিয়ে অর্কেস্ট্রা বাঁচিয়ে রাখাও হয়ত তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। দক্ষিণাচরণের কজন সম্পন্ন শিষ্য এ বিষয়ে তাঁকে সহায়তা করেন নানাভাবে।

এগার-বারজন মাত্র যন্ত্রী নিয়ে রীতিমত অর্কেস্ট্রা হয় না, ঠিকই। দক্ষিণাচরণ নিজেও সেকথা জানতেন। যথার্থ ইউরোপীয় আদর্শে তাঁর অর্কেস্ট্রা সম্পূর্ণ অঙ্গের নয়। ওদেশের সম্পূর্ণ অর্কেস্ট্রা একশ'-জন, একশ' পঞ্চাশজন নিয়ে বাজে। সে অর্কেস্ট্রায় পিয়ানো তো অপরিহার্য। স্বরের ঐশ্বর্যেও প্রধান। ৮৮ চাবির ৮ সপ্তকের তার-যন্ত্র পিয়ানো। ব্যাপকতম স্বরের পরিধিতে বিচিত্র তার আকর্ষণ। সেই পিয়ানো দক্ষিণাচরণের ব্লু রিবনে কখনো বাজেনি। কারণ একই। দরিদ্র দক্ষিণাচরণের সেই বহুমূল্য যন্ত্র কেনার অসামর্থ্য। এদেশের শ্রোতাদের কাছেও অসম্ভব ছিল ততখানি আনুকূল্য পাওয়া।

সেকালের পরিস্থিতিতে যতদূর সাধ্য তা তিনি করেছিলেন।

নচেৎ পাশ্চত্ত্য অর্কেস্ট্রার সম্পূর্ণ রূপ দক্ষিণাচরণের চেয়ে এদেশে বেশি জানত কজন? সঙ্গতি থাকলে তিনিও দেখাতে পারতেন—রীতি-মত অর্কেস্ট্রার চারটি অংশ। বেস্, টেনর, অল্‌টো আর সোপ্রানো। খাদ থেকে ক্রমে চড়ার দিকে বেস্ টেনর অল্‌টো সোপ্রানো বাজাবার নিয়ম। উপযুক্ত পোষকতা পেলে তিনিও সাজাতে পারতেন চার অংশের যন্ত্র। বেস থেকে সোপ্রানো পর্যন্ত সুরের আলোড়ন তাঁর অর্কেস্ট্রাতেও জাগত।

কিন্তু তত বহুমূল্য বাদ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করবেন তিনি? এত যন্ত্র আর এত যন্ত্রীদের পোষক শ্রোতারা এদেশে কোথায়? বিশেষ বিশেষ যন্ত্রে অত-সংখ্যক শিল্পী পাওয়াও প্রায় অসম্ভব। তাই ইচ্ছা আর যোগ্যতা থাকলেও বিরাট আকারের অর্কেস্ট্রা গঠনের

সুযোগ দক্ষিণাচরণ পাননি। তাঁর পক্ষে কতখানি সাধ্য বা সম্ভব তা তিনি দেখিয়েছিলেন অপূর্ব দক্ষতায়।

রাগের শুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি হার্মনাইজ করেন। স্বরচিত 'পীস্'গুলি নিয়ে বাজে তাঁর অর্কেস্ট্রা। উপযুক্ত সংখ্যায় নির্দিষ্ট সব যন্ত্র তাঁর ছিল না। পিয়ানো তো নয়ই। তবু তা অর্কেস্ট্রা। ঐকতান বা কন্সার্ট নয়। কারণ তাঁর অর্কেস্ট্রা যন্ত্রীরা ভিন্ন ভিন্ন অংশ বাজাতেন, একযোগে। একই সুর সকলের হাতে বাজত না। প্রত্যেক যন্ত্রীর পৃথক বাজনা। অথচ সকলের সমন্বয়ে এক বৃহত্তর সুরসৃষ্টি। আপাত-অমিলের মধ্যে বহু মিল ও স্বরসঙ্গতি। আর তা বিকশিত বিচিত্র ধারায়। সকলের অন্তর্লীন আছে এক একটি রাগ-রূপ।

এগার বারটি মাত্র যন্ত্র বাজলেও, পিয়ানো না থাকলেও, দক্ষিণা-চরণের বৃন্দবাদনকে বিশেষজ্ঞরা অর্কেস্ট্রা বলেই মানতেন। তখনকার অসংখ্য কন্সার্ট পার্টি থেকে ভিন্ন চরিত্রের ছিল ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা।

পিয়ানো তাঁর আসরে বাজত না বটে। কিন্তু দক্ষিণাচরণ ভাল পিয়ানোবাদক ছিলেন। নিয়মিত এ যন্ত্র বাজাতেন অর্কেস্ট্রা গড়ার জন্যে। সুর রচনা আর সংযোগ অলঙ্করণ অর্থাৎ 'হার্মনাইজেশন্' তার প্রধান কাজ। সে সব তিনি পিয়ানোতেই প্রথমে করে নিতেন।' তারপর সেই পিয়ানোর সুর থেকেই করতেন স্বরলিপি। আর ছাত্রদেরও শেখাতেন। এমনিভাবে তাঁর অর্কেস্ট্রার গৎ তৈরি হত।

দলপতি হবার সমস্ত গুণই ছিল দক্ষিণাচরণের। তাঁর অর্কেস্ট্রার সব রকম যন্ত্রের যন্ত্রী তিনি। বিশেষ বেহালা আর বাঁশির অতি কুশলী শিল্পী। তেমনি ছড়ের অন্যান্য যন্ত্রও ভাল বাজাতেন। যেমন চেলো, ভাস ইত্যাদি। আর ফুঁ দিয়ে বাজাবার নানা রকম বাঁশিও —ক্ল্যারিওনেট, কর্ণেট, ইউফোনিয়ম। কেবল নিজে বাজানো নয়, শিষ্যদের শিক্ষা দিয়ে অর্কেস্ট্রার জন্যে তৈরি করে নিতেন। প্রত্যেক যন্ত্রীকে নিখুঁত গড়ে তুলতেন নিয়মিত মহড়ায়। যেমন তাঁর ধৈর্য,

তেমনি শেখাবার ক্ষমতা। দলের সবাই মনের মতন তৈরি না হলে, দক্ষিণাচরণ অর্কেস্ট্রা বাজাতেন না।

যেমন ক্রিয়াসিদ্ধ তেমনি তত্ত্বজ্ঞও ছিলেন তিনি। সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। রাগসঙ্গীতে হার্মনি প্রয়োগ আর অভিনব রূপে বৃন্দবাদন—এই ছিল তাঁর সাধনা। তাই ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় প্রকার পদ্ধতিতেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতে তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল রীতিমত।

দুই ধারার সঙ্গীতে তাঁর মনোদর্শন, মৌলিক চিন্তা আর ব্যবহারিক ধারণার পরিচয় আছে তাঁর লেখার মধ্যে। কখানি মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর 'ঐকতানিক স্বরসংগ্রহ', 'হারমোনিয়মে গান শিক্ষা', 'গীতশিক্ষা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯৩ ও ১৮৯৮), 'সরল হারমোনিয়ম সূত্র' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৯০৬।এ বইয়ের চারটি সংস্করণ প্রকাশ পায়) ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। তেমনি 'রাগের গঠন শিক্ষা'য় তাঁর পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর। এ পুস্তকের প্রথম (১৯২৪) ও দ্বিতীয় ভাগ (১৯২৫) ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে জিজ্ঞাসুদের অবশ্যপাঠ্য।

শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক প্রয়োজন কি, কেমন করে তা সিদ্ধ করা যায় সেসব বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। ছাত্রদের সহায়ক হবার জন্যেই তাঁর পুস্তক রচনা।

স্বরচিত 'সরল হারমোনিয়ম সূত্র' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লেখেন, 'এ পর্যন্ত গানের স্বরলিপিপূর্ণ বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল স্বরলিপি দৃষ্টে গান শিক্ষা প্রণালী কোন পুস্তকে লিখিত হয় নাই। এজন্য এই প্রণালী ইহাতে অতি বিস্তৃত ও বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে।' 'গ্রাম পরিবর্তন করিয়া বাজাইবার প্রণালী'ও তিনি বর্ণনা করেছেন প্রাঞ্জলভাবে। গ্রাম পরিবর্তন (scale changing) প্রক্রিয়াটি শিক্ষার্থীদের পক্ষে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। এটি যতখানি সহজ-ভাবে বোঝানো দরকার, দক্ষিণাচরণ তা দক্ষতার সঙ্গেই করেছেন।

তাঁর বিজ্ঞানী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন আর একটি কঠিন বিষয়ে—'পুস্তক দৃষ্টে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইলে উত্তম রূপে মাত্রা শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অথচ মাত্রা শিক্ষা অধিকাংশ পুস্তকে অতি সংক্ষেপে দেওয়া থাকে।' সেজন্যে তিনি মাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন বিস্তারিত এবং সহজবোধ্যভাবে।

ছাত্রদের সমস্যা ও প্রয়োজনের দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাই স-দৃষ্টান্ত নির্দেশের জন্যে অতি মূল্যবান হয়েছিল তাঁর বইগুলি। তাঁর দু খণ্ডে 'রাগের গঠন শিক্ষা' তো শিক্ষার্থীদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে আছে। তাঁর সমগ্র সঙ্গীতজীবনের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফল-স্বরূপ 'রাগের গঠন শিক্ষা'।

এই মহা গ্রন্থের আরো চারটি খণ্ড রচনার পরিকল্পনা তাঁর ছিল। দীর্ঘকাল ধরে সেজন্যে প্রচুর উপকরণও সংগ্রহ করেছিলেন তন্নিষ্ঠভাবে। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পরই তাঁর জীবনে মহা ছেদ পড়ে যায়। আর অপূর্ণ থেকে যায় আরব্ধ এই মহৎ কার্যটি। সঙ্গীত ক্ষেত্রের সেই ক্ষতি আজও পূরণ হয়নি।

রাগসঙ্গীতে অভিনব অর্কেস্ট্রা প্রবর্তনের জন্যেই কেবল নয়। সঙ্গীত বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের জন্যেও সম্মানিত ছিলেন দক্ষিণাচরণ। পরিণত বয়সে তিনি শ্রদ্ধেয় আচার্যের আসন লাভ করেছিলেন।

তাঁর জীবিতকালেই কোন কোন গ্রন্থের তিন-চারটি সংস্করণ সেকালের পক্ষে এক লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। কারণ সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্র তখনো একরকম সীমাবদ্ধই ছিল। সেই গণ্ডীর মধ্যে তাঁর পুস্তকের এমন প্রচার সঙ্গীতসেবীদের জীবনে তাঁর প্রভাবেরই স্বীকৃতিস্বরূপ গণনীয়।

মধ্যজীবন থেকেই বাংলা দেশের সঙ্গীতক্ষেত্রে তিনি একজন আচার্য হয়েছিলেন।

তখন তিনি কৃতী শিষ্যমণ্ডলী নিয়ে সঙ্গীত-সমাজে বিরাজমান। তাঁর প্রথম শিক্ষাদান আরো আগে আরম্ভ হয়। যখন তাঁর তেইশ-

চব্বিশ বছর বয়স, তখনই তিনি শেখাতেন ছাত্রদের। ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রার পত্তন করেছিলেন সেই বয়সে। তার প্রথম বাদকদের বেশির ভাগই ছিলেন তাঁর শিষ্য। পরে তাঁর অর্কেস্ট্রা যখন আরো উন্নত হয়, আরো ভাল ভাল যন্ত্রীদের তিনি সহযোগী পান। তাঁরাও তাঁর হাতে গড়া ছাত্র। তাই তাঁর শিক্ষা যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশি ছিলেন ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রার শিল্পী। দক্ষিণাচরণ তাঁদের অনেককেই একাধিক যন্ত্রে তৈরি করেছিলেন। আর তাঁরা প্রত্যেকেই ইউরোপীয় সঙ্গীতে কিছু ব্যুৎপন্ন হন আচার্যের শিক্ষায়।

দক্ষিণাচরণের সেই শিষ্যগোষ্ঠীর কয়েকজনের নাম বিশেষ করে বলবার।

যেমন, বেহালাবাদক হরিচরণ দাস। সেকালে বাঙালীদের মধ্যে বেহালায় এমন চমৎকার হাত বিরল ছিল।

কিরণচন্দ্র মিত্র—একাধিক যন্ত্রে সুদক্ষ। গুরুর যোগ্য উত্তর-সাধকও তিনি। দক্ষিণাচরণের মৃত্যুর পরে কিরণচন্দ্রই নেতা হয়ে ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রাকে ক'বছর বাঁচিয়ে রাখেন।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস—যেমন বেহালা তেমনি ইউফোনিয়ম, ওবো ইত্যাদিরও গুণীবাদক। দক্ষিণাচরণের দীর্ঘকালের সেবক পোষকও তিনি। কৃষ্ণচন্দ্রের কথা পরে আরো জানাবার আছে।

শরৎচন্দ্র মিত্র—নানা যন্ত্রের শিল্পী। কিরণচন্দ্রের ভ্রাতা। তাঁদের প্রসঙ্গও পরে বক্তব্য।

কৃষ্ণচন্দ্র গুহ—'রাগের গঠন শিক্ষা' প্রভৃতি রচনায় গুরুর সহযোগী। তা ছাড়া ছিলেন—

নন্দলাল দাস, কার্তিকচন্দ্র শীল, যোগীন্দ্রনাথ দাস, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস প্রভৃতি ব্লু রিবন দলের শিষ্যবৃন্দ।

দক্ষিণাচরণের যন্ত্রী-সঙ্ঘে ছিলেন না এমন শিষ্যদের নামও উল্লেখ্য। যথা, শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রমোদকৃষ্ণ দেব, রামগোপালপুরের

যতীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ। বাংলার এক স্মরণীয় সুসন্তান ব্রজেন্দ্রকিশোর। বিশ শতকের প্রথম ভাগে স্বদেশব্রতের নানামুখী কর্মে তাঁর যোগাযোগ ও বদান্যতার কথা সুবিদিত। সেই সঙ্গে তাঁর একটি সঙ্গীত-জীবনও ছিল। তরুণ বয়সে ব্রজেন্দ্রকিশোর পাখোয়াজ শিখেছিলেন মুরারি-মোহন গুপ্তের কাছে। পরবর্তী জীবনে রায়চৌধুরী মশায় সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়েই চর্চা করতেন। পণ্ডিত অহোবল রচিত 'সঙ্গীত পারিজাত' গ্রন্থের স-ব্যাখ্যা অনুবাদ তিনি প্রায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করেন। 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা' মাসিকে। তা ছাড়া ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব বিষয়ে তাঁর নানা নিবন্ধ, বিভিন্ন রাগের পর্যালোচনাও তাঁর সঙ্গীতজ্ঞানের সাক্ষ্যস্বরূপ। এখানে জানবার কথা এই যে, ব্রজেন্দ্রকিশোর দক্ষিণাচরণের কাছে ঔপপত্তিক শিক্ষাই পেয়েছিলেন। আর দীর্ঘকাল যাবৎ। দক্ষিণাচরণের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রকিশোরের প্রায় পনের বছর ব্যাপী সংযোগ ছিল। আচার্যের মৃত্যুকালে ব্রজেন্দ্রকিশোরের বয়স হয় একান্ন বছর। দক্ষিণাচরণের তখন মৃত্যু না ঘটলে ব্রজেন্দ্রকিশোরের তত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষারও হয়ত বিরতি হত না।

দক্ষিণাচরণের নাম করে তিনি বলতেন, 'অতি গুণী লোক ছিলেন।'

গুরুর প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর পত্নীর আমৃত্যু মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর।

দক্ষিণাচরণের একটি শিষ্যাগোষ্ঠীও ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর ভদ্র মহিলা ছাত্রীরা। সেকালের সাঙ্গীতিক তথা সামাজিক জীবনেও তা আর এক অভিনব। কারণ সমাজবহির্ভূতা বা পতিতা নারীদের মধ্যেই তখন সঙ্গীতচর্চা ছিল প্রায় সীমাবদ্ধ। গৃহস্থ ললনারা ছিলেন অন্তঃপুরিকা। তবে দক্ষিণাচরণের পরম চরিত্রবান, সদাচারী বলে অতি সুনাম ছিল। তাই পুরাঙ্গনাদের সঙ্গীত শিক্ষার ভার প্রাপ্ত হতেন উত্তর কলকাতায়। তাঁর সেই শিষ্যারা কখনো প্রকাশ্যে

অনুষ্ঠান করেননি বটে। কিন্তু গৃহকোণে চর্চা করেছিলেন ভালভাবে। তার ফলে সেসব সংসারে সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। সেজন্যে দক্ষিণাচরণের কল্যাণে সঙ্গীতচর্চার প্রসারও ঘটে আরেক-ভাবে। এটিও তাঁর একনিষ্ঠ সঙ্গীতজীবনের অন্যতম দান।

দক্ষিণাচরণের জীবন ঐকান্তিক সঙ্গীত সেবার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এক অখ্যাত পরিবারের দরিদ্র সন্তান। সহায়-সঙ্গতি কিছুই তাঁর ছিল না। শুধু প্রতিভা, অধ্যবসায় আর একনিষ্ঠ উদ্‌যোগ। সেই সম্বলে সঙ্গীতজীবনে অর্জন করলেন বিপুল প্রতিষ্ঠা। স্বদেশের সাঙ্গীতিক ইতিহাসে স্মরণীয় নাম রেখে গেলেন।

তাঁর জীবনকথা বিবৃত করা হল এখানে।

দক্ষিণাচরণের জন্ম ১৮৬০ সালে (সন ১২৬৬, ৯ই ফাল্গুন)। তাঁদের আদি নিবাস ২৪-পরগণার বারাসত মহকুমায় মহেশপুর গ্রামে। তাঁর পিতা নীলমাধব সেন কলকাতায় পুলিস ইনস্‌পেক্টরের কাজ করতেন। এক মতে, দক্ষিণাচরণের জন্ম হয় মহেশপুরে। অন্য মতে, তাঁর জন্ম কলকাতায়, পিতার মাতুলালয়ে।

এক বছর বয়স থেকে দক্ষিণাচরণের শোভাবাজারে বাসের কথা জানা যায়। এ অঞ্চলেই তাঁর প্রথম বিদ্যাশিক্ষা হয় একটি পাঠশালায়। তারপর ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও কুইন্‌স্ কলেজিয়েট স্কুলে।

কিন্তু বালক বয়স থেকেই সঙ্গীত তাঁর চিত্ত অধিকার করেছিল। সুরের মায়ায় তিনি এমন আসক্ত হয়ে পড়েন যে, বিষম বাধা আসে বিদ্যাচর্চায়। অভিভাবকরা অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোন উপদেশ বা বারণেই দূর হল না তাঁর সঙ্গীত অনুরাগ।

উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলে সঙ্গীতের নানা ছোটখাটো আসর হত। সেসবের ঠিক সন্ধান রাখতেন দক্ষিণাচরণ। যেখানেই গান বাজনা হোক, তিনি হাজির হতেন। শুধু যে লেখাপড়ার কথা ভুলে

যেতেন তা নয়। সমবয়সীদের সঙ্গে খেলার কথাও তাঁর মনে থাকত না। আসরে গিয়ে তন্ময় হয়ে যেতেন সঙ্গীতে।

ন-দশ বছরের কিশোর। এমনি করে গান-বাজনা শুনে শুনে দিন যায়। বাড়ির কাছেই নন্দরাম সেন স্ট্রীট, কুমারটুলির কিছু দক্ষিণে। এই পথেরই ২০-সংখ্যক ঠিকানায় স্বনামধন্য নিধুবাবুর বহুকালের বাস ছিল। কথা হচ্ছে ১৮৬৯-৭০ সালের। তার প্রায় ত্রিশ বছর আগে টপ্পাচার্যের প্রয়াণ হয়েছে আটানব্বই বছর বয়সে। সেসময় ওই বাড়িতে তাঁর বংশধররা বাস করছেন। আর তখনো যেন নিধুবাবুর অদৃশ্য প্রভাব রয়েছে অঞ্চলটি জুড়ে।

যাঁর নামে এই রাস্তা, সেই নন্দরাম সেন এই পথের পাশে এক বিরাট শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রামেশ্বর শিবমূর্তি সেই মন্দিরে। চিৎপুর থেকে নন্দরাম সেন স্ট্রীটে গেলে বাঁদিকে দেখা যায় রামেশ্বর শিবমন্দির। দক্ষিণাচরণের যখন ন-দশ বছর বয়স, তখন সেই মন্দিরের মস্ত চাতালে প্রায়ই গান-বাজনা হত। বালকেরও সেখানে হাজিরা ছিল নিয়মিত।

মন্দির চত্বরে একজন চমৎকার বাঁশি বাজাতেন। বিশেষ সেই বাঁশির টানে সেখানে আসতেন দক্ষিণাচরণ। তার মিষ্টি সুর শুনতে শুনতে বালকের মন মোহিত হয়ে যেত। কিছুদিন পরে শুধু শুনে আর তৃপ্তি হত না। বাঁশি শিখতে ব্যাকুল হয়ে উঠল মন। কিন্তু তা হল ওই দশ বছর বয়সের কথা।

বাঁশের বাঁশি যিনি বাজাতেন তাঁর নাম রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়। তাঁর কাছে একদিন দক্ষিণা মনের ইচ্ছা জানালেন। বালক বলে কিন্তু তাঁকে উপেক্ষা করলেন না রাজেন্দ্রলাল। বাঁশি বাজানো শেখাতে আরম্ভ করলেন। তাও নিজের বাঁশিতে। কারণ ছাত্রের বাঁশি নেই তখনো।

সামান্য একটি বাঁশি কিনতেও দক্ষিণার বেশ কিছুদিন লেগেছিল। এজন্যে কে পয়সা দেবে বাড়িতে? শেষে অনেক চেষ্টায় কোনও পর্ব

উপলক্ষ্যে কিনলেন একটি বাঁশি তাও প্রায় খেলনার মতন। তবু নিজস্ব বাঁশি তো।

এবার সেই বাঁশিতেই রাজেন্দ্রলালের কাছে শেখা চলতে লাগল। সেই রামেশ্বর মন্দিরের চত্বরে। সেখানে বসে বসেই বাঁশি বাজাবার প্রথম অভ্যাস দক্ষিণার। চিৎপুর রোড থেকে পশ্চিমে নন্দরাম সেন স্ট্রীটের মধ্যে এসে বাঁ দিকে সেই বিরাট দেবালয়।

মাত্র দশ বছরের ছেলে। কিন্তু শেখবার কি অদম্য আগ্রহ। তেমনি দ্রুত শিখে নেবার ক্ষমতা। সহজাত প্রতিভা। তার সঙ্গে যুক্ত হল অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায়। অচিরেই তার ফল দেখা গেল। সেই খেলার বাঁশিতেই ফুটে উঠল টানা টানা সুর। অতটুকু ছেলের আশ্চর্য সঙ্গীতশক্তি প্রকাশ পেতে লাগল। যে কোন বাংলা গান শুনে তুলতে পারে বাঁশিতে। প্রতিবেশীরা অবাক হলেন দেখে শুনে।

এমনিভাবের সঙ্গীতচর্চায় কিছুকাল কেটে গেল। কিন্তু সেই বাঁশের বাঁশিতে গানের সুর—এই নিয়ে আর মন ভরল না বেশিদিন। দক্ষিণার মনে সঙ্গীতের পিপাসা তীব্র হয়ে উঠল। আরো বেশি সুরের পাঠ নেবার জন্যে, আরো যন্ত্র বাজাবার জন্যে অস্থির হলেন মনে মনে। রাজেন্দ্রলালের চেয়ে আরো বড় গুণীর সন্ধান করতে লাগলেন। যেখানে আরো অনেক শেখা যাবে, শোনা যাবে অনেক কিছু।

দেখতে দেখতে দক্ষিণাচরণের বয়সও খানিক বাড়ল। পার হলেন বিদ্যালয়ের সীমানা। কিন্তু এনট্রান্স পরীক্ষা আর দেওয়া হল না। মন একেবারেই ছিল না সেদিকে। ওই পরীক্ষার মতন বয়সও অবশ্য হয়নি।

তখনও তিনি কিশোর। কেবল খোঁজ করছেন—কোথায় বড় বাজিয়ের দেখা পাওয়া যায়!

এমন সময় শুনলেন কালিপ্রসন্নবাবুর নাম। আর তাঁর সঙ্গীত-চর্চার কথা। কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। সেতার সুরবাহার আরো

কি সব যন্ত্র বাজান। খুব নামডাক তাঁর। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে তাঁর বাজনা হয়। আরো অনেক বড় বড় আসরে। শোভাবাজার থেকে তাঁর বাড়িও বেশি দূরে নয়। এই আহিরীটোলায়। ১৩ নম্বর গোলোক দত্ত লেনে।

একদিন সন্ধান নিয়ে দক্ষিণাচরণ সেখানে গেলেন। আহিরীটোলার সেই পাড়ায়। তখন বাড়ির বৈঠকখানায় কালিপ্রসন্ন-বাবু সুরবাহার বাজাচ্ছিলেন।

বাড়ির সামনে কেউ ছিল না। কিন্তু সে ঘরে ঢুকতে সাহস হল না দক্ষিণার। বাইরে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন। কি চমৎকার তারের বাজনা।

যতক্ষণ সেদিন সুরবাহার বাজল, তিনি দাঁড়িয়ে থেকে শুনলেন। পরের দিন আবার গেলেন সেই সময়ে। কালিপ্রসন্নবাবুর সুরবাহার আবার শুনলেন। তারপর থেকে প্রত্যহ। কোনদিন তাঁর সেতার, কোনদিন সুরবাহার শুনতে লাগলেন বাইরের জানলা থেকে। তারের যন্ত্রে কি সুন্দর সুরের ঝঙ্কার। মনের মধ্যেও তেমনি বাজতে থাকে ঝনঝন করে। আর তার টানে চলে আসেন দক্ষিণাচরণ।

দিনের পর দিন সেই সুরবাহার সেতার শুনেই তাঁকে তৃপ্ত থাকতে হচ্ছিল। বৈঠকখানার মধ্যে যাবার সাহস হয় না কিছুতেই।

এমন সময় একদিন কালিপ্রসন্নের এদিকে নজর পড়ল। তিনি দেখলেন—জানলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি ছেলে।

কালিপ্রসন্ন তাঁকে বৈঠকখানায় ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'ওখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

তিনি রাগ করেননি দেখে এবার দক্ষিণার ভয় ভাঙল। সাহস করে একেবারে বললেন, 'আমায় দয়া করে বাজনা শেখাবেন?'

তখন কালিপ্রসন্ন কথায় কথায় বালকের পরিচয় জেনে নিলেন। তার বাঁশি বাজাবার কথাও। অন্য যন্ত্র আর সঙ্গীত শিক্ষায় তাঁর কতখানি আগ্রহ তাও বুঝলেন।

তারপর বললেন, 'তোমায় গান-বাজনার ভাল ইস্কুলে ভর্তি করে দেব। সেখানে বিশেষ করে বেহালা শিখবে তুমি। কেমন?'

দক্ষিণার মনোবাঞ্ছা এতদিনে পূর্ণ হল। সঙ্গীতজগতের একটি বড় পরিবেশে আসবার সুযোগ পেলেন ভাগ্যক্রমে।

কালিপ্রসন্ন ছিলেন রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীতজীবনের সব কাজে প্রধান সহযোগী। শৌরীন্দ্রমোহনের 'বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়' কিছুদিন আগেই (১৮৭১ সালে) পত্তন হয়েছে। কালিপ্রসন্ন তারও একজন ভারপ্রাপ্ত। সে বিদ্যালয়ে নানা রকম বাজনা আর গানও নিয়ম করে শেখানো হয়। দক্ষিণাচরণকে তিনি সেখানে ভর্তি করে নিলেন।

বিহারীলালের শ্রেণীতে বেহালা শিক্ষার ব্যবস্থা হল দক্ষিণার। বিহারীলাল চক্রবর্তী তখনকার নামী বেহালা শিক্ষক। দক্ষিণাচরণ তাঁর কাছে বেহালা শিখতে লাগলেন বটে। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের সংস্রবে আরো নানাভাবে তাঁর লাভ হতে লাগল। এখানে সকলেই সঙ্গীতের ছাত্র। কেউ ধ্রুপদ ইত্যাদি গান শিখছে। কেউ বা সেতার বেহালা পাখোয়াজ বাজনা। এখানকার শিক্ষকরা ভাল ভাল গাইয়ে বাজিয়ে। তাঁদের সঙ্গে থেকে দক্ষিণাচরণ নিজের পাঠের অতিরিক্তও অনেক শিখতে লাগলেন। বলতে গেলে, তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির সূচনা এই শিক্ষালয়েই। তাঁর সঙ্গীত-দৃষ্টি বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয় থেকে প্রসারিত হতে থাকে। এক জায়গায় এত রকমের বাজনা তিনি এখানেই দেখলেন প্রথম।

লেখাপড়ায় ইস্তফা হয়েছিল আগেই। এখন একান্ত চেষ্টায় বেহালা শিখতে লাগলেন। বিহারীলালও আশ্চর্য হলেন দক্ষিণার অতি দ্রুত শেখবার ক্ষমতায়। শেষ পরীক্ষাতেও তার ফল দেখা গেল। প্রথম স্থান অধিকার করেছেন দক্ষিণাচরণ।

সেজন্য একটি উৎকৃষ্ট বেহালা পুরস্কার পেলেন। তখন তাঁর আঠারো বছর বয়স।

সঙ্গীত-রাজ্যে তাঁর সত্যিকার প্রবেশের যন্ত্র হল নিজস্ব এই বেহালাটি। আর বৃহত্তর সঙ্গীতজগতেও তাঁর তখন প্রবেশের সূচনা।

কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় পরিচিত তো আগে থেকে ছিলেনই। এবার পরিচিত হলেন শৌরীন্দ্রমোহনের গুণী গোষ্ঠীর আরো অনেকের সঙ্গে। কারো কারো ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলেন শিক্ষার্থী হয়ে। নানা উপদেশ নির্দেশ তাঁদের কাছে পেতে লাগলেন। আসবার ছাড়পত্র পেলেন পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের দরবারে। সেখানকার স্বনামধন্য কলাবৎদের আসরে আসরে। উচ্চ মানের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত প্রায়শ শুনতে লাগলেন। লাভ করলেন কত শিল্পীর সাহচর্য।

দক্ষিণাচরণের বিভিন্নমুখী সঙ্গীত-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হতে লাগল।

এখানে ও বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ে যাঁদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হল, মদনমোহন বর্মণ তাঁদের মধ্যে বিশেষ একজন।

তখনকার বিখ্যাত এক ধ্রুপদী মদনমোহন বর্মণ। বাংলার নাট্যশালায় সঙ্গীত পরিচালক হিসাবেও তিনি প্রসিদ্ধ।

ধ্রুপদ গানে মদনমোহন ছিলেন কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পাথুরিয়াঘাটা গোষ্ঠীর নানা গুণীর গুরুস্থানীয়। প্রতিভাবান দক্ষিণাচরণ মদনমোহনের স্নেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ তাঁর কাছে পান দক্ষিণাচরণ। মদনমোহন বর্মণও তাঁর একজন সঙ্গীতগুরু।

তাঁর সঙ্গে দক্ষিণার বিশেষ সাঙ্গীতিক যোগাযোগ ঘটেছিল।

তার অনেক বছর পরে তিনি রচনা করেন 'গীতশিক্ষা'র দ্বিতীয় ভাগ। সে বইতেও মদনমোহনের প্রসঙ্গ আছে। 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্যে মদনমোহনের সুর দেওয়া গানগুলির স্বরলিপি তিনি প্রকাশ করেন এই পুস্তকে।

বইয়ের ভূমিকায় তিনি এ বিষয়ে জানিয়েছেন, "ইহাতে 'সতী কি

কলঙ্কিনী' গীতিনাট্যের সমুদয় গীতের স্বরলিপি প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গানগুলির সুর উৎকৃষ্ট। বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের পূর্ব অধ্যাপক, সঙ্গীতশাস্ত্র বিশারদ ৺মদনমোহন বর্মণ মহাশয় এই সকল গানে সুর সংযোজনা করেন। তিনি এই গীতসমূহের স্বরলিপি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অকালে পরলোকগত হওয়ায় তাঁহার জীবদ্দশায় ঐ স্বরলিপি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়া ঘটে নাই। আমরা তাঁহার নিকট হইতে যে সকল স্বরলিপি যেরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, অবিকল সেইরূপ বিশুদ্ধ ভাবেই এক্ষণে গীতশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি।"...

বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকবার সময় সেই তরুণ বয়সেই দক্ষিণাচরণের যোগাযোগ হয় গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির সঙ্গীত-পরিবেশেই মদনমোহন বর্মণের একজন কৃতী ছাত্র গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গোপালচন্দ্রের নানামুখী সঙ্গীতগুণ। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন ইউরোপীয় পদ্ধতিতেও তিনি তেমনি অধিকারী। বিভিন্ন যন্ত্রে বিশেষ করে হারমোনিয়মে তিনি ছিলেন কুশলী বাদক।

তাঁর কাছেই দক্ষিণাচরণ ইউরোপীয় সঙ্গীতের শিক্ষা পান। পাশ্চাত্ত্য রীতিতে এই তাঁর প্রথম জ্ঞান লাভ।

তাঁর শিল্প-মানসপটে আর একটি সঙ্গীতজগতের তোরণ উন্মুক্ত হল। তা যেমন বিশাল তেমনি স্বতন্ত্র। পৃথক তাঁর নীতি প্রকৃতি ভঙ্গিমা ও রূপ।

তখন থেকেই পাশ্চাত্ত্য রীতির চর্চায় দক্ষিণাচরণ নিবিষ্ট হলেন। তাঁর সঙ্গীতজীবনের সে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। এই নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল তাঁর কুড়ি-একুশ বছর বয়সে।

ইউরোপীয় সঙ্গীতে তিনি তখন বিমুগ্ধচিত্ত। বিশেষ, অর্কেস্ট্রা তাঁকে পরম বিস্ময়ে আকৃষ্ট করলে।

এক অপূর্ব উন্মাদনা জাগল তাঁর শিল্পীমনে। সুরের এ কি

ব্যাপকতা এই পাশ্চাত্ত্য বৃন্দবাদনে! স্বরধ্বনির কি বৈচিত্র্যময় লীলা! বিবিধ যন্ত্রসঙ্গীতের এ কি বিপুল সমারোহ! সমবেত শিল্পীদের সমাহারে কি বিরাট অনুষ্ঠান! অথচ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রীর হাতে কত বিভিন্ন বিচিত্র সংযোগ!

দক্ষিণাচরণ সঙ্গীতকে এক নতুন দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করলেন। অন্তরে তাঁর এক অপূর্ব অনুভব। মনের পটে এক আশ্চর্য শব্দ-চিত্রের আভাস। মেলডির বদলে হার্মনি।

সুরের পরিবর্তে স্বর-সঙ্গতি। একটি সুর নয়। একই সঙ্গে নানান বিন্যাস ও তাদের সমন্বয়। বাহ্যত এবং খণ্ড খণ্ড ভাবে অমিল। কিন্তু সমগ্রতায় বহু-মিল।

ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে এই তার মূল প্রভেদ। তাই প্রক্রিয়াতেও পার্থক্য। নানা যন্ত্রে বিভিন্ন গ্রামে ধ্বনিপরম্পরা বাজবে। অথচ সম্মিলনে রূপ গ্রহণ করবে স্বরমালার একটি অখণ্ড সঙ্গত। অর্কেস্ট্রা। কন্‌সার্ট নয়। সকল যন্ত্রে কিংবা মিলিতভাবে একই প্রকার বাজে না অর্কেস্ট্রায়।

জটিল তার ক্রিয়াকাণ্ড। সেজন্যে রীতিনীতি একেবারে নির্দিষ্ট। ছকে বাঁধা। প্রত্যেক যন্ত্রী কি বাজাবে সে সমস্তই অনড় নির্দেশিত। তাই প্রতি শিল্পীর সামনে রেখামাত্রার স্বরলিপি। সে লিপি থেকে তিলমাত্র বিচ্যুতি যেন না ঘটে। অতি কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন প্রত্যেক যন্ত্রী। কারো সুরবিহারের স্বাধীনতা নেই—এও এক বৈশিষ্ট্য। সঞ্চালকের কর্তৃত্ব সর্বমান্য।

দক্ষিণাচরণের সঙ্গীতজীবনের ধ্রুব স্থির হয়ে গেল তখন থেকেই। মনে মনে অর্কেস্ট্রার সাধনকেই তিনি বরণ করে নিলেন।

তাঁর সঙ্গীতকল্পনা জুড়ে রইল—হার্মনাইজেশন। যন্ত্রে যন্ত্রে স্বরে স্বরে সংযোগ অলংকরণ। তবে ভারতীয় রাগকেই হার্মনাইজ করতে হবে। ভারতীয় রাগের মতন সুরের অফুরন্ত ঐশ্বর্য তো পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে নেই। কিন্তু এই মেলডি-প্রধান ভারতীয় সঙ্গীতে অর্কেস্ট্রার

হার্মনি আসবে কেমন করে? সেই তো হবে দক্ষিণাচরণের সানন্দ সাধন। সঙ্গীতচর্চার লক্ষ্য।

কিন্তু নিজের অর্কেস্ট্রা পত্তন তাঁর তখনই হল না। তার জন্যে অনেক সরঞ্জাম চাই। অনেকের সহায়তা। অনেক প্রস্তুতি। নিজের আরো চর্চা অনুশীলন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও প্রয়োজন। এসবই আরো কিছু সময়সাপেক্ষ।

সেজন্যে তৎপর হলেন দক্ষিণাচরণ। তাঁর ইউরোপীয় সঙ্গীত বিষয়ে গুরু গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে প্রথম দিশারী হলেন বটে, কিন্তু পরে দক্ষিণাচরণ নিজের পথ করে নিলেন আপন প্রতিভায়।

গোপালচন্দ্রের শিক্ষাধীনে কিছুকাল তিনি ইউরোপীয় সঙ্গীতের অনুশীলন করেছিলেন। তারপর উদ্‌বোধন হল তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা। আপন মেধায় ও অধ্যবসায়ে পাশ্চাত্ত্য রীতিতে ক্রমেই অগ্রসর হতে লাগলেন।

সে সময় ইউরোপে ছাপা রেখামাত্রা স্বরলিপিতে নানা 'পীস্' (piece) আসত কলকাতায়। তাতে প্রত্যেক যন্ত্রের মুদ্রিত harmony part-এর নির্দেশও থাকত।

দক্ষিণাচরণ সেসব সংগ্রহ করে চর্চা করতে লাগলেন। ক্রমেই তাঁর অন্তর্দৃষ্টি জাগল এ বিষয়ে। সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসও। এবার নিজস্ব অর্কেস্ট্রা দল গঠনের জন্যে উদ্‌যোগী হয়ে উঠলেন।

কিন্তু এ কাজ সহজসাধ্য নয়। নানা অসুবিধার সামনে পড়লেন কাজে নেমে। কিন্তু অদম্য তাঁর আগ্রহ। প্রায় দু'বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তাঁর সঙ্গীত-সাধ প্রথম রূপ ধারণ করলে। কজন অনুগামীকে নিয়ে গঠিত হল তাঁর অর্কেস্ট্রা দল। তার তখনকার নাম ব্লু রিবন স্ট্রিং ব্যাণ্ড (Blue Ribbon Striug Band)।

নামে ব্যাণ্ড হলেও প্রথম থেকেই তার অর্কেস্ট্রার চরিত্র। অর্থাৎ ঐকতান। দক্ষিণাচরণের সেই নতুন অর্কেস্ট্রায় সব যন্ত্র বা কয়েকটি

যন্ত্র একই স্বরবিন্যাস বাজাবে না। একই সঙ্গে বাজতে থাকবে আলাদা আলাদা অংশ। আর, সকলের সহযোগে একটি বৃহৎ সঙ্গীত পরিকল্পনা মূর্ত হয়ে উঠবে!

হার্মনাইজেশন। সংযোগ অলঙ্করণের সেই জটিল প্রক্রিয়া। তার নিয়মবদ্ধ রূপায়ণ দক্ষিণাচরণের নেতৃত্বে এই দলে ঠিকই হল। তবে তাঁর উপযুক্ত উপকরণের অভাব। সম্পূর্ণ অর্কেস্ট্রার সব যন্ত্রের আয়োজন তিনি কি করে করবেন? সঙ্গতিহীন দরিদ্র তিনি। দেশবাসীর কাছ থেকে উপযুক্ত আনুকূল্যও অসম্ভব। আট অক্টেভের পিয়ানো তো তাঁর ছিলই না। অর্কেস্ট্রার চার অংশ বেস টেনর অল্‌টো সোপ্রানোর জন্যে নির্দিষ্ট সব যন্ত্র সংগ্রহ করাও সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। তবু সেই অবস্থায় যথাসাধ্য তিনি করেছিলেন।

আর একটি বিশেষত্ব তাঁর অর্কেস্ট্রায় প্রথম থেকেই দেখা যায়। সেকথা বলাও হয়েছে আগে। রাগের ভিত্তিতেই তাঁর বৃন্দবাদন। সম্পূর্ণ রাগ হার্মনাইজ করেই সে অর্কেস্ট্রা। ধরনে, ইউরোপীয়। কিন্তু সুরে ভারতীয়।

দক্ষিণাচরণের প্রধান কৃতিত্ব সেইখানে। এমন সার্থকভাবে এত দীর্ঘকাল যাবৎ এ কাজ আর কেউ করেননি। তাঁর স্বপ্ন ও সাধন ছিল পাশ্চাত্ত্য ধারার সঙ্গে ভারতীয় রীতির একদিকে যোগ স্থাপন। দুয়েরই নিজস্ব রূপ অবিকৃত রেখে। তাই ঔড়ব (এক স্বর বর্জিত রাগ) ও খাড়ব (দুই স্বর বর্জিত রাগ) জাতীয় রাগে তিনি হার্মনাইজ করতেন না। বলতেন, 'এ চলবে না। হার্মনাইজ করবার সময় বর্জিত স্বর এসে পড়তে পারে। তাহলে রাগ নষ্ট হবে।'

কখনো কখনো তিনি পুরোপুরি ইউরোপীয় সঙ্গীতের অর্কেস্ট্রাও করতেন। অর্থাৎ রাগের ভিত্তিতে নয়। সেসব সুর রচনায় কোন সম্পর্ক রাখতেন না রাগের সঙ্গে।

ব্লু রিবন দল যখন প্রথম তিনি করলেন তখন দক্ষিণাচরণের

তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স। তাঁর সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ যন্ত্রীই সে সময় সৌখীন অর্থাৎ অপেশাদার। কিন্তু সকলেই উপযুক্ত। তিনি সেই বয়সেই তাঁদের যোগ্য শিক্ষায় গড়ে নিয়েছিলেন।

তাঁর অর্কেস্ট্রা দলের সঙ্গে নীল ফিতার কোন সম্পর্ক ছিল না, নাম দেখে তেমন মনে হলেও।

তরুণ বয়স থেকেই দক্ষিণাচরণ ধার্মিক, নীতিপরায়ণ। তাঁর অর্কেস্ট্রার ব্লু রিবন নামকরণও সেই কারণে। নামটির সঙ্গে সম্পর্ক আছে স্থনীতির, স্থনীলের নয়।

সে সময় ইংলণ্ডে খুব প্রসিদ্ধ ছিল ব্লু রিবন সোসাইটি। নীতি প্রচারের জন্যে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা আর নাম।

সেকালে যেমন ইংলণ্ডের অনেক ঢেউ বাংলায় আলোড়ন তুলত, তেমনি ইংলণ্ডের এই স্থনীতির আন্দোলনও বিখ্যাত হয় কলকাতায়। দক্ষিণাচরণ স্বভাবে ধর্মপ্রাণ, নীতি-অনুসারী। তিনি ব্লু রিবনের আদর্শে ও নামে আকৃষ্ট হলেন। নিজের অর্কেস্ট্রা দল তৈরি করেছিলেন সেই সময়েই। তাই সে বাদ্যগোষ্ঠীর নাম দিলেন ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা। সকলে যেন জানেন যে তিনি এবং তাঁর দলের সকলে দুর্নীতিবিরোধী। তাঁর সম্প্রদায়ে কোন নীতিভ্রষ্টের স্থান নেই। এই অঘোষিত আদর্শের প্রয়োজনও ছিল সেকালের পরিবেশে।

সঙ্গীতজীবনের নানা দিকে তাঁর ধার্মিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। নন্দরাম সেনের সেই শিবমন্দিরটিরও স্থান আছে তাঁর সঙ্গীতচর্চার জীবনে। সে মন্দিরচত্বরে বসে তিনি প্রথম বাঁশি বাজাতে শেখেন বলেই নয়। প্রথম দিকে ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রার মহলা দিতেন মন্দিরের সেই বিরাট চাতালে। কোন কোন ছাত্রকে সেখানে অর্কেস্ট্রার জন্যে শেখাতেনও। প্রথম ব্লু রিবনের পুরো বাজনাও হয়েছে শিবমন্দিরে। তখন শখ করেই তিনি অর্কেস্ট্রা বাজাতেন। দেবতাকেই প্রথম শোনান তাঁর এত সাধের বৃন্দবাদন। পেশাদার হয়েছিলেন পরে।

সেই শিবমন্দিরে শিবরাত্রিতে পরেও কিন্তু প্রতি বছর তিনি সদলে আসতেন। তার চত্বরে বাজত তাঁর অর্কেস্ট্রা। সে অঞ্চলের লোকেরা এসে শুনত। দক্ষিণাচরণের দলের তখন খুবই নাম। কর্ম-ব্যস্ত পেশাদারী অর্কেস্ট্রা পরিচালকের জীবন। নানা অনুষ্ঠান থেকে ডাক আসে। স্টার থিয়েটারে বাজে তাঁর অর্কেস্ট্রা। কিন্তু শিব-রাত্রির দিন নন্দরাম সেনের সেই মন্দিরে ঠিক শোনা যায় ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা।

তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব, বেলুড় মঠে। রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত দক্ষিণাচরণ এদিনটিতেও প্রত্যেক বছর তাঁর অর্কেস্ট্রা শোনাতে যেতেন। এই অনুষ্ঠানেই নিবেদন করতেন অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা। নিজের এবং দলের সকলের। ব্লু রিবন গোষ্ঠীতে এমনি একটি ধর্মের দিকে টান ছিল বরাবর।

এখানে তাঁর ব্যক্তি-কথা একটু বলে নেওয়া যায়। কেমন করে হলেন সর্বক্ষণের সঙ্গীতশিল্পী। পেশাদার হয়ে অর্কেস্ট্রা চালাবার ইচ্ছা তাঁর প্রথমে ছিল না। তাই অর্কেস্ট্রা দল গড়ার আগে চাকুরি নিয়েছিলেন তিনি। তখন ভেবেছিলেন, অপেশাদার থেকে সঙ্গীত সেবা করে যাবেন। সাংসারিক অনটনের জন্যে তাই কাজ আরম্ভ করেন টাঁকশালে।

কিন্তু সঙ্গীত তাঁর সারা মন অধিকার করে থাকত। অন্য কাজে আর মন যেত না কিছুতেই। দুদিক বজায় রাখা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত সঙ্গীতচর্চার অসুবিধা হবে বলে ত্যাগ করলেন টাঁকশালের স্থায়ী চাকুরি। তখন থেকে সঙ্গীতই তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। যন্ত্রসঙ্গীতে শিক্ষাদানকেই বৃত্তি হিসেবে নিলেন। ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা পত্তন করেছেন সম্প্রতি। প্রথম দিকে রামেশ্বর শিবমন্দিরে বাজাতেন। তেমনি অন্য জায়গায় অর্কেস্ট্রার জন্যেও অর্থ নিতেন না তখনো।

দক্ষিণাচরণের নানা যন্ত্রে হাত ছিল। তাই পেশাদার জীবন

আরম্ভ করলেন যন্ত্রশিক্ষক হিসেবে। তবে জানা যায়, এ বিষয়েও তিনি ছিলেন পরম উদার। অনেককে বিনামূল্যে শিক্ষা দিতেন। বৈতনিক ও অবৈতনিক ছাত্রদের তারতম্য করতেন না শেখাবার বিষয়ে।

এদিকে ব্লু রিবন স্ট্রিং ব্যাণ্ডও সৌখীনভাবে চলেছে। আর একটি কথা বলা হয়নি। ব্লু রিবনের আগে দক্ষিণাচরণ গঠন করেছিলেন ফিলহার্মনিক ব্যাণ্ড (Philharmonic Band)। এটিও অপেশাদার হিসেবে বাজাতেন। ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা পত্তনের পর বন্ধ করে দেন ফিলহার্মনিক ব্যাণ্ড।

ক্রমে ব্লু রিবনের নাম ছড়িয়ে পড়ল। এমন অর্কেস্ট্রা আগে শোনা যায়নি কলকাতায়। বাজাবার জন্যে নানা জায়গা থেকে ডাক আসতে লাগল। এতগুলি যন্ত্রীর যাতায়াতের খরচ, সময়ের প্রশ্ন ইত্যাদি দেখা দিলে এবার। যন্ত্র শেখাবার জন্যে অর্থ নিতে তো আরম্ভ করেছিলেন দক্ষিণাচরণ। এখন ব্লু রিবনও পেশাদার হল। এইভাবে তিনি হলেন সর্বক্ষণের সঙ্গীত-ব্যবসায়ী। সঙ্গতি থাকলে তিনি সৌখীনই থেকে যেতেন। যেমন ছিলেন সেকালের নানা বাঙালী গুণী।

ওদিকে মহলার জন্যেও বারো মাস শিবমন্দিরে অসুবিধা হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত স্থায়ী ব্যবস্থা হল বাগবাজারে। তাঁর প্রিয় শিষ্য কৃষ্ণচন্দ্র দাসের বাড়িতে। তখন থেকে অর্কেস্ট্রার সমস্ত প্রস্তুতি সেখানেই হত। কৃষ্ণচন্দ্রের আবাস হল তাঁদের সঙ্ঘস্থান যেন। বাইরে বাজাতে যাবার সময়ও সকলে যাত্রা করতেন সেখান থেকেই।

ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রার জয়যাত্রারও আরম্ভ সেই বাগবাজারের বাড়িটি থেকে। দক্ষিণাচরণের শিল্পীজীবনের সার্থকতার সঙ্গেও সেই গৃহ ও গৃহপতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

তাঁর জীবনের এই পর্ব থেকে কৃষ্ণচন্দ্র দাসের সঙ্গে তাঁর অচ্ছেদ্য

বন্ধন দেখা যায়। তখন থেকে দক্ষিণাচরণের আমৃত্যু নিষ্ঠাবান সেবক ও পোষক ছিলেন পরম স্নেহের এই শিষ্যটি। গুরুর অর্কেস্ট্রা জীবনের সহকর্মী যন্ত্রী, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সহযোগী, বহু সুখদুঃখের দিনে সঙ্গী, অনেক আশা-ভরসার স্থল কৃষ্ণচন্দ্র। দক্ষিণাচরণের সঙ্গীতজীবনে তাঁর কথা বিশেষ করে বলবার।

যন্ত্রীদল গঠন করবার কিছুদিনের মধ্যেই কৃষ্ণচন্দ্রের সহায়তা তিনি নানাভাবে পেতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে দক্ষিণাচরণের পরিচয় অবশ্য আরো আগে। কৃষ্ণচন্দ্রের স্কুলজীবন থেকে। সেই বিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায়ই তিনি দক্ষিণাচরণের সঙ্গীত-শিষ্য। তাঁর কাছে বেহালা শেখা আরম্ভ করেছিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের কথা জানাবার আছে আরো আগে থেকে। তাঁর পূর্বপুরুষ প্রসঙ্গও বক্তব্য। সেই সূত্রে সুমিষ্ট সঙ্গীতের সঙ্গে আর একপ্রকার মিষ্টত্বের কথাও এসে যায়। একেবারে মিষ্টান্ন—রসগোল্লা। বাগবাজারের আদি ও অকৃত্রিম রসগোল্লা। কৃষ্ণচন্দ্র একদিকে সঙ্গীতরসের শিল্পী, অন্যদিকে রসগোল্লার সার্থক কারবারী। রসগোল্লার উদ্ভাবক ও প্রচলনকর্তা হলেন বাগবাজারের নবীনচন্দ্র দাস। তাঁরই একমাত্র পুত্র এবং ব্যবসায়ের উত্তরচালক কৃষ্ণচন্দ্র।

বাগবাজারের অতি পুরনো বাসিন্দা এই দাস বংশ। নবীনচন্দ্রের জন্ম ১৮৪৬ সালে (মৃত্যু সন ১৯২৬)। তাঁরও চার-পাঁচ পুরুষ আগে থেকে তাঁদের বাগবাজারে বাস। কিন্তু তখন রসগোল্লার জন্ম হয়নি।

নবীনচন্দ্র বাগবাজার-নিবাসী। তিনি এই সরস মিষ্টান্নের রসিক স্রষ্টিকর্তা। তাই 'বাগবাজারের রসগোল্লা' কথাটিরও চলন হয়ে যায় রসগ্রাহীদের মুখে মুখে।

নবীনচন্দ্রদের বাগবাজারে আদি বাড়ির ঠিকানা ছিল ৪, কাশী মিত্র স্ট্রীট। তখন তার ধার দিয়ে প্রবহমানা গঙ্গা দেখা যেত।

নবীনচন্দ্রের পিতামহের সময় থেকে এ বংশ ছিলেন চিনি ব্যবসায়ী। বিলাতে পর্যন্ত তাঁরা চিনি রপ্তানি করতেন। নবীনচন্দ্রই প্রথম তৈরি করলেন চিনি থেকে পাক করা রসে ভাসমান মিষ্টান্ন। রসগোল্লা নামে যা বিখ্যাত। এমন রসে ভাসানো ছানার গোল্লা (ভাজা ছানার পানতোয়া বা লেডিকেনি অর্থাৎ লেডি ক্যানিংয়ের প্রিয়—নয়) নবীনচন্দ্রের আগে নাকি ছিল না। তাঁর সময় থেকে এই বংশে রসগোল্লার ব্যবসায় সুপরিচিত।

নবীনচন্দ্র ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয়। তখনকার বাগবাজার অঞ্চলের সঙ্গীত পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর শ্বশুরের পিতা হলেন বিখ্যাত গায়ক, কবিয়াল ভোলানাথ দাস (ভোলা ময়রা)।

কাশী মিত্র ঘাটের বাড়ি থেকে নবীনচন্দ্র বাস পরিবর্তন করে আসেন বাগবাজারেরই গোঁসাই লেনে। ৭ সংখ্যক বাড়িতে। সেকালের বিখ্যাত রূপচাঁদ পক্ষী তাঁর নিকট প্রতিবেশী। গোঁসাই লেনের দক্ষিণেই, চিৎপুর পথের পূবদিকে, একতলা বাড়িতে রূপচাঁদের পক্ষীর দলের সেই আখড়াটি ছিল। তাঁর সেই পক্ষীর দলকে শুধু গঞ্জিকাসেবী হিসেবে ব্যঙ্গবিদ্রূপে বর্ণনা করেছেন ব্রাহ্মনেতা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে। রূপচাঁদের সঙ্গীতগুণ, প্রচুর গীত রচনা এবং তাঁর আখড়ার সঙ্গীতচর্চার উচ্চমান সম্পর্কে কোন ধারণাই শাস্ত্রী মশায়ের ছিল না মনে হয়। সে যুগের সঙ্গীত ও নাট্যজগতের অনেক বর্ণোজ্জ্বল চিত্র অকারণ মসীলিপ্ত হয়েছে আর এক রকমের গোঁড়ামির ফলে।

যাই হোক, নবীনচন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের ছেলেবেলা থেকে গোঁসাই লেনে বাস। সেই রূপচাঁদ পক্ষীর আখড়ার পাশেই। আর, কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গীতজীবনের সূচনাও বাল্যকালেই। স্বভাবের প্রেরণায় তিনি তখন থেকেই ছিলেন কীর্তনপ্রিয়। তবে গান গাইতেন না। ঝোঁক ছিল যন্ত্রসঙ্গীতের দিকে। খোল বাজাতেন ভাল। কাটোয়ার খোল-বাদক ভগবান দাস বাবাজীর কাছে খোল-বাদন

শিখেছিলেন। দক্ষিণাচরণের শিষ্য হবার আগেকার কথা সেসব।

জোড়াসাঁকোর নর্মাল স্কুলে পড়তেন কৃষ্ণচন্দ্র। সেখানেই দক্ষিণাচরণের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ। আর তাঁর কাছে বেহালা শেখার আরম্ভ। গুরু-শিষ্যে ঘনিষ্ঠতারও সূত্রপাত তখন থেকে।

দক্ষিণাচরণের শিক্ষায় কৃষ্ণচন্দ্র ভাল বেহালাবাদক হন। আরো কটি যন্ত্রও বেশ বাজাতে শেখেন—ওবো, ইউফোনিয়ম ইত্যাদি।

তাঁর নর্মাল স্কুলে পড়া শেষ হবার ক'বছর পরে ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রার পত্তন। প্রথম কিছুদিন নন্দরাম সেনের শিবমন্দিরে চলবার পর, অর্কেস্ট্রাকে কৃষ্ণচন্দ্র নিজেদের বাড়িতে নিয়ে এলেন। ওই ৭, গোঁসাই লেনে। তার পর থেকে দীর্ঘ এগার-বার বছর যাবৎ দক্ষিণাচরণের অর্কেস্ট্রার ওই হল ঠিকানা! আর তাঁর সঙ্গীতজীবনের কর্মস্থল ও সাধনপীঠ।

রূপচাঁদ পক্ষী তখন আর নেই। লোপ পেয়েছে তাঁর সেই সঙ্গীতমুখর আখড়া। তাঁর পাশের গলি গোঁসাই লেনের সেই শিষ্য-বাড়িতে আসতেন দক্ষিণাচরণ। দিনের পর দিন। বছরের পর বছর। কৃষ্ণচন্দ্রের সেই বাড়িতে বসে ব্লু রিবনের জন্যে পীস্ রচনা করতেন। স্বরলিপি লিখতেন। শিক্ষাও দিতেন ছাত্রদের। অর্কেস্ট্রার মহড়া চলত, বাজানোও হত নিয়মিত। সেই ঠিকানা থেকেই দক্ষিণাচরণ সদলে আসরের জন্যে বেরুতেন।

ব্লু রিবনের সেই প্রথম দলে কৃষ্ণচন্দ্র হলেন এক প্রধান যন্ত্রী। বেশির ভাগ তিনি বেহালা বাজাতেন। কোন কোন দিন প্রয়োজন হলে—ওবো কিংবা ইউফোনিয়ম। তাঁর চারজন জ্ঞাতি ভ্রাতাও ছিলেন এ অর্কেস্ট্রার বিশিষ্ট বাদক। হরিচরণ দাস, নন্দলাল দাস, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ও যোগীন্দ্রনাথ দাস। তাঁদের মধ্যে নন্দলাল বাজাতেন চেলো। অন্য তিনজন বেহালা। হরিচরণ দাস ছিলেন অতি

গুণী বেহালা-শিল্পী। তাঁরা চারজনেই দক্ষিণাচরণের শিষ্য, ব্লু রিবন দলের আরম্ভের সময় থেকে।

তাঁর যন্ত্রী সঙ্ঘের সেই প্রথম পর্বে প্রতিভাবান হাবু দত্তও এই অর্কেস্ট্রার অন্যতম বাদক ছিলেন। অমৃতলাল দত্ত তাঁর নাম। স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাতি ভ্রাতা তিনি। বাংলার এক শ্রেষ্ঠ কলাবৎ। ক্ল্যারিওনেট, বীণা, এস্রাজ ইত্যাদির বাদক এবং ধ্রুপদীও। অপূর্ব সুরেলা ক্ল্যারিওনেট শিল্পী হিসেবে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রার প্রথম ক'বছর তিনি ছিলেন এক প্রধান আকর্ষণ। পরে তিনি নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ক্লাসিক, মিনার্ভা থিয়েটারে ক্ল্যারিওনেট বাজান কিছুকাল। গিরিশচন্দ্রের কোন কোন গীতিনাট্যের (যেমন হরগৌরী) সঙ্গীত পরিচালকও হন। রামপুর দরবারের বীণ্‌কার উজীর খাঁর শিষ্য তিনি। উজীর খাঁ তাঁকে পরে রামপুরেও নিয়ে যান। সেখানে রামপুর নবাবের স্টেট ব্যাণ্ডের পরিচালক হন হাবু দত্ত। পরবর্তীকালের বিখ্যাত আলাউদ্দিন খাঁ প্রথম জীবনে ছিলেন হাবু দত্তের শিষ্য। আলাউদ্দিন খাঁ তাঁর কাছে কলকাতায় একাধিক যন্ত্রে প্রায় দু বছর শিখেছিলেন। হাবু দত্তের সঙ্গীতজীবনের পরিচয় অন্যত্র দেওয়া হয়েছে বিস্তারিতভাবে।

দক্ষিণাচরণের অর্কেস্ট্রায় হাবু দত্তের সঙ্গে আরো একজন বড় গুণী ছিলেন। নন্তিবাবু নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। আসল নাম নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। উৎকৃষ্ট বেহালাবাদক তিনি। নন্তিবাবুর বংশকথাও জানবার মতন। তিনি হলেন নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের শ্যালক ব্রজনাথ দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। নরেন্দ্রকৃষ্ণের অন্য দুই ভ্রাতা চুনীলাল ও নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ বাংলার রঙ্গমঞ্চে যশস্বী অভিনেতারূপে সুপরিচিত হন। নন্তিবাবুর সঙ্গীতপ্রতিভা তাঁর পিতা ব্রজনাথের উত্তরাধিকার। ভগিনীপতি গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্‌যোগী ব্রজনাথ বিচক্ষণ সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী (বারাণসীর) জোয়ালাপ্রসাদ মিশ্র, নিমাই অধিকারী (বেণী ওস্তাদ বা বেণীমাধব

অধিকারীর পিতা) প্রমুখের কাছে রাগসঙ্গীত শেখেন ব্রজনাথ। অন্যদিকে ইংরেজ শিক্ষকের কাছে ইউরোপীয় সঙ্গীতও শিক্ষা করেন। সৌখীন নাট্যমঞ্চে ব্রজনাথ ইউরোপীয় স্বরলিপি প্রচলন করেন কন্‌সার্টের দল করে। ব্রজনাথ তাঁর শ্যামপুকুরের বাড়িতে একটি উচ্চমানের ঐকতান বাদন দল (কন্‌সার্ট পার্টি) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথম ক্ল্যারিওনেট তাঁর সম্প্রদায়েই বাজানো হয়েছিল, 'বিশ্বকোষ'-এর মতে। তারের নানা যন্ত্র, পিক্‌লো, জলতরঙ্গ, ক্ল্যারিওনেট ইত্যাদি নিয়ে বাজত ব্রজনাথের কন্‌সার্ট। তাঁর যন্ত্রীদল চৈত্র মেলায়ও (হিন্দু মেলা) ঐকতান শুনিয়েছিলেন। ব্রজনাথের প্রসঙ্গে বলা যায়, তাঁর বাড়ির সঙ্গীত পরিবেশেই রাগসঙ্গীত বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞ হয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র। তার ফলে নাট্যশালার সঙ্গীত শিক্ষক ও সুরসংযোজকদের পরে তিনি নির্দেশাদি দিতেন। আর অকালগত ব্রজনাথের সঙ্গীতে উত্তরাধিকার পান তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রকৃষ্ণ।

ব্লু রিবন দলে নন্তিবাবু বেহালা বাজাতেন। হাবু দত্তের মতন তিনিও ছিলেন এই অর্কেস্ট্রার এক মুখ্য শিল্পী। পরে তিনি দক্ষিণাচরণের সম্প্রদায় ত্যাগ করে যান। গঠন করেন নিজের অর্কেস্ট্রা দল। নন্তিবাবুর সেই অর্কেস্ট্রা হয়েছিল পুরোপুরি ইউরোপীয় পদ্ধতির। অর্থাৎ শুধু পাশ্চাত্ত্য হার্মনির পীস্ তিনি রচনা করতেন। তা-ই বাজত তাঁর অর্কেস্ট্রায়। ভারতীয় সঙ্গীত বা রাগের কোন সংস্পর্শ সেখানে থাকত না। তাঁর অর্কেস্ট্রাও সমাদর পায় উচ্চমানের বলে।

আর দক্ষিণাচরণের ব্লু রিবন দল রাগ বাজাবার জন্যেই দিন দিন প্রসিদ্ধ হতে থাকে। তবে তাঁর অর্কেস্ট্রা কখনোই ইউরোপীয় দৃষ্টান্তের মতন বৃহৎ আকারের হয়নি, প্রকারে তার সগোত্রীয় থেকেও। সেই পর্বেও তাঁর যন্ত্রীদের সংখ্যা বার জনের অনধিক। আর পরেও তাই। যন্ত্র ছিল—বেহালা, ক্ল্যারিওনেট, চেলো, ভাস, ডাবল্ ভাস, কর্নেট, ইউফোনিয়ম, ওবো ইত্যাদি। বেহালায় ফার্স্ট ভায়োলিন, সেকেণ্ড

ভায়োলিনের প্রকারভেদ অবশ্যই ছিল। এমনি এগার-বারটি যন্ত্রে বাজত দক্ষিণাচরণের হার্মনাইজ করা চমৎকার সব পীস্। আর স্টিক্ হাতে তিনি যন্ত্রীদের সামনে দাঁড়িয়ে দু হাতের ভঙ্গিমায় রীতিমত পরিচালনা করে যেতেন।

তখন কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ি থেকে আরম্ভ হয়ে গেছে ব্লু রিবনের পেশাদারী পর্যায়। এমন সময় তাঁর সঙ্গে প্রমোদকুমার ঠাকুরের যোগাযোগ ঘটল। দক্ষিণাচরণের সঙ্গীতজীবনে আর এক স্মরণীয় ঘটনা। তার ফলে তাঁর ইউরোপীয় সঙ্গীতচর্চা আরো সমৃদ্ধ হয়েছিল। অর্কেস্ট্রা সাধনে নতুন করে প্রেরণা পান তিনি।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমোদকুমারও তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভার এক সুযোগ্য আধার। তবে রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে নয়। পাশ্চাত্ত্য রীতির শিল্পী তিনি। প্রথম জীবনেই এই সঙ্গীতের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। অল্পায়ু না হলে সঙ্গীতক্ষেত্রে প্রমোদকুমারও স্মরণীয় নাম রেখে যেতেন। পিতার অতি যোগ্য পুত্ররূপে আরম্ভ হয় তাঁর সঙ্গীতজীবন। রাগসঙ্গীতে অনভিজ্ঞ ছিলেন না বটে। কিন্তু ইউরোপীয় সঙ্গীতই তাঁর সাধনের বিষয় হয়। আর সেই ধারায় বিশেষ কৃতী হন অল্প বয়সেই।

দক্ষিণাচরণের সঙ্গে পরিচয়ের কিছু আগেই প্রমোদকুমার একটি নতুন সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। ইউরোপীয় রীতির একটি নৃত্য-সঙ্গীত। তার নাম দেন লেডি ডাফরিন ভাস (Lady Duffrin Valse)। বড়লাট লর্ড ডাফরিনের ব্যাণ্ড আর ইডেন উদ্যানের টাউন ব্যাণ্ডে সেটি বাজত। প্রমোদকুমারই স্বরচিত নৃত্যসঙ্গীতটি উপহার দিয়েছিলেন সেই দুটি বিশিষ্ট ব্যাণ্ড পার্টিকে।

এমন সময় দক্ষিণাচরণ একদিন সেই ভাস শুনলেন। মুগ্ধ হয়ে গেলেন তার হার্মনিতে।

প্রমোদকুমারের সঙ্গে দেখা করে বললেন, 'চমৎকার ভাস। এটি আমার অর্কেস্ট্রায় বাজাবার অনুমতি দিন।'

'বেশ তো,' প্রমোদকুমার সম্মতি জানালেন। 'তৈরি হলে একদিন শোনাবেন আপনার অর্কেস্ট্রায়।'

দক্ষিণাচরণ যন্ত্রীদের নিয়ে খুব ভাল করে সেটি মহড়া দিলেন।

তারপর একদিন ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রায় বাজল লেডি ডাফরিন ভাস।

প্রমোদকুমারের সঙ্গে আরো কজন বিশিষ্ট শ্রোতা সেখানে ছিলেন। সকলেরই ভাল লাগল দক্ষিণাচরণের দলের এই বাজনা। প্রমোদকুমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা আর তার দলপতির জয়যাত্রার এক মূল্যবান পাথেয় হল প্রমোদকুমারের স্বীকৃতি। তাঁর সঙ্গে দক্ষিণাচরণের সাঙ্গীতিক সংযোগ ঘটল। ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাও। দক্ষিণাচরণের প্রতিভার পরিচয়ে বিশেষ আকৃষ্ট হলেন তিনি। ইউরোপীয় সঙ্গীতে নিজের লব্ধজ্ঞান প্রমোদকুমার তাঁকে দিতে লাগলেন। কিন্তু অকাল মৃত্যু তাতে ছেদ টেনে দেয় অনতিপরেই।

তবে দক্ষিণাচরণের শিল্পীজীবনকে তিনি আরো উদ্দীপিত করে দিয়ে যান। নব নব সৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে বাজতে থাকে ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা।

বাস্তব প্রয়োজনে অর্কেস্ট্রা বাদনের জন্যে অর্থ নেওয়া আরম্ভ হল। কিন্তু কি এমন তার পরিমাণ? অর্কেস্ট্রার গুণের হিসেবে তা পর্যাপ্ত নয় আদৌ। নেহাত কজন যন্ত্রী ছিলেন সম্পন্ন ঘরের সন্তান। সৌখীন গুণী তাঁরা, দক্ষিণাচরণেরই শিষ্য। আর তাঁর নিজের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার প্রয়োজনও ছিল অল্প। তাই অর্কেস্ট্রার অস্তিত্ব সম্ভব হয়। স্টার থিয়েটারে অনেক বছর স্থায়ীভাবে বাজত ব্লু রিবন। হাতিবাগানের স্টার তখন অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু প্রমুখ চারজনের অধিকারে। স্টারের নিয়মিত বেতন অর্কেস্ট্রার পক্ষে অপরিহার্য, এই তো অবস্থা। কিন্তু অর্কেস্ট্রার সঙ্গীতস্রষ্টা ও পরিচালক সেজন্যে হতাশ্বাস হতেন না। নতুন নতুন পরিকল্পনায় তাঁর অর্কেস্ট্রা বিনোদন করে যেত রসিকজনের চিত্ত।

কৃষ্ণচন্দ্র দাসের সেই গোঁসাই লেনের বাড়িতে এমানভাবে ব্লু রিবনের প্রায় বার বছর চলে যায়। বাংলার সঙ্গীতজগতে অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত তখন এই অর্কেস্ট্রা। বিভিন্ন সম্পূর্ণ রাগে হার্মনি প্রয়োগের অভিনবত্ব আস্বাদ করে শ্রোতারা।

প্রায় বার বছর পরে ব্লু রিবনের ঠিকানা স্থানান্তরিত হয়। বাগবাজার থেকে কুমারটুলিতে। তাঁর আর দুজন প্রিয় শিষ্য কিরণচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র মিত্র। তাঁরা দু ভাই গুরুর এই সম্প্রদায়কে সাদরে নিয়ে আসেন নিজেদের গৃহে।

উত্তর কলকাতায় কুমারটুলির বনিয়াদী মিত্রবংশীয় কিরণচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র। তাঁরা দুজনেই ব্লু রিবনের কৃতী যন্ত্রী। মুখ্যত বেহালা শিল্পী। কিন্তু অন্য ক'টি যন্ত্রেও হাত ছিল। সখের সাধন হলেও তাঁরা শ্রম করে শিখেছেন দক্ষিণাচরণের কাছে।

সেই মিত্র পরিবারের বসতি তখন কুমারটুলির প্রকাণ্ড এলাকা জুড়ে। উত্তরমুখী চিৎপুর রোডের বাঁদিকে বনমালী সরকার স্ট্রীট আরম্ভ। সেই সংযোগস্থল থেকে বরাবর পশ্চিম দিকে, এখন যেখানে কুমারটুলি পার্ক সেই পর্যন্ত ছিল তাঁদের বাসাঞ্চল ও অধিকার। কুমারটুলি পার্কের জায়গায় তখন দেখা যেত এক বৃহৎ পুষ্করিণী।

মিত্র বংশের সেই বাড়িগুলির মধ্যে একটিতে ব্লু রিবনের নতুন আখড়া হল। বনমালী সরকার স্ট্রীটের একটি বাঁক নেবার জায়গায় সেই বাড়িটি। তার একতলার প্রশস্ত বৈঠকখানা ব্লু রিবনের জন্যে তাঁরা দিলেন। এবার মহড়া, রচনা, স্বরলিপি, অনুষ্ঠানের জন্যে যাওয়া সবই হতে লাগল এখান থেকে।

দক্ষিণাচরণের সঙ্গীতজীবন আর ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রার সঙ্গে মিত্রদের এই গৃহ অতি দীর্ঘকাল বিজড়িত থাকে। প্রায় ১৮ বছর। যখনই তিনি হার্মনাইজ করতেন, নিজের হাতে লিখে রাখতেন সব স্বরলিপি। তাঁর হাতে লেখা খাতাগুলিও এখানেই রাখতেন, কিরণচন্দ্রের হেফাজতে। দক্ষিণাচরণের অতি প্রিয়, আস্থাভাজন

ছাত্র তিনি। গুরুর শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক। দক্ষিণাচরণের মৃত্যুর পরে কিরণচন্দ্রই হয়েছিলেন ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রার দলপতি।

আঠারো বছর পরে অর্কেস্ট্রার আর একবার আখড়া বদল হয়। কুমারটুলীর মিত্রালয় থেকে একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে। ১, নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের দোতলায়। দক্ষিণ-অভিমুখী চিৎপুর রোডের বাম অর্থাৎ পূর্বদিকে এই রাস্তা। সেই নন্দরাম সেন স্ট্রীটের প্রায় বিপরীতে। এটিও শোভাবাজার এলাকার মধ্যে। দক্ষিণাচরণের সমস্ত সঙ্গীত-জীবনই এই বাগবাজার-কুমারটুলি-শোভাবাজার অঞ্চলে উদ্‌যাপিত হয়েছিল।

নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে চিৎপুর রোডের দিকের এই দোতলায় ছ-সাত বছর ছিল ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রার ঠিকানা। দক্ষিণাচরণের অর্কেস্ট্রা জীবনের এটিই শেষ পর্ব।

প্রায় সাত বছর এখান থেকে সম্প্রদায় পরিচালনার পর তিনি অবসর নেন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়েছিল। আর, অধ্যাত্ম বিষয়েও অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন তারপর। প্রথম জীবন থেকেই ধর্মপ্রবণতা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এখন তা তাঁর অন্তর অনেকখানি অধিকার করে। তবে সঙ্গীতজীবনে ছেদ পড়েনি একেবারে।

দক্ষিণাচরণ এখন অর্কেস্ট্রার দায়িত্ব থেকে মুক্তি নেন। সে কাজের ভারপ্রাপ্ত হন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য কিরণচন্দ্র মিত্র। আর দক্ষিণাচরণ পুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সঙ্গীতের তত্ত্ব আলোচনায়। তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে। কিন্তু আর ইউরোপীয় পদ্ধতি নিয়ে নয়। রাগের গঠনই হয় তাঁর পর্যালোচনার বিষয়। ছাত্রদের শিক্ষণীয় রূপেই এবার তিনি এ কাজে হাত দেন। ব্যাপৃত হন 'রাগের গঠন শিক্ষা' প্রণয়নে। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ পুস্তক। সুদীর্ঘকালের অনুশীলিত, সঙ্গীত-ভাবুক চিত্তের পরিণত ফল।

একেবারে অন্তিম সময় পর্যন্ত দক্ষিণাচরণ এ কাজে নিযুক্ত থাকেন। বহুদিন যাবৎ, সারাদিনের অনেকক্ষণ। কৃষ্ণচন্দ্র দাসের নতুন গৃহে

চলে তাঁর এই পুস্তক রচনা। তার অনেক আগে থেকে কৃষ্ণচন্দ্র আর ব্ল্ রিবন অর্কেস্ট্রায় ছিলেন না। এর মধ্যে তাঁর প্রভূত ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ হয়। তবে সঙ্গীতজীবন থেকে কৃষ্ণচন্দ্র প্রায় সরে এলেও গুরুর সঙ্গে যোগ থাকে বরাবর। এখন নিজের নব ভবনে দক্ষিণাচরণকে দিনের অধিকাংশ সময় রেখে দিতেন।

দক্ষিণাচরণ প্রিয় শিষ্যের এই নতুন গৃহে সকাল দশটা এগারটা থেকে রাত আটটা-নটা পর্যন্ত অতিবাহিত করতেন 'রাগের গঠন শিক্ষা' রচনায়। ছ'খণ্ডে এই গ্রন্থমালা সম্পূর্ণ করবার জন্যে তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এজন্যে তিনি উপকরণ সংগ্রহ করে চলেছিলেন অনেক আগে থেকে। সেই শেষ জীবনে তা সমাপ্ত করবার গুরুদায়িত্ব নিয়েছিলেন। তারই অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর ভঙ্গ হয় একেবারে। 'রাগের গঠন শিক্ষা' দ্বিতীয় খণ্ড সেই অবস্থায় মুদ্রিত করেছিলেন। তার শেষ ফর্মা প্রেসে দেবার পরই যবনিকাপাত হয় দক্ষিণাচরণের জীবনে। বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। 'রাগের গঠন শিক্ষা'র বাকি চার খণ্ড প্রকাশের সাধ তাঁর অপূর্ণ রয়ে গেল।

সেই শেষ পর্বে তিনি বাস করেছেন বাগবাজার স্ট্রীটের দক্ষিণে একটি গলিতে। শ্যামবাজারের মোড় থেকে অদূরে। এখনকার ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভেনিউর উত্তরে সেই সরু রাস্তাটি। সে বাড়ির ঠিকানা সঠিক জানা যায়নি। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

দক্ষিণাচরণের দেহান্তের পর তাঁর পত্নী জীবিত ছিলেন প্রায় পনের বছর। তখন ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর গুরুপত্নীকে প্রদত্ত মাসিক বৃত্তি জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রধান সম্বল ছিল।

দক্ষিণাচরণের মৃত্যুর অনেকদিন পরে অন্য একটি পথের নামকরণ হয় 'দক্ষিণাচরণ সেন লেন', তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে। কিন্তু সঙ্গীত-সমাজের এমন এক বিশিষ্ট প্রতিভার উপযুক্ত স্মারক কিছুই নেই।

বাগবাজার ও কুমারটুলি মিলিয়ে ব্ল্ রিবনের আখড়া ছিল বছর ত্রিশেক। দক্ষিণাচরণের সঙ্গীতজীবনে সেটিই সবচেয়ে গৌরবের

আঁধারে কিরণ

কিরণময়ী

গহর জানেরই সগোত্রা। আর সঙ্গীতজীবনও গহর জানের সমকালীন। কিন্তু পরিবেশে কিছু পার্থক্য আছে। হয়ত ভাগ্যেও।

তাই প্রতিভাময়ী হয়েও এমন লুপ্ত-স্মৃতি কিরণময়ী।

অন্ধকারের অতল থেকে উঠে আসে নামটি।

কিরণময়ী। নিশান্তের অরুণ রেখা যেন। আবার মেঘের আড়ালে সব রশ্মি ঢেকে যায়। দূর থেকে ভেসে আসা গানের করুণ রেশ যেমন মিলিয়ে যেতে থাকে হাওয়ায় হাওয়ায়।

আবছায়া পটে কিরণের কনকলেখা। কখনো আঁধার নিবিড় হয়ে অংশুমালা গ্রাস করে। কখনো দ্যুতি ফুটে ওঠে ম্লান ধূসর ছায়ার বুকে। হারানো সুর ফিরে ফিরে আসে, স্ফুটতর হয়। রূপ ধরে গানের কলি। গান ও ছন্দের বিগ্রহ অঙ্গাঙ্গী এসে দাঁড়ায়। মূর্তিমতী হয়ে ওঠে সুদূর অতীত।

নৃত্যপরা, সুরাঙ্গনা কিরণময়ী।

দুই মেরু নিবাসিনী। ঝাড়-লণ্ঠনের আলোঝলমল বিলাসী আসর। নৃত্যচ্ছন্দে সঙ্গীত-ঝঙ্কারে উচ্ছল উদ্বেল। নূপুর শিঞ্জিনীতে সানন্দ মুখর। দুঃখ বিষাদের ছায়ালেশহীন। সকলই সুবেশ মনোহর, মুগ্ধ নয়ন মন।

আরেক প্রান্ত তমসায় আচ্ছন্ন। যবনিকার অন্তরালে আরণ্যক বিচরণ। বেদন-বীণা সেখানে নীরবে আত্মগোপন করে থাকে।

কখনো বিদ্যুদ্দামে ফোটে রূপ দৃশ্য। প্রভাময়ী প্রতিমা জেগে ওঠে। আলোর জন্যে আকুতি যেন। কিরণময়ীর জীবন আলেয়া।

আলো-আঁধারির মায়ার খেলা। আবছায়ায় ঘেরা ভাগ্য-বিড়ম্বিতা। যশ-অপযশের দোলায় উন্মুখর জীবন-নাট্য।

সেই অন্ধ জগতের আজন্ম বাসিন্দা। কিন্তু শুধুই সে ধারায় প্রাণধারণ তো নয়। ললিতকলা দেবীর সেবিকা। কলালক্ষ্মীর আশীর্বাদে ধন্যা, সঙ্গীতগুণে আলোকলতা। উত্তরণ ঘটেছে জ্যোতির তীরে। গীতের আসরে, রূপ ছন্দের আসরে। গানে গানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। ছন্দে ছন্দে লীলায়িত রূপাঙ্গনা। শিল্প মানে, গুণীজনের স্বীকৃতিতে সার্থক।

তবু সে সৌভাগ্য সাময়িক। কারণ সামাজিক অন্তরায়। কিরণময়ী বিগ্রহ অন্ধকারে মুখ লুকোয়, হয়ত আলোর তৃষা অতৃপ্ত রেখে। রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গীতও হারায়, তটরেখা পার হয়ে নিঃশব্দ দৃশ্যহীন পারাবারে।

বিগত কালের বিপরীতমুখীন গন্ধর্বলোক। সেই জগৎ থেকে কলাবতীর কিছু বার্তা ভেসে আসে। খণ্ড, বিচ্ছিন্ন বিস্মৃতির তল থেকে উঠে-আসা কয়েকটি মাত্র সংবাদ। কে স্মরণে রাখে জন্মলগ্নে পতিতার কাহিনী?

সেই ক'টি ছিন্ন সূত্রে গাঁথতে হবে বিনি সুতোর হার।···

সেদিন তারাপ্রসাদ ঘোষ একটি বড় আসর বসিয়ে ছিলেন তাঁদের হেদুয়ার উত্তর ধারের বাড়িতে। সেই তারাপ্রসাদ। যিনি তরুণ বয়সে যেতেন বড়কু মিঞার রামনগরের ঘরে। একটি মোহর, এক ভরি আফিম আর এক হাঁড়ি কালাকাঁদ ওস্তাদজীকে ভেট দিতেন।

তারাপ্রসাদ এখন পরিণত-বয়সী, কলকাতার সঙ্গীত সমাজে সর্ব-পরিচিত। তাঁর বীডন স্ট্রীটের বাড়িতে কলকাতার একটি শ্রেষ্ঠ আসর। কজন নামী কলাবৎকে তিনি তো আশ্রয় দিয়েই রেখেছেন। কলকাতায় যত কলাবৎ-কলাবতীর আগমন ঘটে, তাঁদেরও অনেকের গান-বাজনা শোনা যায় তাঁর বাড়ির আসরে। সঙ্গীতপ্রেমী তারাপ্রসাদ

সঙ্গীতের জন্যে দরাজ হাতে খরচ করে থাকেন। আর তাঁর আসরে শ্রোতা হয়ে আসেন শহরের অনেক বনিয়াদী ঘরের সঙ্গীত-রসিক। সেদিনকার আসরেও এসেছিলেন।

অনেকক্ষণ গান-বাজনার পর আসর ভঙ্গ হল তাঁর বাড়িতে। শ্রোতা অভ্যাগতরা বিদায় নিতে লাগলেন।

সদরের সেই বিরাট স্তম্ভের পাশ দিয়ে সকলে বেরিয়ে আসছিলেন ফটকের দিকে। তাঁদের মধ্যে শোভাবাজারের দেব পরিবারের অসীমকৃষ্ণও ছিলেন। তখনকার কালে 'কুমার' যোগে আখ্যাত হতেন তাঁরা। শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ দেবের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ। রাজকৃষ্ণের চতুর্থ পুত্র অপূর্বকৃষ্ণের পৌত্র এবং 'হরিদাসের গুপ্তকথা'-খ্যাত উপেন্দ্রকৃষ্ণের পুত্র অসীমকৃষ্ণ দেব।

আসরের পরে অসীমকৃষ্ণ তখন ফটকের সামনে এসেছেন। সঙ্গে তাঁর কিশোর-বয়সী পুত্র হারীতকৃষ্ণ।

এমন সময় একটি মহিলাও বেরিয়ে এলেন বাইরে। এতক্ষণ তিনি বসে ছিলেন আসরেরই একদিকে। তবে তাঁকে গাইতে দেখা যায়নি।

তিনি সামনে উপস্থিত হতে তাঁকে দু হাত তুলে নমস্কার করলেন অসীমকৃষ্ণ।

মহিলাও প্রতি-নমস্কার করে গেলেন যাবার পথে।

তিনি চলে যাবার পর হারীতকৃষ্ণ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা, আপনি ওঁকে নমস্কার করলেন কেন? কে উনি?'

হারীতকৃষ্ণের বয়স অল্প হলেও লক্ষ্য হয়েছিল। মহিলাটির সাজসজ্জা বা আকৃতির জন্যে তত নয়। সেকালে এমন কারুর পক্ষে প্রকাশ্য আসরে আসা কিংবা বসাই এক অ-সাধারণ দৃশ্য। তাছাড়া, গায়িকা শ্রেণীর নারীও তিনি সেই বয়সে দেখেছিলেন। পিতার সঙ্গেই তাঁদের গান শুনেছেন কোন কোন আসরে।

তাই বিস্মিত হারীতকৃষ্ণ পিতাকে প্রশ্ন করলেন।

অসীমকৃষ্ণ সরলভাবে বললেন, 'কেন নমস্কার করব না?'

তারপর একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে জানালেন মহিলাটিকে সম্মান জানাবার কারণ—'উনি যে আর্টিস্ট। কিরণময়ী।'

'আর্টিস্ট কথাটা সেদিন আমি প্রথম শুনলুম। কোন গান-বাজনার শিল্পীকে যে আর্টিস্ট বলে তা আগে জানতুম না। এজন্যেও সেদিনকার কথা বরাবর আমার মনে আছে।'

তারাপ্রসাদ ঘোষের সদরে সেই দৃশ্য আর কথাবার্তার বর্ণনা দিয়ে পঞ্চাশ বছর পরে গল্প করেন হারীতকৃষ্ণ।

'বাবা সেদিন আমায় বলেছিলেন যে, কিরণময়ী উঁচু দরের গাইয়ে। তবে আমি কিরণময়ীর গান কখনো শুনিনি। আর কিরণময়ীকে ওই একবারই দেখেছি। কিন্তু বাবা অনেকবার শুনেছিলেন কিরণময়ীর গান। আর পরেও তাঁর নাম আর গানের সুখ্যাতি বাবার মুখে শুনেছি। আমার বেশ মনে আছে সেকথা। আর বাবা যে তাঁকে আর্টিস্ট বলেছিলেন সেজন্যে কিরণময়ীর গানের মান ভালই ছিল, আন্দাজ করতে পারি। কারণ বাবা গান-বাজনা বুঝতেন।'

অসীমকৃষ্ণের সঙ্গীত-বোধ সম্পর্কে হারীতকৃষ্ণের কথাটি সত্যি। পিতৃভক্তির অতিকথন বা অতিরঞ্জন নয়। আর হারীতকৃষ্ণ ছিলেন সত্যবাদী। সত্যকার শিক্ষিত অভিজাত, মার্জিতরুচি। বিশেষ আত্মজন সম্পর্কে বরং সংযতভাবে কম করে বলতেন।

সঙ্গীতের একজন পরিশীলিত রুচিবান বোদ্ধা অসীমকৃষ্ণ। নিজেও সঙ্গীতচর্চা করতেন কিছু কিছু। খেয়াল গানের সঙ্গতে হারমোনিয়ম বাজাতে পারতেন। তবে তা নিতান্তই সখের বাজনা। পরিশ্রম করে রীতিমত অভ্যাস রাখা নয়। স্বভাবে সঙ্গীতের রসজ্ঞ। আবাল্য পারিবারিক পরিবেশে, সামাজিক পরিমণ্ডলে গান-বাজনার সমঝদার। নানা শাখায় বিস্তারিত নিজেদের বংশে এবং আত্মীয়-

স্বজন বন্ধুবান্ধবদের আসরে উচ্চ মানের সঙ্গীত শুনতে অভ্যস্ত। রাগসঙ্গীত তাঁর অন্তরে মিশেছে নিত্য শ্রুতির ফলে। সেকালের এই ধরনের পরিবারে যেমন জীবনচর্যার অঙ্গ ছিল সঙ্গীতের আসর। সংস্কৃতির একটি অংশ। দেব বংশেও বরাবর কলাবৎদের আদর; সেই আবহে মানুষ অসীমকৃষ্ণ। প্রপিতামহ রাজকৃষ্ণের আমলেও রাগ-সঙ্গীতের সমাদর হতে দেখা গেছে। রাজকৃষ্ণের পিতা নবকৃষ্ণের আসরে তো আখড়াই গান পত্তন করে যান কলুই সেন, নিধুবাবুর আত্মীয়।

নবকৃষ্ণের চেয়ে রাজকৃষ্ণের সঙ্গীতের সখ ছিল অনেক বেশি। অর্থ উপার্জনের জন্যে তো তাঁকে সময় দিতে হয়নি। কেবল বিলাস। মহাসৌখীন রাজকৃষ্ণের নানা বিলাসের মধ্যে একটি প্রধান হল, সঙ্গীত। তাঁর বিরাট জলসাঘর ছিল কলকাতার এক শ্রেষ্ঠ আসর। রাজকৃষ্ণের দোতলার সেই নাচঘর তাঁর নিজের সখে তৈরি। পিতা নবকৃষ্ণের জলসাঘর তো তিনি পাননি। শোভাবাজার ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণ অংশে ফটকের সামনেকার দোতলায় নবকৃষ্ণের আমলের সেই পুরনো নাচঘর। রবার্ট ক্লাইভ পর্যন্ত সেখানে এসেছেন বাই নাচ দেখতে।

আগেকার সেই জলসাঘর পেয়েছিলেন নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র গোপী-মোহন। রাজা রাধাকান্ত দেব সেই গোপীমোহনের পুত্র। যে বাড়িতে নবকৃষ্ণের আমলের ঠাকুরবাড়ি, আখড়াই গান আর নানা আসরের প্রকাণ্ড উঠোন, জলসাঘর, সেখান থেকেই রাজা রাধাকান্ত পরে সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ সংস্কৃত মহাকোষ 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন।

নবকৃষ্ণের জলসাঘর আর রাজকৃষ্ণের নাচঘর, পোষ্যপুত্র গোপী-মোহন আর নিজ পুত্র রাজকৃষ্ণের বৃত্তান্ত এই—

তার অনেক বছর আগে রবার্ট ক্লাইভের মুন্সী নবকৃষ্ণ দেব ভাগ্য ফিরিয়েছেন পলাশীর যুদ্ধে। প্রাসাদোপম অট্টালিকা, ঠাকুরবাড়ি,

জলসাঘর ইত্যাদি শোভাবাজারে করেছেন। মহারাজাও হয়েছেন। কিন্তু পুত্র পাননি সাতটি বিবাহ করেও। অগত্যা ভ্রাতুষ্পুত্র গোপী-মোহনকে দত্তক নিলেন। কিন্তু তার ক'বছর পরে, নবকৃষ্ণের পঞ্চাশ বছর বয়েসে পুত্র রাজকৃষ্ণের জন্ম হল (১৮৮২ সালে)।

রাজকৃষ্ণের পনের বছর বয়েসে পরলোকে গেলেন নবকৃষ্ণ। যথাকালে তাঁর বিপুল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে সুপ্রীম কোর্টে মামলা বাধল। পুত্র রাজকৃষ্ণ ও পোষ্যপুত্র গোপীমোহন দুই বিরুদ্ধ পক্ষ। শেষ পর্যন্ত নবকৃষ্ণের বিষয়-আশয় দুজনের মধ্যে ভাগ হল। রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট নামে পরিচিত পথের দুধারের সব গৃহসম্পত্তিই করেছিলেন তিনি। সেই রাস্তার উত্তরাংশের স্থাবর সম্পত্তি পেলেন গোপীমোহন। আর দক্ষিণাংশের অধিকারী হলেন রাজকৃষ্ণ। তখন নবকৃষ্ণের নাচঘর গোপীমোহনের ভাগে পড়তে, নিজের অংশে নতুন জলসাঘর তৈরি করলেন রাজা রাজকৃষ্ণ। নাচে গানে সে নাচঘর তিনি মুখর রেখে দিতেন।

রাজকৃষ্ণের আট পুত্রের চতুর্থ হলেন অপূর্বকৃষ্ণ। সেই নাচঘর অপূর্বকৃষ্ণের পুত্র (উপেন্দ্রকৃষ্ণ) পৌত্রাদি (অসীমকৃষ্ণ) ক্রমে বর্তায়। কিন্তু সে পর্যায়ের দোতলায় তা আর জলসাঘর নেই। অংশীভূত পারিবারিক গৃহস্থালির রূপ হয়েছে তার। দোতলায় রাজকৃষ্ণের বিরাট নাচঘর কালের গতিকে অন্দর মহলের কটি কক্ষে পরিণত। নাচঘরের একাংশ তখন অসীমকৃষ্ণের গৃহ-গত

কিন্তু বংশের ধারায় সঙ্গীতের অনুরাগ ও অনুষ্ঠান একেবারে অন্তর্ধান করেনি। তাই অসীমকৃষ্ণের জলসাঘর নেমে এসেছে এক-তলার বৈঠকখানায়। নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের দক্ষিণে সেই দেউড়ির বাঁ দিকের বৈঠকখানায় অসীমকৃষ্ণের হিসেবে মাঝে মাঝে আসর বসে। সামাজিক মজলিসী মানুষ তিনি। অমায়িক সদালাপী বিদ্বান, তাঁর আকর্ষণে আসেন গায়ক, গুণী, রসিক বিদগ্ধ, বন্ধুবান্ধব সেই ৮ সংখ্যক নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের বৈঠকে।

গায়ক বিহারীলাল বসু আর নট-নাট্যকার নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসুকে অসীমকৃষ্ণের আসরে বেশি দেখা যায়। সুকণ্ঠ টপ্পাগায়ক বিহারীলাল একদিকে টপ্পাচার্য মহেশ ওস্তাদের শিষ্য। আরেক দিকে মহা সরস বাক্-চতুর। সদা-সপ্রতিভ রসিকতার জন্যে বিহারী-লালের নাম হয়েছিল 'জ্যাঠাবিহারী'।

একদিন পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরপ্রাসাদে বিহারী এসেছেন। মজলিসে তখন মহারাজা যতীন্দ্রমোহনও আছেন বন্ধুবান্ধব পারিষদবর্গ নিয়ে। তরুণ বিহারীলালের মুখে বাক্‌চাতুর্যের খই ফুটছে।

খানিক শুনে যতীন্দ্রমোহন মন্তব্য করলেন, 'ছোকরা দেখছি এঁচোড়ে পাকা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। কিন্তু কোয়ায় মিষ্টি।' তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন জ্যাঠাবিহারী।

'বাঃ বাঃ' বলে রসিকতাটি যতীন্দ্রমোহন উপভোগ করলেন। তারিফ জানালেন বিহারীকে।

সেই জ্যাঠাবিহারী অসীমকৃষ্ণের আসর গানে গানে রস পরিবেশনে জীবন্ত করে রাখতেন। তাঁর সঙ্গে যেদিন এসে যোগ দিতেন রসরাজ অমৃতলাল, সেদিন সোনায় সোহাগা। একেকদিন গান-বাজনাতেও জমজমাট হয়ে উঠত মজলিস।

সে আসরে হাস্যপরিহাস ছিল সংক্রামক এবং সকলেরই সরল মনে উপভোগ্য। এমন কি, রসরাজ অমৃতলাল যখন অসীমকৃষ্ণকেও নিয়ে কৌতুক রহস্য করতেন, তিনি সহাস্যে যোগ দিতেন। তাঁকে পরিহাসে বিজল্পিত করে অমৃতলাল একটি প্রহসন লেখেন 'রাজা বাহাদুর' নামে। স্টার থিয়েটারে সেটি অভিনীত হয় এবং অমৃতলাল তা দেখবার জন্যে অসীমকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণও করেন। নিজেকে নিয়েই সে সব হাস্য রসিকতা দেখে অসীমকৃষ্ণ হাসতে হাসতে অমৃতলালকে বলেন, 'বাঃ, বেশ লিখেছেন তো।'···

সেই অসীমকৃষ্ণের ছিল পরিণত সঙ্গীতজ্ঞান। আর নানা শ্রেষ্ঠ

কলাবৎ-কলাবতীদের শোনা অভিজ্ঞ কান। বিভিন্ন উচ্চ মানের আসরে লব্ধ অভিজ্ঞতা। তাঁর স্বীকৃতি কিরণময়ীর সঙ্গীতগুণের একটি যথার্থ পরিচিতি মনে করা যায়।

কিরণময়ীর গান যে অসীমকৃষ্ণ শোনেন তা বিশ শতকের একেবারে প্রথম দিকে। তখনকার গান-বাজনা হত বিশিষ্ট ঘরোয়া আসরে। কিন্তু সেখানেও বাইজীদের গান সচরাচর শোনা যেত না। গৃহাসরে তখনো জাতে ওঠেননি বাইজীরা। কলাবৎরাও বাইজীদের সঙ্গে একাসরে অনুষ্ঠানে ইচ্ছুক হতেন না। ১৯২৮ সালের 'লালচাঁদ উৎসব' পর্যন্ত তা-ই ছিল সাধারণ রেওয়াজ, যদিও ব্যতিক্রম থাকতে পারে। আর গৃহাসরে বাইজীর অনুষ্ঠান হত বিবাহ ইত্যাদি শুভ উৎসবে।

সাধারণত বাইজীদের নাচ-গানের আসর হত গৃহপতির বাগান-বাড়িতে। তাঁর বাসস্থল থেকে দূরে। 'বাগানবাড়ি' কথাটিরও একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। এমন কি, আরো কয়েক যুগ আগে রামমোহন রায়ের মাণিকতলার বাগানবাড়িও তার ব্যতিক্রম নয়, যেখানে নৃত্যগীতের আসর হত নিকি বাইজী প্রমুখার।

কিরণময়ীও তেমনি শ্রেণীর এক গায়িকা। অবশ্য তাঁর যথার্থ পরিচয় শুধু গায়িকা হিসেবে নয়। বাইজী বললেই সঠিক হয়। অর্থাৎ একাধারে গায়িকা এবং নর্তকী। কিন্তু নৃত্যের জন্যে তেমন খ্যাতি ছিল না কিরণময়ীর। গানের জন্যেই তিনি প্রসিদ্ধা।

বাগানবাড়ি ভিন্ন ক'টি মাত্র গৃহাসরে বাইজীদের মুজরো হয়েছে। যেমন, জোড়াসাঁকোর দুনিয়ালাল শীলের ভবনে। সে আসরে কিরণময়ীও মুজরো করেছেন।

তারাপ্রসাদ ঘোষের আসরেও গান শুনিয়েছেন কিরণময়ী। তখনকার অতি-তরুণ গায়ক অনাথনাথ বসু সেখানে একদিন কিরণ-ময়ীকে দেখেছিলেন। তাঁর গানও শুনেছিলেন। কিরণময়ীর কণ্ঠে অনাথনাথ সেদিন শোনেন উৎকৃষ্ট টপ্পা ও খেয়াল।

অসীমকৃষ্ণের কিশোর পুত্র হারীতকৃষ্ণ যে তারাপ্রসাদের গৃহে কিরণময়ীকে দেখেছিলেন সেকথা তাঁর পরিণত বয়সেও মনে ছিল।

'কিরণময়ীকে দেখতে কি রকম?'

এ প্রশ্নের উত্তরে মাথা একদিকে কাৎ করে হারীতকৃষ্ণ জানান, 'আবছা মনে পড়ে—তবে সুন্দরী।'

কৈশোরের স্মৃতিচারণে হারীতকৃষ্ণ এমনিভাবে ধরিয়ে দেন কিরণময়ীর সূত্র।

আরেক বিবরণে কিরণময়ীর কথা জানা যায়। তাঁর সঙ্গীত-জীবনের কিছু পরিচয়। তাঁর গাওয়া কোন কোন গানের উল্লেখ। কি কি রাগ তিনি বেশি গাইতেন, সে প্রসঙ্গ। কিরণময়ীর ব্যক্তি-জীবনের কোন তথ্য নয়, শুধু তাঁর গানের কথা। আর তাঁর ওস্তাদের নাম।

তা ছাড়া, তাঁর ভগিনী সুরমার কথাও এই বিবরণীতে পাওয়া গেছে। কিরণময়ীর সঙ্গীতজীবনের সহযোগিনী সহোদরা সুরমা। কখনো কখনো তাঁদের গান হত দ্বৈতকণ্ঠে। স-দাপটে তাঁরা খেয়াল গাইতেন। হারীতকৃষ্ণ যখন কিরণময়ীকে দেখেন, প্রায় তখনকার কথা এসব। কিরণময়ীর সে সময় একটি আসরের মুজরো ছিল একশ টাকা।

এই সূত্র থেকে আরো জানতে পারা যায় কিরণময়ী ও সুরমার রীতিমত সঙ্গীত শিক্ষার কথা। খেয়াল ও টপ্পার ভাল তালিম তাঁরা দুজনেই পেয়েছিলেন। তাঁদের ওস্তাদ হলেন রামকুমার মিশ্র। বারাণসীর বিখ্যাত প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার একজন দিক্‌পাল গুণী তিনি। বাংলায় সুপরিচিত ওস্তাদ লছ্‌মীপ্রসাদের পিতা রামকুমার মিশ্র। কলকাতায় ক'বছর বাস করে রামকুমার একটি কৃতী বাঙালী শিষ্যমণ্ডলী গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের নাম পরিচয় পাওয়া যাবে 'ওস্তাদের ওস্তাদ' অধ্যায়ে। এখানে কেবল বলা যায়, কিরণময়ী ও সুরমাও রামকুমার মিশ্রের শিষ্যা।

এমনি কিছু সংবাদ দেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। রামকুমার বংশীয়দের সঙ্গে তখনকার বলরাম দে স্ট্রীট নিবাসী এই সঙ্গীতজ্ঞ চট্টোপাধ্যায় পরিবারের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ এবং বংশানুক্রমিক। মিশ্র ঘরের এক বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়। তিনি বেহালা-শিল্পী, গায়ক এবং নানা স্বরলিপি গ্রন্থের রচয়িতা—বিখ্যাত খেয়াল-টপ্পাগুণী সাতকড়ি মালাকরের প্রথম সঙ্গীত-শিক্ষকও। তাঁর পুত্র হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—বেহালাবাদক, টপ্পা ইত্যাদি রীতির গায়ক, হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীর দীর্ঘকালের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তাঁর সাঙ্গীতিক বংশপরিচয়ও উল্লেখ করবার যোগ্য। কলকাতার আদি ধ্রুপদাচার্য এবং স্বনামধন্য যদু ভট্টের সঙ্গীতগুরু গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের (এক পৌত্র তুলসীদাস) অন্যতম প্রপৌত্র হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

হরিপদও অতি তরুণ বয়সে কিরণময়ীকে দেখেছিলেন। তাঁর গানও শুনেছিলেন কয়েকবার। চট্টোপাধ্যায় পরিবারে গান-বাজনার যে পরিশীলিত পরিবেশ ছিল তার মধ্যে তিনি বাল্যকাল থেকে বর্ধিত। নানা নামী গায়ক-গায়িকার সঙ্গীত হরিপদ অল্প বয়স থেকেই শুনতে পান। তাঁদের চার পুরুষের সঙ্গীতগুণী পরিবার। সেই সূত্রে কিরণময়ীর গানও শুনেছিলেন তিনি। তা ছাড়া, তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিশ্রবংশের রামকুমারের শিষ্যা থাকায় কিরণময়ীর সঙ্গীতজীবনের কথাও কিছু জানতেন। কিরণময়ীর গান প্রথম জীবনে শুনলেও মনে রেখেছিলেন শেষজীবন পর্যন্ত।

বৃদ্ধ বয়সেও চট্টোপাধ্যায় মশায় কিরণময়ীর সঙ্গীতের স্মরণ মনন কিছু করতে পারতেন। ব্যক্তি লুপ্ত হয়ে তখন জেগে ওঠে শুধু গান। শিল্পীর রূপ ধরে—সঙ্গীত। দূরশ্রুত সুর-নির্ঝরিণী তাঁর স্মৃতিধারায় ভেসে আসে। কিরণময়ীর কবেকার গাওয়া এক একটি গানের কলি। কোন কোন গানের শুধু স্থায়ীটি। কোনটির কেবল মুখড়ার ক'টি কথা। বাকি সব বিস্মরণের অতলে বিলীন হয়ে গেছে।

স্মরণের পারাবার থেকে তিনি প্রতিধ্বনি করেন কিরণময়ীর কোন কোন গানের রেশ।

চক্ষু মুদ্রিত করে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় গেয়ে শোনান—

কিরণময়ীর সুঘরাই কানাড়ার বাণী :

'মধুমাতি কোয়েলা বোলে রে

পাপিয়া নাচত মুরল বোলত…'

হাম্বীরের একটি বিলম্বিত লয়ের ঝুমরা :

'চামেলি ফুলি চম্পা

গুলাল গোঁধেলা বেলা…'

আর একখানি ঝুমরা তালেরই কেদারা। কিন্তু এটি বাংলা গান :

'চাঁদিনী রাতে…'

তার অবশিষ্ট অংশ বিস্মৃতির তলে। যেমন সেই বিলম্বিত আড়া-য় বেহাগের গানখানি—

'কমন ঢঙ্ তেরা…' আর মনে পড়ে না।

পারিবারিক সূত্রে এবং পরম্পরায় জানা কিরণময়ীর আর একটি সঙ্গীত-তথ্য দেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। তা হল, কিরণময়ীর ক'টি প্রিয় রাগের নাম, যা তিনি বেশি গাইতেন—দরবারী কানাড়া, সুঘরাই কানাড়া, বেহাগ, হাম্বীর, কেদারা, মালকোশ, দেশ, শঙ্করা।

কিরণময়ী সম্পর্কে অন্য সূত্রেও পাওয়া যায় আরো কিছু সমাচার। এখানে চিত্র স্পষ্টতর। স্বল্পকালের হলেও এখানে তিনি নিকটবর্তিনী। গায়িকা রূপে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁর সঙ্গে সহোদরা সুরমাকেও দেখা যায়।

'সুরি কিরণ'—ঘনিষ্ঠ মহলে আর অনেক গানের আসরেও কিরণময়ী সুরমার নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হত এইভাবে।

দুই ভগিনীই তখনকার নাম-করা বাইজী। সেরা গায়িকাদের মধ্যে কিরণময়ী সুরমার নাম। বিদগ্ধ সঙ্গীত সমাজে আর বাইজী-

বিলাসী সম্প্রদায়েও তাঁদের প্রতিষ্ঠা। আর বাইজীদের যেমন দস্তুর, নর্তকীও দুজনে। কথক নৃত্যের শিল্পী। ভালো মুজরো করেন সঙ্গীত-বিলাসীদের বাগানবাড়িতে। কিংবা নিজেদের বাড়ির আসরে—সেখানেও মুজরো দিয়ে পরিচিত শ্রোতারা নাচগান দেখতে শুনতে আসেন।

উত্তর কলকাতায় চন্দ্রমাধব সুর লেনের একটি বাড়িতে তখন দুই ভগিনীর একত্র বসতি। সেই গলিরই ১৭ সংখ্যক গৃহে থাকেন নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধা গায়িকা-অভিনেত্রী তিনকড়ি।

কিরণময়ী সুরমার বাস একটি সাধারণ চেহারার ছোট দোতলা বাড়িতে। দুজনেই তখন পরিণতযৌবনা। কয়েক বছর সে বাড়িটির বাসিন্দা ছিলেন তাঁরা।

তার একতলার বড় ঘরখানিতে তাঁদের নাচ-গানের আসর বসে। প্রথম প্রহর রাতে। নিশীথিনী সচকিত হয়ে ওঠে মঞ্জীর নিক্কণে, তবলার বোলে, সারঙ্গের সুরলহরে। কখনো তনুচ্ছন্দে, কখনো কলকণ্ঠ গানে।

কিরণময়ী সুরমার গানের সঙ্গে ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর আর তাঁর ভাই কালী ওস্তাদ অনেক সময় সারঙ্গ বাজান। জমাটি আসরে থাকেন বিশেষ বিশেষ শ্রোতা। তাঁরা এক এক রাতের মুজরো দেন। তাঁদের সঙ্গে থাকেন অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব। শুধু তাঁরাই সে রাতের সঙ্গীতাসরে অতিথি। কিরণময়ী সুরমার নাচ দেখে গান শুনে আমোদিত হয়ে আসেন।...

দোতলায় বাস করেন দুই সহোদরা। সেখান থেকে বাইরেও মুজরো করতে যান।

সে পর্বে বড়বাজারের একজন প্রায়ই আসতেন তাঁদের একতলার ঘরোয়া আসরে। আহীর পদবীক এক ধনাঢ্য বিলাসী। ঘনিষ্ঠ দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে বেশ রাত পর্যন্ত আসরে থাকেন। কখনো একজন

কখনো দুজন বাইজীর নৃত্যগীতের খরিদ্দার। সমঝদার কিনা কে জানে। কিন্তু পেশাদার বাইজীদের সে বাছবিচার করা চলে না।

ভগিনী হলেও দুজনকে দেখতে শুনতে অন্যরকম। চেহারায় আর গানের গলায়ও সাদৃশ্য নেই।

কিরণময়ী বেশ রূপসী। গাত্রবর্ণ নাকি 'কাঁচা সোনার মতন।' মুখশ্রীও ভাল। মাঝারি দীর্ঘ আকার। গঠনে তন্বীও বলা যায়।

কিন্তু সুরমা দীর্ঘাকৃতি, তেমনি প্রস্থেও। বিশাল শরীরের জন্যে তাঁকে দেখায় কিরণময়ীর চেয়ে বড়। কিন্তু বয়সে সুরমা কনিষ্ঠা।

গৌরীশঙ্কর ওস্তাদ তাঁকে পর্বতের সঙ্গে উপমা দিয়ে ঠাট্টা করেন। আসরে সুরমাকে আসতে দেখে জনান্তিকে সহাস্যে বলেন,

'সামনে পাহাড় চল্‌তি হুয়ি। হম্ লোক সব পেড় হ্যায়।'

নিজে গৌরীশঙ্কর খুবই ছোটখাটো মানুষ। মাথায় পাগড়ি চড়িয়েও তাঁকে মোটেই উঁচু দেখাত না। তাই নিজের তুলনাতেই পাহাড় বলতেন সুরমাকে।

কিন্তু সেই সুরমারই নাচে আশ্চর্য নৈপুণ্য। এমন সাবলীল সুপটু তাঁর নৃত্যভঙ্গিমা যে দেহের বিরাটত্ব দর্শকদের চোখে লাগত না। সেই শরীরকেই এমন যথেচ্ছ ছন্দিত দোলায়িত করতেন যেন কত লঘুভার।

নৃত্যের জন্যেই সুরমার বেশি নামডাক।

কিন্তু গায়িকা হিসেবে কিরণময়ী অনেক উচ্চাঙ্গের। খেয়াল টপ্পায় বাংলার এক শ্রেষ্ঠা গায়িকা তিনি। তবে কণ্ঠ খুব দরাজ নয়, ঈষৎ ঝিম্ আওয়াজ। কিন্তু অতি সুরেলা আর সুমিষ্ট। গানে যেমন কলাবতী কিরণময়ী, নৃত্যে সুরমার মতন পটুত্ব তাঁর ছিল না।

দুজনের গানের গলাতেও ছিল তারতম্য।

সুরমার কণ্ঠ রীতিমত বলশালী। অনেক দূর পর্যন্ত তাঁর গান শোনা যেত। এমন দরাজ আওয়াজ বেশি ছিল না গায়িকাদের মধ্যে।

সুরমা কিরণময়ীর বিষয়ে এই সব কথা গায়িকা ইন্দুবালার স্পষ্ট মনে আছে। তাঁদের দেখবার ষাট বছর পরেও। কারণ অনেকদিন খুব কাছে থেকে দুজনকে তিনি দেখেছিলেন।

যে বয়েসে ইন্দুবালা গহর জানকে দেখেন, সেই তাঁর প্রথম গান শেখার সময়ে। ওস্তাদ গৌরীশঙ্করের কাছে তখন তিনি গান শিখতেন। ওস্তাদজীর বাড়িতে জন্মাষ্টমীর আসরে যেমন পরিচয় হয় গহর জানের সঙ্গে, তেমনি গৌরীশঙ্করই ইন্দুবালাকে নিয়ে কিরণময়ী সুরমার বাড়িতেও গিয়েছিলেন। সেই চন্দ্রমাধব সুর লেনে। ইন্দুবালার বয়স তখন হবে পনের-ষোল বছর।

গৌরীশঙ্কর কিরণময়ীর কাছে নিয়ে গিয়ে ইন্দুবালাকে পরিচয় করিয়ে দেন, নিজের ছাত্রী বলে।

তারপর থেকে ওস্তাদের সঙ্গে ইন্দুবালা অনেকবার সে-বাড়িতে গেছেন। কিরণময়ী সুরমার গান শুনেছেন কাছে বসে। তাঁদের নাচ দেখেছেন। তাঁদের আসরেও দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তখন।

হারীতকৃষ্ণ দেব আর হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের পরে ইন্দুবালা কিরণময়ী সুরমাকে দেখেছিলেন। সেই আহীর পদবীধারীর জন্যে আসর করতেন তখন দুই ভগিনী।

সেকালের বাইজীদের যেমন রীতি ছিল, সুরমা কিরণ ফরমায়েস মতন সব রকম গান শোনাতেন। খেয়াল টপ্পা ঠুংরি দাদরা কাজরী লাউনী চৈতী ইত্যাদি। তবে আসরে খেয়াল টপ্পার জন্যেই বিশেষ নাম ছিল কিরণময়ীর।

সুরমা আবার সেই সঙ্গে কীর্তন গানের জন্যেও বিখ্যাত ছিলেন। ভালভাবে তাঁর কীর্তন শেখা আর আলাদা আসরে গাইতেন কীর্তন। খেয়াল টপ্পার চেয়ে তাঁর কীর্তন গানেই নামডাক ছিল বেশি। আর মুজরোও হত খুব। সেজন্যে খোল করতাল হারমোনিয়ম বাজাবার লোক নিয়ে সুরমার আলাদা দল ছিল। শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে তাঁর কীর্তন হত গৃহস্থ বাড়িতে।

শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যে যুগে কীর্তন গায়িকাদের গৃহস্থঘরে ,যাবার চলন ছিল। পেশাদার গায়িকা বা বাইজীরা সচরাচর স্থান পেতেন না ঘরোয়া আসরে। কিন্তু কীর্তন গানের জন্যে তাঁদেরই ছাড়পত্র ছিল, এ এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বিবাহাদি শুভ অনুষ্ঠানেও বাইজীদের প্রতি বিধিনিষেধ শিথিল করা হত, সেকথাও আগে উল্লেখ করা হয়েছে।...

জানা গেছে, কিরণময়ী কীর্তন গাইতেন না সুরমার মতন।

তা ছাড়া, সঙ্গীতের অন্য সব বিষয়ে সহযোগিতা ছিল ভগিনীদের মধ্যে। রাগসঙ্গীত দুজনে যেমন রামকুমার মিশ্রের কাছে একসঙ্গে শিখেছেন, তেমনি আসরেও কখনো কখনো দ্বৈতকণ্ঠে তাঁদের গান হত।

কিরণময়ী সুরমার দ্বৈত খেয়াল গান শুনেছিলেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলতেন, 'বেশ দাপটের সঙ্গে তাঁরা খেয়াল গাইতেন।'

বাঙালী বাইজীদের মধ্যে তাঁদের দুজনের স্থানের কথা এখানে উল্লেখ করে রাখা যায়। পশ্চিমা বাইদের তুলনায় বাঙালী নর্তকী-গায়িকাদের সংখ্যা অল্প। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হলেন পাঁচজন। যাদুমণি, কিরণময়ী, সুরমা, শ্বেতাঙ্গিনী ও কৃষ্ণভামিনী। শুধু নর্তকী হিসেবে শ্রেষ্ঠা ছিলেন লীলা, কিন্তু তাঁর গানের জন্যে পরিচিতি ছিল না।

ওই পাঁচজন শ্রেষ্ঠা বাঙালী গায়িকা-নর্তকীর মধ্যে জ্যেষ্ঠা যাদুমণি। তাঁর পরে কিরণময়ী ও সুরমা। তাঁদের দুজনের চেয়ে কনিষ্ঠা শ্বেতাঙ্গিনী। কৃষ্ণভামিনী সর্বকনিষ্ঠা। তাঁদের সঙ্গীতজীবন অনেকখানি সমকালীন। কেবল যাদুমণির সূচনাকালের প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে কিরণময়ী সুরমা শ্বেতাঙ্গিনী ও কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গীত-জীবনের আরম্ভ। কারণ যাদুমণি, বাংলায় পেশাদারী নাট্যমঞ্চের আদি যুগে, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের বিখ্যাত গীতিনাট্য 'সতী

কি কলঙ্কিনী'তে রাধিকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হতেন এবং গান গাইতেন, ১৮৭৪ সালে। যাদুমণির মৃত্যুও হয় পাঁচজনের মধ্যে সবচেয়ে আগে। ১৯১৮ সালে, তাঁর পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি বছর বয়েসে।

বাঙালী বাইজীরা প্রায়শ উত্তর কলকাতা নিবাসিনী। পশ্চিমাগত নর্তকী গায়িকারা যেমন মধ্য কলকাতার অধিবাসিনী। উত্তর কলকাতায় বাঙালী বাইজীদের জন্যে চিহ্নিত চিৎপুরের এলাকা। আর শিমলার কোন কোন অঞ্চল ও নিকটবর্তী ফুলবাগান পল্লী (পরবর্তীকালের হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব লেন)।

কিরণময়ী সুরমাও অনেকদিন থাকেন শিমলা অঞ্চলে। তার আগে তাঁদের বাস ছিল হাওড়ায়, গঙ্গার ওপারে।

তা তাঁদের একেবারে প্রথম জীবন, শৈশব কালের কথা। আরো দূরে—আবছায়ার জগৎ।

সেই আলো-আঁধারির মধ্যে থেকে প্রথম পর্বের কটি ছিন্ন জীবন-সূত্র লোকলোচনে এসে পড়েছিল।

এখানে ধরে দেয়া হল তার অসম্পূর্ণ কাহিনী।

একশ' বছরেরও কিছু বেশিদিন আগেকার কথা। কিরণময়ী-জীবননাট্যের প্রথম পট উন্মোচনের কাল।

স্থান—কলকাতার অদূরে, ভাগীরথীর পশ্চিম পারে হাওড়া অঞ্চল। তারই একটি বসতি।

হাওড়ার যে অঞ্চলে শিবপুর সেটি রাগসঙ্গীতের একটি ভাল কেন্দ্র ছিল তখনকার কালে। বেশ কয়েকজন কৃতী বাঙালী গায়ক বাদক সেখান থেকে সঙ্গীতজগতে দেখা দেন। বিশেষ করে শিবপুরের সঙ্গীতজ্ঞ দত্ত পরিবার। সে বাড়ির বরদাচরণ দত্ত পাখোয়াজী হিসেবে আর তাঁর কনিষ্ঠ নিকুঞ্জবিহারী দত্ত ধ্রুপদ ও টপ্পা গানে সুপরিচিত হয়েছিলেন পরে। স্বনামধন্য গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তী মাঝে মাঝেই আসতেন সে বাড়ির গানের আসরে। নিকুঞ্জবিহারী ধ্রুপদ গানে তাঁর শিষ্য। অঘোরনাথের গানের সঙ্গে বরদাচরণ পাখোয়াজ সঙ্গত

করতেন। সেসব কিছু পরবর্তীকালের কথা। উনিশ শতকের শেষদিকের শিবপুরে।

কিরণময়ীর জন্মস্থান অবশ্য শিবপুর নয়। তবে তার অদূরে। যেখান থেকে রামকৃষ্ণপুর আরম্ভ হয়েছে, তারই কাছে। কিরণ সুরমার জন্ম ও প্রথম জীবনের বাসস্থল। এ কাহিনীরও সূচনা সেইখান থেকে।

আঠারো শতকের সত্তরের দশক তখন আরম্ভ হয়েছে মাত্র।

পরবর্তী কালের হাওড়া শহর ক্রমে বৃহত্তর কলকাতার যেন অংশ হয়ে যায়। নিরন্তর সংযোগে অবিচ্ছিন্ন, নানাপ্রকার কর্মচঞ্চল সূত্রে নিয়ত গতায়াতে একান্ত ঘনিষ্ঠ। কিন্তু শতাব্দ আগেকার অবস্থা ছিল অন্যরকমের। রাজধানীর সঙ্গে শিথিল, মন্থর যোগাযোগ শুধু সাময়িক সেতুটির মধ্যস্থতায়। তাও বড় জাহাজ যাতায়াতের সময় সেতু ঘুরিয়ে নিয়ে গঙ্গাবক্ষ উন্মুক্ত করে দেয়া হত। দিন রাত্রের সেসব সময় হাওড়া বিযুক্ত হয়ে যেত কলকাতা থেকে।...

সেকালের সেই জনকোলাহলহীন ধীর পরিবেশের হাওড়া অঞ্চল। তার একটি নিভৃত এলাকার বিশেষ ধরনের লোকালয়। সেটিও রামকৃষ্ণপুরে ধরা হয়।

এদিকে গঙ্গার পশ্চিম তারের কাছে হাওড়া ময়দান। সেই ময়দানের পাশ দিয়ে গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোডের শেষাংশ শিবপুরের দিকে যাত্রা করেছে। শিবপুর পৌছবার খানিক আগে সে পথের নিকটেই আছে একটি বাজার। সচরাচর শোনা যায় না এমন তার নাম। সন্ধ্যাবাজার।

নামের সঙ্গতি রেখেই সারাদিন সেখানে বিকিকিনি বন্ধ। অপরাহ্ণ পর্যন্ত তার সব পণ্য-ঘরে রুদ্ধ দ্বার। তারপর যখন দিনের আলো নিভে আসে, সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালানো হয়, তখন তার বেসাতি আরম্ভ। আবার পরের দিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার লেন-দেন স্থগিত। পুনরায় সন্ধ্যায় সেখানে কেনা-বেচা শুরু হয়ে যায়। এমনিভাবে দিনের পর দিন বা সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা।

তাই লোকমুখেই নামকরণ হয়ে গেছে—সন্ধ্যাবাজার।

শতবর্ষ আগেকার সেই সন্ধ্যাবাজারের পাশেই একটি জনবসতি। এলাকাটি বড় তেমন নয়। সঙ্কীর্ণ ক'টি গলির মধ্যে সারি সারি ছোট মাঝারি ঘর। তার বেশির ভাগই টালির কিংবা খোলার চাল। পাকা বাড়ির সংখ্যা নগণ্য। সবই একতল।

সেই সব ইট আর মাটির দেয়ালের মধ্যে বিস্তৃত আরেক রকমের সন্ধ্যাবাজার। যদিও তেমন কোন নাম তার নেই। সাধারণের পক্ষেও নিবিদ্ধ সেই পল্লী। সেখানকার বাসিন্দারা পসারিণী। নিজেদের শরীর নিয়েই তাদের বেসাতি। লণ্ঠনের আলোয় সেই পসরা সাজিয়ে খরিদ্দারের জন্যে তারা অপেক্ষা করে। পণ্যাঙ্গনা।

সেও এক অনামিকা সন্ধ্যাবাজার।

পাশের বাজারের মতন এখানেও দিনান্তের পর বিকিকিনি আরম্ভ। কিন্তু সন্ধ্যাবাজারের মতন প্রথম রাতে তার শেষ নয়। সে হাটের সময় সারারাত্রি জীবন্ত। রজনীর আঁধার যোগেই সাড়া পাওয়া যায় এখানকার জীবদের। তখনই ক্রয়-বিক্রয়ের পালা। বাইরে থেকে কারা আসে। কিন্তু আর তাদের সন্ধান মেলে না প্রভাতের আলো ফুটলে। তারপর এলাকাটি ঘুমন্ত থাকে সারা দিনমান। তখন এখানে নিশীথিনীর নিস্তব্ধতা।

দিনের শেষে আবার সবাই জেগে ওঠে। দেখা যায় নিবাসিনীদের। প্রদীপের কিংবা লণ্ঠনের শিখায়, কোন কোন ঘরের দরজায়। কোথাও অন্দরে। ওরই মধ্যে কিছু স্তরভেদ। তারই জন্যে মূল্যের হেরফের। সেসব জানে এখানকার আগন্তুকরা।

কোন কোন বারবধূদের ধরনধারণে থাকে তারতম্য। বেশির ভাগই সাময়িক নর্ম সহচরী। কিন্তু কেউ তারই মধ্যে কোন সংসর্গে ঘরণী থেকে যায়। সমাজের বাইরে আরেক সমাজ তাদের। নিজেদের নিয়মে গড়ে তোলা নকল পরিবার।

সেই নামহীনা সন্ধ্যাবাজারের এমনি এক সংসারের কথা।

তার চার কন্যা তখন নিতান্ত শিশু ও বালিকা বয়সী। এ কাহিনীর যখন সূত্রপাত, তার আগেই তাদের দুর্ভাগিনী জননীর মৃত্যু হয়েছে। নাবালিকাদের বর্ষীয়সী দিদিমা আছে কর্ত্রী হয়ে।

চারজনের নাম যথাক্রমে—হিরন্ময়ী, জ্যোতির্ময়ী, কিরণময়ী, সুরমা।

শেষের দুজনকে শিশু বলা যায়। প্রথম দুজনও নিতান্ত বালিকা। পরিবেশের মালিন্য তাদের স্পর্শ করতে তখনো অনেক বিলম্ব।

সেই চারটি পঙ্কজিনীর কাছেই আলোকের দাক্ষিণ্য এসেছিল। অভাবিত ভাগ্যক্রমে।

সন্ধ্যাবাজারের অনতিদূরে একটি লোকালয় ছিল, যার চরিত্র একেবারে বিপরীত। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের বাস এখানে।

হাওড়া শিবপুর সরণির বাঁ দিকে সন্ধ্যাবাজার। সেই পথ থেকে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে খুরুট রোড। সেই দিকে গৃহস্থ অঞ্চলটি। যেখানে পরে স্থাপিত হয় কালীবাবুর বাজার, তার পেছনে। কিরণময়ীদের কালে কিন্তু কালীবাবুর বাজারের অস্তিত্ব ছিল না।

এলাকাটি মল্লিক ফটক নামেও পরিচিত। রামকৃষ্ণপুরেরও আরম্ভ বলা যায়। সেখান থেকেই মুক্তির আহ্বান এসেছিল কিরণময়ীদের অন্ধ জীবনে।

মল্লিক ফটকে তখন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের আবাস ছিল। সেকালের সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষাজগতের এক বহুবিখ্যাত মনীষী কৃষ্ণকমল। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, রিপণের অধ্যক্ষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' সম্পাদক,বঙ্কিমযুগের তীক্ষ্ণধী 'পসিটিভিস্ট্' পণ্ডিত তিনি। সুরসিক দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যাঁর সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসুকে পত্রে লেখেন, 'কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক। He is a terrible fellow. He knows

how to write and how to fight and how to slight all things divine.'

এহেন কৃষ্ণকমল সেসময় বাস করতেন থুরুট রোডের মল্লিক ফটক অঞ্চলে। সন্ধ্যাবাজার থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ তাঁর সেই বাড়ি। তাঁদের পৈতৃক নিবাস অবশ্য ছিল কলকাতার বাডন স্ট্রীটে, মিনার্ভা থিয়েটারের কাছে। ভট্টাচার্য বংশ পণ্ডিতের বৃত্তিধারী। কৃষ্ণকমলের পিতা ছিলেন বীডন স্ট্রীটের একটি পরিবারের গুরু। তাঁরাই মল্লিক ফটকে নিজেদের একটি বাড়ি নামমাত্র মূল্যে গুরুপুত্র কৃষ্ণকমলকে বিক্রয় করেন। সেই সূত্রে তাঁর রামকৃষ্ণপুরে বাস। বীডন স্ট্রীটের কাছেই, বীডন গার্ডেনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, কৃষ্ণকমলের আর একটি বাসাও ছিল অবশ্য।

মহা তেজস্বী কৃষ্ণকমল যা ন্যায় বিবেচনা করতেন, তা থেকে কারুর কথায় নিবৃত্ত হতেন না। তা ছাড়া, সংস্কার করবার একটি বলিষ্ঠ সত্তা ছিল তাঁর চরিত্রে।

কিভাবে জানা যায় না, সন্ধ্যাবাজারের সেই নাবালিকাদের কৃষ্ণকমলের গৃহে আসা-যাওয়া হত। তাঁর রামকৃষ্ণপুরের বাড়িতে। যখন হিরন্ময়ী জ্যোতির্ময়ীরা নেহাৎ বালিকা আর কিরণময়ী সুরমার শৈশব অবস্থা।

কৃষ্ণকমলের পত্নীও অতি দয়াবতী। পরদুঃখকাতর অন্তর তাঁর। বালিকাদের প্রতি তিনি সদয় স্নেহ-ব্যবহার করতেন। তাঁদের স্বামী-স্ত্রী দুজনের কাছেই সাহায্য পেত মাতৃহারা চার ভগিনী।

তাদের দুর্ভবিষ্যতের কথা হয়ত কৃষ্ণকমল ভেবেছিলেন। ক্লিষ্ট বোধ করেছিলেন এই নিষ্পাপ বালিকাদের গ্লানিলিপ্ত জীবনের চিন্তায়। শুধু অর্থ সাহায্য নয়, তাদের পরম মঙ্গলের জন্যেও তিনি সচেষ্ট হন। মুক্তির উপায় স্থির করেন তাদের জন্যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করে। আলোকপ্রাপ্ত হয়ে যেন তাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠা হতে পারে। সামাজিক মর্যাদা পায়।

কৃষ্ণকমল উদ্‌যোগী হয়ে হিরন্ময়ী ও জ্যোতির্ময়ীকে প্রবেশ করিয়ে দিলেন কলকাতার সুখ্যাত বালিকা বিদ্যালয়ে। সে দুজনের বিদ্যালয়ে যাবার বয়েস হয়েছিল।

তবে তাদের দিদিমার আদৌ মত ও ইচ্ছা ছিল না এমন অদ্ভুত ব্যবস্থায়। হিরন্ময়ী জ্যোতির্ময়ীও বংশের পেশা নিয়ে থাকবে, উপার্জন করবে, এই লক্ষ্যই তার ছিল। কিন্তু কৃষ্ণকমল ও তাঁর পত্নী তাদের সাহায্য করতেন বলে বাধা দিতে পারেনি তাদের অভিভাবিকা।

ভট্টাচার্য মশায়ের উদ্‌যোগে হিরন্ময়ী জ্যোতির্ময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা পেতে থাকে। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল তাদের সম্পর্কে। বিদ্যা-শিক্ষার আলো থেকে যেমন বঞ্চিত হয়নি তারা, তেমনি পঙ্কিল ব্যবসাতেও ফিরে যায়নি। নিষ্কলুষ সংসারজীবন পেয়েছিল হিরন্ময়ী জ্যোতির্ময়ী।

ক্রমে কনিষ্ঠা দুজনও বড় হল। অর্থাৎ কিরণময়ী ও সুরমা। তখন তাদেরও বিদ্যালয়ে দিতে চাইলেন কৃষ্ণকমল। কিন্তু এবার ব্যর্থ হলেন।

ঘোর আপত্তি করলে তাদের দিদিমা। এ দুজনকে কিছুতেই বিদ্যালয়ে ভর্তি করা চলবে না। কিরণ সুরমার ভাল গলা। এরা শিখবে নাচ গান। অনেক টাকা রোজগার করবে। এদের আখের নষ্ট করা চলবে না লেখাপড়া শিখিয়ে।

কৃষ্ণকমলের কোন সদ্‌যুক্তি সে রমণী কানে নিলে না। গান নাচ শেখার বন্দোবস্ত করলে কিরণময়ী সুরমার জন্যে। তারা বাইজী হবে। সেই সন্ধ্যাবাজারের অন্য পসারিণীদের মতন ঠিক নয়। নর্তকী গায়িকা হিসেবে উপার্জন করবে অনেক বেশি টাকা।

তখন বিরক্ত হয়ে কৃষ্ণকমল তাদের সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। সে সময় তিনি রামকৃষ্ণপুরে অনেক সময় থাকতেন না। বেশির ভাগ সময় বাস করতেন কলকাতায়। বীডন গার্ডেনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের সেই বাসায়।

তাই তিনি জানতে পারলেন না একটি কথা। কিরণ সুরমা তাঁর পরিবারের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হল না, নাচ গান শেখা আরম্ভ করবার পরেও। কৃষ্ণকমলের পত্নী তুই বোনকে সাহায্য করতে লাগলেন। মাতৃহীনা বালিকা তুটির প্রতি তাঁর মায়া দয়া থাকে পূর্ববৎ।...

এইভাবে সেই অনামী সন্ধ্যাবাজারে তুটি সঙ্গীতশিল্পীর জন্ম হল। পঙ্ক পল্বল থেকে যেমন দেখা দেয় কমলিনী।

কিরণময়ী সুরমার সঙ্গীত-শিক্ষা প্রথম থেকেই রামকুমার মিশ্রের তুল্য কলাবতের কাছে হতে পারেনি, মনে হয়। হাওড়া অঞ্চলের কারুর কাছে হয়ত প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল তুজনের। সে বিবরণ জানা যায়নি।

কেমন করে সেই অবজ্ঞাত পরিবেশের মধ্যে থেকে তুটি প্রতিভার বিকাশ হল, কিভাবে রামকুমার মিশ্রের কাছে তালিমের ব্যবস্থা হল, কখন থেকে কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে কিরণময়ী সুরমার প্রতিষ্ঠার সূচনা—এসব সংবাদ অপ্রাপ্য।...

রামকৃষ্ণপুর থেকে পরে তুজনে কলকাতাবাসিনী হয়েছিলেন। সেখানে সব সময় যে তুজনে একত্র যাপন করতেন, তাও নয়। কয়েক বছর তাঁরা থাকেন শিমলা অঞ্চলে।

অন্য এক সময়ে তাঁদের বাস ছিল শ্যামবাজার স্ট্রীট ও শ্যামপুকুর স্ট্রীটের সংযোগস্থলে। সে বাড়ি নাকি সুরমার নিজস্ব। তা হল তাঁদের পরিণত বয়সের কথা। বোধ হয়, তুজনের মধ্যে সুরমার উপার্জন অধিক হয়েছিল। কিংবা সঞ্চয় করা সম্ভব হয় বেশি।

সুরমার ব্যক্তিগত কথা আর কিছু জানা যায় না।

কিন্তু কিরণময়ীর প্রসঙ্গ আরো কিছু আছে। সে সংবাদেও বিচিত্রতা। তু রকমের আশ্রয় লাভ। উত্তরপুরুষের কথা। গ্রামোফোন রেকর্ড করা না-করার কথা, ইত্যাদি।

সবই অবশ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বিভিন্ন জীবন পর্যায়ের ক'টি খণ্ডিত

চিত্র। কিন্তু তারই মধ্যে কি বিপরীত অনুষঙ্গ। জীবনপাত্রে অভাবিত আস্বাদ। যত পুলক, তত গ্লানি। যত সাধের তত বিতৃষ্ণার। যত সুন্দর তত ভয়ঙ্করের শিকার।

কিরণ-কাহিনীর তেমনি দুটি দ্বিমুখী পরিচ্ছেদ।

তার কোন্‌টি আগে, কোন্‌টি পরে, তাও জানা যায়নি। আর তাঁর জীবনের অন্যান্য পর্বের মতন এ বিবরণও সম্পূর্ণ নয়। তবু যতটুকু জানা যায়—প্রকাশ্য।

প্রথমে সুখের প্রসঙ্গ। অন্য বৃত্তান্তটি—উপসংহারে।

তখনকার অতি সচ্ছল সঙ্গীতবিলাসী সমাজের অনেক আসরে তো কিরণময়ীর গান হয়েছিল। তাঁদের কজনের সঙ্গে সে গায়িকার জানাশোনা থেকে ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায় বেশ। বিশেষ দুজনের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হয়।

শুধু সঙ্গীতগুণে নয়। নটীর সর্বাংশে মুগ্ধ হন তাঁরা। তাঁকে একান্ত করে রাখতে চান।

কিরণময়ী তাঁদের সুখের সঙ্গিনা থাকেন দুই বিভিন্ন পর্যায়ে।

তাঁরা দুজনেই উত্তর কলকাতা নিবাসী এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয়। স্বনামেও তাঁদের পরিচিতি ছিল। আর একথাও গোপন ছিল না যে কিরণময়ী তাঁদের আশ্রিতা—অবশ্যই পৃথক সময়ে।

প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে নটীর সংস্রব দীর্ঘদিনের। কিরণময়ীর জীবনের হয়ত শ্রেষ্ঠ অধ্যায় সেটি।

সঙ্গীতপ্রেমী এবং কিরণময়ীর দরদী সেই ব্যক্তি তাঁকে নিয়ে দ্বিতায় সংসার রচনা করেছিলেন। তাঁর আপন গৃহের বাইরে। সেকালে যেমন সামাজিক থেকে আলাদা রাখার রেওয়াজ ছিল অসামাজিক ব্যাপার। অনেক পরে সব যে একাকার হয়ে যায়, তেমন নয়।

গায়িকা তাঁর দ্বিতীয় গৃহে ঘরণী হয়ে থাকেন।

এক প্রকার পারিবারিক জীবন বলা যায় কিরণময়ীর দিকে।

কারণ এ পর্বে দুটি সন্তানের জননী হয়েছিলেন। এক কন্যা ও একটি পুত্র।

এই অধ্যায়ের কাল ক'বছরের তা জানা যায়নি। তবে বড় হয়েছিল কিরণময়ীর ছেলে মেয়ে। তাদের পরবর্তী জীবনকথাও হারায়নি।

এ ধরনের কন্যা সেকালে সাধারণত স্থান পেত না সমাজে। 'পিতা' যত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হোন, মেয়েটিকে অনেক সময়েই চলে যেতে হত কলঙ্কিত ধারায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও। সমাজের দ্বার তাদের সামনে রুদ্ধ থাকত।

কিন্তু এই মেয়েটির এবং কিরণময়ীরও এ বিষয়ে ভাগ্য ভাল। কন্যা সামাজিক গৃহবধূর মর্যাদা লাভ করেছিল। জীবনে সুখী হয়েছিল গ্লানিমাহীন পরিবেশে।

আর কিরণময়ীর পুত্রের জীবন পরবর্তীকালে অভাবিত দিকে চলে যায়। নটীর সন্তান হন সংসারবিরাগী তরুণ সন্ন্যাসী। তাঁর সন্ন্যাস নেয়াতেই শেষ কথা নয়। অধ্যাত্ম চিন্তার সঙ্গে তিনি উদ্বুদ্ধ হন মানবসেবার আদর্শে। আর ভারতের এক বিশ্ববিখ্যাত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সেবাব্রতী রূপে নিজেকে উৎসর্গ করেন। চরিতার্থ হয় সে জীবনের পরম লক্ষ্য। কিয়ণময়ীরও তা এক মহা পুণ্য মনে করা যায়।

তবে সেসব অনেক পরের কথা। নটীজীবনের সেই অধ্যায়ে ছেদ পড়বার অনেক বছর পরে।

কবে কিভাবে কিরণময়ীর সে পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হয়েছিল, তাও অজ্ঞাত।

সে দ্বিতীয় পুরুষের প্রসঙ্গ বলবার আগে কিরণময়ীর সঙ্গীত-জীবনের কথা আরেকটু আছে।

তাঁর গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রসঙ্গ।

কিরণময়ীর শ্রুতি স্মৃতি থেকে জানা যায় যে, তাঁর গানের রেকর্ডও

হয়েছিল। গ্রামোফোনের সেই প্রথম যুগে। যেকালে মানদাসুন্দরী পান্নাময়ী কৃষ্ণভামিনীদের অনেক গানের রেকর্ড বেরুত।

গায়িকা বলে কিরণময়ীর যে প্রসিদ্ধি ছিল সেজন্যে তাঁরও গান রেকর্ড হওয়া খুবই সম্ভব।

কিন্তু কিরণময়ীর রেকর্ড সম্পর্কে কোন তথ্য নির্ভরযোগ্যভাবে জানা যায়নি। অর্থাৎ কোন্ কোন্ রেকর্ড বা কি কি গান। শুধু শোনা গিয়েছিল তাঁর গান রেকর্ড হওয়ার কথা।

অথচ কোন রেকর্ডে কিংবা রেকর্ড-সঙ্গীতের কোন পুস্তকেও 'কিরণময়ী' নাম মুদ্রিত দেখা যায় না। সেজন্যে তাঁর গ্রামোফোনে গান গাওয়ার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই।

তবে রেকর্ড জগতে খ্যাতি ছিল এক গায়িকার 'মিস কিরণ' নামে।

পুরনো আমলের গ্রামোফোন রেকর্ডের তালিকায় 'মিস কিরণ' নামিকা গীতশিল্পীর প্রায় ২০টি গানের কথা জানা যায়। প্রায় সমস্তই রাগে গাওয়া বাংলা গান। একটি কেবল হিন্দী—'হাঁ সৈঁইয়া জাগরে পাপিহারা মারে রে।' বাংলা গানগুলি ঝিঁঝিট খাম্বাজ, তোড়ি, ভৈরবী, খাম্বাজ, হাম্বীর মিশ্র (দাদরা), ঝিঁঝিট মিশ্র (ঠুংরি তাল), সিন্ধু ভৈরবী (দাদরা), সাহানা ইত্যাদি রাগে গাওয়া। সব রেকর্ডই দুষ্প্রাপ্য কিংবা অপ্রাপ্য।

সেই রেকর্ড-গায়িকা মিস কিরণই কি কিরণময়ী?

এ প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর দেয়া কঠিন। কারণ পক্ষে বা বিপক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ কিছু নেই। তবে দুই নামের অধিকারিণী অভিন্ন হবার সম্ভাবনা।

আর, রেকর্ড সঙ্গীতের সংকলন 'বীণার ঝঙ্কার' বইখানিতে একটি ছবি দেখা যায়। এক বালিকা ও তার জননীর বয়সী এক নারীর ফটো। চিত্রটির নাম—শ্রীমতী গিরিবালা ও কিরণ। কোন্ নামটি কার তা চিহ্নিত করা নেই। তবে 'শ্রীমতী গিরিবালা' জ্যেষ্ঠা

হওয়াই সম্ভব, কারণ তাঁকে বলা হয়েছে 'শ্রীমতী'। শুধু 'কিরণ' তাহলে ছোট মেয়েটি।

কিন্তু এ ছবির কিরণ সে কিরণময়ী হতে পারে না। তার এত অল্প বয়সে শ্রীমতী গিরিবালা নাম্নী কারো সঙ্গে সেই সন্ধ্যাবাজারের পরিবেশে ফটো তোলা হয় কি করে? কিরণময়ী ওই বয়সে মাতৃ-হীনা এবং গিরিবালা নামে কেউ নেই তাঁর বাল্যজীবনে। গিরিবালা ছবিতে মেয়েটির দিদিমা বয়সী হলেও কথা ছিল, কিন্তু তা নয়।

তবে যে মিস কিরণের অতগুলি গানের রেকর্ড হয়েছিল, তিনিই কি কিরণময়ী?

মৌন মহাকালের অনন্ত পটে নানা জিজ্ঞাসার মতন এ ধ্বনিও কেবল প্রতিধ্বনি করে। হয়ত উত্তর মিলবে কোন ভবিষ্যৎকালে।...

অতীতের তীর থেকে কিরণময়ীর সেই দ্বিতীয় পুরুষের কাহিনীটি ভেসে আসে। এটি আরো সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ এবং প্রথমটির পরে বা আগে, তাও অজানা।

একটি রাতের ছিন্ন খিন্ন ঘটনা মাত্র। পতিতা জীবনের সেই মর্মন্তুদ চিত্র দর্শন না করলেই সুখের হত।

কিরণময়ী এ পর্বের কাল আনুমানিক ১৯০৫-৬ সাল।

নটীজীবনের এই পুরুষ তখনকার কলকাতার এক প্রসিদ্ধ পরি-বারের দৌহিত্র সন্তান। আবার পূর্ববঙ্গীয় জনৈক রাজা খেতাবধারী জমিদারের পোষ্যপুত্র। যতদূর জানা যায়, ঘটনার সময় তিনি প্রায় প্রৌঢ়।

সেকালের নাগর সমাজের একটি উজ্জ্বল প্রতিভূ বলা চলে তাঁকে। তাঁর জীবনচর্যায় ভোগবিলাসিতারই প্রাধান্য। আর তার মুখ্য উপকরণ—বাগানবাড়ি, তার জীবন্ত শোভা ও আনুষঙ্গিক। মূল গৃহে যথারীতি সংসারের সঙ্গে এক আলমারী পুস্তকও সাজানো থাকে। কিন্তু তা তাঁর চুনট করা চাদর পাঞ্জাবি ধুতির মতন নেহাৎই সাজ। বিদ্যাচর্চার অবসর কোথায়?

তিনি কিরণময়ীর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তাঁর বেলগাছিয়ার বাগান-বাড়িতে। শ্যামবাজারের মোড় থেকে পশ্চিমের রাস্তায় খাল আছে। সেটি পার হয়ে আরো পশ্চিমে খানিক পরেই ডানদিকে সেই নাতিক্ষুদ্র বাগানবাড়ি। সেখানেই কিরণময়ীর সঙ্গে তখন তাঁর অধিষ্ঠান।

প্রায়ই সন্ধ্যের পর কর্তা আসেন। গান-বাজনার আসরও হয় রাত পর্যন্ত। মাঝে মাঝেই তিনি রাত্রিবাস করে যান। এমনিভাবে চলেছিল কিছুদিন।...

তাঁর নিজেরই সন্দেহ হয় অথবা কোন পরিচারক সংবাদ দেয়, জানা যায়নি সেকথা।

তবে এক সন্ধ্যায় হঠাৎ উপস্থিত হয়ে তিনি দেখেন—নিভৃত কক্ষে কিরণময়ীর সঙ্গে এক প্রণয়ী !

স্বত্বাধিকারীর মূর্তি দেখেই গুপ্ত প্রেমিক অন্তর্ধান করলে। নিশাকরের মতনই অদৃশ্য হল নিশীথ অন্ধকারে। কিরণময়ীও রোহিণীর তুল্য গ্রেপ্তার হলেন।

তবে রোহিণীর চেয়ে তিনি ভাগ্যবতী। কারণ এই গোবিন্দ-লালের পিস্তল ছিল না।

কিন্তু চাবুক ছিল বেশ মজবুত। হয়ত ফিটনের ঘোড়ার উপযোগী। বীরপুঙ্গব বিষম রেগে উঠে সেই চাবুক হাতে নিলেন। তারপর কষিয়ে শায়েস্তা করতে লাগলেন দুশ্চরিত্রাকে।

বলীর হুঙ্কার আর অবলার আর্তনাদে সে রাত্রি হয়ত বিদার্ণ হয়েছিল। খানিকক্ষণ চাবুক চালাবার পর ফটক পর্যন্ত এনে পথে বার করে দিলেন কিরণময়ীকে। রক্ষিতার চরিত্রচ্যুতি কি করে বরদাস্ত করেন।...

অবশ্য কিরণময়ী বিতাড়িতা হবার পর তিনি শূন্য রাখেননি বাগানবাড়ি। অচিরেই আরেক জনকে নিয়ে পূর্ণ করেছিলেন, জানা গেছে।

কিন্তু জানা যায়নি কষাঘাতে জর্জরিতা হতভাগিনীর পরবর্তী অবস্থা। পাপের লাঞ্ছনা তো চূড়ান্ত হয়েছিল। নিস্তার পাননি এত নামী কলাবতী হয়েও। তবে সেই নির্জন রজনীতে একাকিনী কোথায় গিয়েছিলেন বেলগাছিয়া থেকে, কার কৃপার পাত্রী হয়েছিলেন, কিংবা কেমন করে তাঁর পুনর্বাসন হয়েছিল শিল্পীজীবনে—সে সব বৃত্তান্তই লুপ্ত।...

কেবল কালের চরণরেখার এক ধারে কিরণময়ী নামের স্মৃতিটুকু রয়ে গেছে। সঙ্গীতজগতের শ্রুতিতে জীবন্ত পরিচিতি মাত্র। আর সেই সঙ্গে কখানি অসনাক্ত রেকর্ড সঙ্গীত।...

পাপ-প্রায়শ্চিত্তের ঊর্ধ্বে ছায়াতে-আলোতে ঘেরা সুর ছন্দের স্মৃতির প্রতিমা।

আঁধারের বক্ষপটে কিরণের ললিত লেখা!

ঠুংরির কণ্ঠ

মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মৌজুদ্দিন নিজে থেকেই কথাটা বলেছিলেন। ঠুংরি গানে কলকাতায় তখন তাঁর কি নামডাক। তিনিই বললেন এমন অযাচিতভাবে। এত বড় আসরে। যেখানে ঠুংরির রাজা গণপৎ রাও স্বয়ং উপস্থিত।

সেখানে কণ্ঠমাধুর্যের এতখানি তারিফ মৌজুদ্দিনের নিজের মুখে। আর তাঁর সেই দুর্লভ প্রস্তাব···

মহীন্দ্রনাথ থেকে সমবেত সকলেই তার মর্যাদা বা মূল্য বুঝলেন বৈকি। আর মহীন্দ্রনাথের সেই বিনীত উত্তর···তাও কী উপযুক্ত। গুরুভক্তি, আত্মসম্মান, ধ্রুপদে অবিচল নিষ্ঠা—সবই তার মধ্যে ফুটে উঠেছিল।

সেদিন বাগবাজারের আসরে। গঙ্গার ধারে ডাক্তার মন্মথনাথের সেই বাড়ি। তার দোতলার জলসাঘরে সেদিনকার মতন কত সুন্দর সব অনুষ্ঠান সেখানে হয়ে গেছে। কলকাতার এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাসর সেটি।

গঙ্গার পূর্ব দিকেই সে বাড়ি। বাগবাজার স্ট্রীট এসে মিলেছে চিৎপুর রোডে। তারই পশ্চিমে সরু রাস্তা ক'টি বাড়ি পার হয়ে গঙ্গার ধারে শেষ হয়েছে।

তার ডান দিকেই মন্মথনাথের সেই গৃহ। সামনে অন্নপূর্ণা ঘাট। গঙ্গার ঘাটের আশেপাশে নানা আকারের নৌকো ডিঙি ভাসছে। তাদের বেশির ভাগই খড়ের স্তূপে বোঝাই। দূরে কাছে গঙ্গায় উঁচু হয়ে রয়েছে কালো কালো বয়া, বড় বড় কচ্ছপের পিঠের মতন। মাঝে মাঝে উত্তর-দক্ষিণে স্টীমার চলে, লঞ্চ যায় ঢেউয়ের ফেনা উঠিয়ে।

তাদের চলার ধাক্কায় ছোট ছোট ঢেউয়ের পর ঢেউ তীরের দিকে আসে। ছলাৎছল শব্দে ভেঙে ভেঙে পড়ে গঙ্গার ধারে ধারে। খড়ের নৌকো, ডিঙ্গি সব দুলে দুলে ওঠে।

এ বাড়ির পশ্চিম দিক জুড়ে অবারিত দৃশ্য। অবাধ আকাশের নীচে উন্মুক্ত নদীর শোভা দেখা যায় এই জলসাঘর থেকে।

কিছু উত্তরেই কাশীপুর। তারপর গঙ্গা একটি বিরাট বাঁকে উত্তর-পশ্চিমে ঘুরে গেছে। বাগবাজারের এখান থেকে গঙ্গার সেই বিস্তার যেন একটি বিশাল চিত্রপট।

সন্ধ্যের পর থেকেই জলসাঘরের অঞ্চলটি নির্জন হয়ে যায়। নিরিবিলি পরিবেশে গান-বাজনার চমৎকার স্থান। প্রতি শনিবার দিনের শেষে সঙ্গীতের আসর বসে মন্মথনাথের সেই দোতলার জলসাঘরে।

পঁয়ষট্টি-সত্তর বছর আগেকার কথা সে সব।

অন্নপূর্ণা ঘাটের পুব দিকে সেই বাড়ি, গঙ্গার ধারের রাস্তায়। কিন্তু তার ঠিকানা ১১।১ বাগবাজার স্ট্রীট।

গৃহস্বামীর সাদর আহ্বানে সেখানে নানা গুণীর সমাগম হয়ে থাকে। কারণ তিনি নিজেও সঙ্গীতজগতেরই একজন।

ডাক্তার মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়। দ্বৈত পরিচয় তাঁর। চক্ষু-চিকিৎসক ডক্টর এম, এন. চ্যাটার্জী নামেই তিনি বেশী পরিচিত, প্রসিদ্ধ। রীতিমত লব্ধপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু এহ বাহ্য। অন্তরে তিনি সুরলোকনিবাসী। সঙ্গীতপ্রেমী শুধু নন, সঙ্গীতের সেবকও।

তাঁর বাড়িতে যেমন আসর হত, তিনি নিজেও তেমনি যন্ত্র-সঙ্গীতের চর্চা করতেন। সেতার বাজাতেন নিয়মিত। অনেকদিন যাবৎ ওস্তাদদের কাছে শিখেছেন। অবশ্য বৃত্তির অবসরে যতখানি সম্ভব। আর গুণীজন সঙ্গ করেন বাড়ির আসরে, কখনো অন্য অনুষ্ঠানে।

কিন্তু সাধারণ্যে মন্মথনাথের সঙ্গীতজীবন প্রায় অপরিচিত।

সেখানে তিনি চিকিৎসকরূপেই বিখ্যাত। চক্ষুরোগের চিকিৎসায় তাঁর যেমন সাফল্য, তেমনি উপার্জন। আপার সার্কুলার রোডে বিশাল বাসভবন তাঁর। সেখানেও অনেক সঙ্গীতাসর তিনি করেছেন। পরের যুগে সেটি রূপান্তরিত হয় চিকিৎসালয়ে, তাঁরই ইচ্ছানুসারে মন্মথনাথেরই স্মৃতিতে ও গচ্ছিত অর্থে। স্থাপিত হয় ডঃ এম. এন. চ্যাটার্জী আই হসপিটাল। এখনকার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে, রাজাবাজারের উত্তরে। গৃহস্বামীর জীবিতকালে সেখানে সঙ্গীতের কত বড় বড় আসর হয়ে গেছে।

মন্মথনাথের পরিণত বয়সে বেশি আসর হত তাঁর সেই গঙ্গার ধারের বাড়িতে। আর সার্কুলার রোডের বাড়িতে, মধ্যবয়সে।

তখন তাঁর কর্মব্যস্ত চিকিৎসক জীবন। কিন্তু সঙ্গীত-চর্চায় বিরতি ছিল না কোনদিন। পেশার মধ্যেও দৈনিক সঙ্গীত সেবার জন্যে কিছু অবসর করে নিতেন। তা সম্ভব হত সঙ্গীতে অতিশয় প্রীতি ও নিষ্ঠার জন্যে। সচরাচর সে নির্দিষ্ট সময় রাখতেন প্রথম সকালে। হাতের প্রিয় সেতার যন্ত্রটি নিয়ে তখন একান্তে বসতেন। আর বাজনার পরে দৈনন্দিন কাজ আরম্ভ করতেন যথানিয়মে।

সেতারে তাঁর আকর্ষণ আর চর্চা অল্প বয়স থেকেই। ছাত্র-জীবনে লেখাপড়াও রীতিমতন করতেন। তার অবকাশে চলত সেতার বাজনা। একাধিক ওস্তাদের শিক্ষা পেয়েছেন। পরে বিশেষ করে শেখেন বাংলার বিখ্যাত সেতার-সুরবাহার গুণী জিতেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্যের কাছে।

সেই সেতার বাজনা বরাবর রেখে দেন, অতি সফল ডাক্তার হবার পরেও। আর বাড়িতে গান-বাজনার আসরও নিয়মিত করেছেন। সাধারণত শনিবার, কখনো অন্যদিনে। বাগবাজারের বাড়িতে কিংবা আপার সার্কুলার রোডের আবাসে।

মন্মথনাথের প্রথম জীবনের কথাও এখানে বলে নেওয়া যায়। তাঁর জন্ম হয় ১৮৬৬ সালে।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি বাড়িতে সঙ্গীতের পরিবেশ পেয়েছিলেন। তাঁরা তিন ভাই সঙ্গীতচর্চার মধ্যে বড় হয়েছেন। সার্কুলার রোডের আগে তাঁদের বাস ছিল জোড়াসাঁকো অঞ্চলে। সে বাড়িতে আবাল্য তাঁরা সঙ্গীতের আসর দেখেছেন। আর, একেক ভাই আরম্ভ করেছেন এক একটি যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চা।

জ্যেষ্ঠ নারায়ণচন্দ্র পাখোয়াজ বাজাতেন। ঠনঠনিয়ার বিখ্যাত পাখোয়াজী নিমাই চক্রবর্তীর শিষ্য তিনি। (কলকাতা তথা বাংলার সবচেয়ে বড় পাখোয়াজ ঘরানার পত্তন করেন যে শ্রীরাম চক্রবর্তী তাঁরই ভাই নিমাইচন্দ্র। শ্রীরামের কাছেই নিমাইয়ের পাখোয়াজ শেখা, তাঁদের আর এক ভাই নিতাইয়ের মতন।)

মন্মথনাথের কনিষ্ঠ জিতেন্দ্রনাথ বাজাতেন এসরাজ। ইকবুল খাঁ নামে একজন এস্রাজী ছিলেন কলকাতায়, তাঁর ছাত্র জিতেন্দ্রনাথ।

তখন থেকেই মন্মথনাথ ওস্তাদদের কাছে সেতার শিখতেন, বাজাতেন। তবে তাঁর সে ওস্তাদদের নাম জানা যায়নি। পরের জীবনে তিনি হন সেতারী-সুরবাহারী জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের শিষ্য।

তিন ভাই যে অল্প বয়স থেকে বাজনা আরম্ভ করেন তা তাঁদের পিতার জন্যে, বলা যায়। তাঁদের সঙ্গীতপ্রীতি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। পিতা নিজে সঙ্গীতচর্চা না করলেও গান-বাজনা অত্যন্ত ভালবাসতেন। পশ্চিমাঞ্চলে বাস করবার সময় থেকেই তাঁর এই অনুরাগ। সেখানে বড় বড় আসর যেমন শুনতেন, তেমনি নিজের বাড়িতেও আসর বসাতেন। সেখানে গুণীদের গান-বাজনা হত নিয়মিত।

তাঁদের আদি নিবাস হাওড়া জেলার বলুহাটিতে। মন্মথনাথের পিতা রাজকর্মচারীর কাজে পশ্চিমে বাস করতে যান। সেখানকার কলাবৎদের সঙ্গ লাভে তিনি হন সঙ্গীতপ্রিয় এবং সঙ্গীতের পৃষ্ঠ-পোষক।

তারপর তাঁদের কলকাতায় বাস আরম্ভ হয়। প্রথমে জোড়াসাঁকোর বলরাম দে স্ট্রীটে। বাড়িতে নিয়মিত আসরের পত্তন সেখানেই। তাঁর তিন পুত্রের প্রথম জীবন সেই বাড়িতে কেটেছিল। তিনজনের বাজনাও আরম্ভ বলরাম দে স্ট্রীটের বাড়িটিতে।

তারপর তাঁদের মধ্যে মহা কৃতী হলেন মন্মথনাথ। সার্কুলার রোডে ওই বাসভবন করলেন। সেখানেও বসত সঙ্গীতের আসর। আর নিজের সেতার চর্চাও বন্ধ হয়নি। তারও পরে তাঁর বাগবাজারের বাড়ি। অন্নপূর্ণা ঘাটের সামনে সেই দোতলার জলসাঘরে প্রতি শনিবারের আসর।

সেসব মন্মথনাথের পরিণত বয়সের কথা। তখন তাঁর বাগবাজারের আসর কলকাতার সঙ্গীতসমাজে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। বাঙালী শ্রেষ্ঠ গায়ক-বাদকদের অনেকেই আসতেন সেই শনিবারের আসরে। অনেক রাত পর্যন্ত গান-বাজনা হত। পশ্চিমের যেসব কলাবৎ কলকাতায় সমাগত হতেন, মাঝে মাঝে তাঁদেরও কেউ কেউ যোগ দিতেন এ আসরে।

এখানে যাঁদের গান-বাজনা বেশি শোনা যেত, তাঁদের মধ্যে ধ্রুপদী মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তাঁর গুরু এবং ধ্রুপদ খেয়ালের আচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, একাধারে ধ্রুপদী-পাখোয়াজী সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু), সেতার-সুরবাহারী জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সুরবাহারী হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, পাখোয়াজী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পাখোয়াজী দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতির নাম করা যায়। মন্মথনাথ নিজে সঙ্গীতচর্চা বজায় রেখেছিলেন বলে অনেক গুণীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর। এ আসরের সঙ্গে তাঁরা ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত ছিলেন।

তাঁদের মধ্যে ধ্রুপদ-গায়ক মহীন্দ্রনাথ ছিলেন আসরের পরিচালক। কোন্ গুণীকে কবে আনা হবে, প্রতি আসরের অনুষ্ঠান-সূচী কিরকম থাকবে, তাঁর কথা মতন সব স্থির হত। মন্মথনাথের

পরম আস্থাভাজন মহীন্দ্রনাথ ছিলেন এ আসরের প্রাণস্বরূপ। তাঁর নিজের গানও এখানে সবচেয়ে বেশিদিন হয়েছে।

সেদিনকার জলসাঘরে বিশিষ্ট গুণী সমাগম দেখা গেল। কলকাতার কজন নামী শিল্পী উপস্থিত। আর এসেছেন বিখ্যাত মৌজুদ্দিন খাঁ। বারাণসীর স্বনামধন্য খেয়াল ও ঠুংরির কলাবৎ। তাঁর ওস্তাদ, গোয়ালিয়রের ভারতপ্রসিদ্ধ গণপৎ রাওকেও আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে। শিষ্য মৌজুদ্দিনের গানের সঙ্গে তিনি সঙ্গত করবেন হারমোনিয়মে। ঠুংরির এক অনবদ্য সৃজনশীল গুণী গণপৎ রাও। কখনো ঠুংরি অঙ্গে হারমোনিয়ম বাজান। কখনো মৌজুদ্দিন প্রমুখ শিষ্যের গানে হারমোনিয়ম সঙ্গত করেন আসর মাতিয়ে। হারমোনিয়মের যাদুস্পর্শে দেখান ঠুংরির মনোহারিণী রূপ। সঙ্গীত-জগতে তিনি ভাইয়া সাহেব নামে সুপরিচিত।

এই আসরেও মৌজুদ্দিনের গানের সঙ্গে গণপৎ রাওয়ের বাজাবার কথা। শ্রোতারা বিশেষ করে তাঁদের গান বাজনা শুনতে এসেছেন। তাঁরা দুজনেই আসরের বিশিষ্ট অতিথি। বিশেষ ভাইয়া সাহেব। কারণ মৌজুদ্দিন তবু মাঝে মাঝেই কলকাতায় আসেন। থেকে যান বেশ কিছু দিন। এখানকার নানা বাইজী তাঁর কাছে তালিম নেন। কিন্তু গণপৎ রাও তো কলকাতায় বেশি আসেন না। এবার তাঁকে পাওয়া গেছে অনেকদিন পরে। শ্রোতাদের অনেকেই তাঁকে এ যাবৎ চাক্ষুষ করেননি। কারণ কয়েকটি নির্দিষ্ট আসর ভিন্ন দেখা যায় না ভাইয়া সাহেবকে। মন্মথনাথের আসরে সেই তাঁর প্রথম উপস্থিতি।

আসরে এবার গানের পালা। সাদর সম্ভাষণ, শিষ্টাচার, আপ্যায়ন, মুখশুদ্ধি ইত্যাদি শেষ হয়েছে।

আমন্ত্রিত প্রধান গায়ক মৌজুদ্দিনও আসরে হাজির। কিন্তু তিনি গাইবেন খেয়াল ঠুংরি। সুতরাং প্রথমে তাঁর গান হবে না। প্রচলিত রীতি অনুসারে আগে হবে ধ্রুপদের অনুষ্ঠান।

সুতরাং মহীন্দ্রনাথ আসরের উদ্‌বোধন করবেন। তখন তাঁর পরিণত গায়কজীবন। অতিশয় সুকণ্ঠ ধ্রুপদীরূপে বাংলার সঙ্গীত-সমাজে তিনি সম্মানিত। পশ্চিমাঞ্চলে তিনি কখনো যাননি। নচেৎ নাম করতেন সেখানেও। কলকাতার বাইরেও তিনি বিশেষ যেতেন না। এ শহরের সঙ্গীতপ্রিয় শ্রোতাদের কাছে নতুন করে দিতে হয় না তাঁর পরিচয়।

কিন্তু ওস্তাদ গণপৎ রাও কিংবা মৌজুদ্দিন কখনো তাঁর গান শোনেননি। তাঁর কথাও জানতেন কিনা সন্দেহ। তবে সেকালে বাঙালী ধ্রুপদীদের গানে মিষ্টত্বের জন্যে একটি সুনাম ছিল। তাঁরা হয়ত সেকথা শুনে থাকতে পারেন।

পাখোয়াজ নিয়ে বসলেন নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এমন খুশ মেজাজে জমিয়ে সঙ্গত করতে তাঁর বোধহয় জুড়ি নেই। এবার গান আরম্ভ করলেন মহীন্দ্রনাথ।

তানপুরার ভ্রমর গুঞ্জনের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠধ্বনিও বিস্তারিত হতে লাগল। ধীর গতিতে ভরিয়ে দিতে লাগল জলসাঘর।

গভীর-গম্ভীর রাগ দরবারী কানাড়া তিনি ধরেছিলেন। পদ্ধতিগত আলাপচারি করতে লাগলেন, গানের কলি আরম্ভ করবার আগে। ধ্রুপদের স্থাপত্য কারুতে রাগের হৃদয়স্পর্শী রূপ বিকশিত হতে লাগল।

সে সুর-কণ্ঠের প্রথম নিঃসারেই সচকিত হলেন মৌজুদ্দিন। কি সুরেলা গলা গায়কের। ক্রমেই তাঁর স্বর পরিধি, অলঙ্কারনৈপুণ্য, মীড় গমকের যত পরিচয় পেতে লাগলেন, ততই চমৎকৃত বোধ করলেন।

রাগের অবয়বের জন্যে যত নয়, আলাপের রীতিনীতির জন্যে যত নয়—এই বাঙালী ধ্রুপদীর আশ্চর্য কণ্ঠমাধুর্যে তিনি আকৃষ্ট

এমন কণ্ঠ সচরাচর শোনা যায় না তো!

মৌজুদ্দিন মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন।

সম্পূর্ণ আলাপচারির শেষে মহীন্দ্রনাথ গান ধরেছেন মধ্য লয়ে। তানসেনের সেই দরবারী কানাড়ার বন্দেশ—

প্রথম সমঝ আও রে বিদ্যা ধুন…

পাখোয়াজ কোলে নিয়ে এতক্ষণ বসেছিলেন পাখোয়াজী নগেন্দ্রনাথ। এবার তাঁর মিষ্টি হাতে বোল ফুটতে লাগল। তার মেঘমন্দ্র ধ্বনিতে জমিয়ে তুললেন চৌতালের ছন্দ।

সঙ্গত যোগে গান আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। স্থায়ী কলিতেই মহীন্দ্রনাথ আসর ভরিয়ে দিলেন সুরের মায়ায়—

প্রথম সমঝ আও রে বিদ্যা ধুন।
তব কী সে গুণিয়ন সংবাদ॥

গণপৎ রাও প্রমুখ শ্রোতাদের মধ্যে বিশেষ মুগ্ধ হলেন মৌজুদ্দিন। একাগ্র চিত্তে তিনি গায়কের অপূর্ব স্বরসম্পদ আস্বাদ করতে লাগলেন।

অন্তরা ও সঞ্চারীতে তানসেনের সঙ্গীততত্ত্বের বর্ণনা মহীন্দ্রনাথ মূর্ত করলেন অন্তরের আবেগে—

সপ্ত সুর তিন গ্রাম একইশ মূরছনা,
বাইশ শ্রুরত মেঁ
উনপঞ্চাশ কোটি তান সাধ বাদ॥
আরোহী অবরোহী অস্থাই সঞ্চাই,
ধরণ মুরণ তেঁ
ভলে বজাওয়ে রস সওয়াদ॥

অবশেষে উদাত্ত আভোগে তানসেনের দৃপ্ত ভণিতা মুখর হয়ে উঠল—

বাহি অঙ্গন তেঁ রিঝ মিঞা তানসেন,
চুপ করো হে মূঢ়
ক্যা ভয়ো বোল বিখাদ॥

মহীন্দ্রনাথের কি অসাধারণ জোয়ারিদার কণ্ঠ! যেন মত্ত মধুপ

গুঞ্জরণ করতে লাগল। গান শেষ হলেও দরবারীর স্বরব্যঞ্জনায় পূর্ণ হয়ে রইল আসরের বায়ুমণ্ডল। আর তার মধ্যে শ্রোতৃবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত সাধুবাদ ধ্বনিত হতে লাগল।

সবচেয়ে বেশি তারিফ করলেন মৌজুদ্দিন।

গায়ককে সঙ্গীতকণ্ঠের জন্যে বার বার সাবাস দিলেন তিনি।

তারপর একটি অনুরোধ জানালেন, 'বাবুজী, আপ্‌কা অ্যাইসা গলা। আপ্‌ ঠুম্‌রি গাহতা নেহি কেঁও? আমার কাছে কিছু ঠুম্‌রি নেবেন? আমি খুশি হয়ে দেব আপনাকে।'

মহীন্দ্রনাথ সৌজন্যের সঙ্গে মৌজুদ্দিনের প্রস্তাব শুনলেন।

কিন্তু খাঁ সাহেবের কাছে ঠুংরি গান নেওয়ার অর্থ তো ঠুংরি শেখা। অর্থাৎ লোকে বলবে মৌজুদ্দিনের শাগীরদ্‌। না না, তা হতে পারে না। গোঁসাইজী (রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী) ভিন্ন আর কাউকে গুরু বলে মানা যাবে না। তা ছাড়া ঠুংরি বড় লঘু চালের গান। ওতে মন ভরে না। ধ্রুপদেই পূর্ণ হয়ে আছে গানের সত্তা। অন্য কোন রীতির আর প্রয়োজন নেই।

এত কথা অবশ্য তিনি মৌজুদ্দিনকে বললেন না।

শুধু গোঁসাইজীর নাম করে অক্ষমতা জানালেন সবিনয়ে। আর অনুরোধ রক্ষা না করার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

'মাফ কিজিয়ে খাঁ সাব। গোঁসাইজী ছাড়া আর কাউকে আমি গুরু বলে মানতে পারব না।'

এই পর্বের পর সে রাত্রে মৌজুদ্দিনেরও গান হল: খেয়াল ঠুংরি। আর তাঁর ঠুংরি গানের সঙ্গে ভাইয়া সাহেবের হারমোনিয়ম বাজনা। তাঁদের সে আসর মাৎ করার বর্ণনা এখানে করবার দরকার নেই।

কারণ এ অধ্যায়ের নায়ক মহীন্দ্রনাথ। এখন তাঁর প্রসঙ্গ।

সেদিন মৌজুদ্দিন যে বলেছিলেন, তাঁর কণ্ঠ ঠুংরি গানের উপযোগী, সেকথা যথার্থ।

মহীন্দ্রনাথের সঙ্গীতকণ্ঠে যেমন দুর্লভ জোয়ারি তেমনি রমণীয়

মাদকতা ছিল। আশ্চর্য তার আকর্ষণশক্তি। ঠুংরি যেহেতু শৃঙ্গার-রসাত্মক সঙ্গীত, নায়িকা ভাবের গান, বিরহমিলনের আর্তিতে উদ্বেল, প্রণয়ের লীলামাধুরী ও মরমের প্রতপ্ত আকুতিতে পূর্ণ— সেজন্যে তাঁর কণ্ঠ পরমযোগ্য সত্যই। রাগ মিশ্রণের আলোছায়াময় সুষমা তাঁর কণ্ঠমাদকতায় বিলসিত, হৃদয়স্পর্শী হতে পারত।

কিন্তু সে রীতির গানচর্চায় কোনদিন আকৃষ্ট হননি মহীন্দ্রনাথ। আজীবন তিনি ধ্রুপদেরই সাধনায় একনিষ্ঠ ছিলেন। ধ্রুপদ সঙ্গীতের রীতিনীতি অলঙ্কারসম্পদেই সিদ্ধ এবং তৃপ্ত তিনি। ধ্রুপদ গানের শিল্পীরূপেই শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেছেন বিপুল পুলকে। তাঁর শিল্পীজীবনে অন্য কোন মাধ্যমের স্থান নেই। প্রয়োজনও নেই।

মৌজুদ্দিনের এসব জানবার কথা নয়। তবে ধ্রুপদের সংবাদ যারা রাখতেন, তাঁদের জানা ছিল একথা। তখনকার সঙ্গীতসমাজে বাংলার ধ্রুপদের অর্থাৎ বাঙালীর কণ্ঠে পরিবেশিত ধ্রুপদ সঙ্গীতের যে সুনাম ছিল তা মহীন্দ্রনাথতুল্য গুণীদের জন্যেই।

তাঁর উদাত্ত অথচ মাধুর্যময় স্বরে জোয়ারিদার জৌলুষ ছিল। সেই ললিতকণ্ঠে শ্রোতৃবৃন্দকে মোহমুগ্ধ করে রাখতেন তিনি। সেই "অমাইক" যুগের বহুজনপূর্ণ বৃহৎ আসরও তাঁর দরাজ-মধুর কণ্ঠে পরিতৃপ্তি লাভ করত। তাঁর গানের পরে অন্য গায়কের পক্ষে গান করা কঠিন হত অনেক সময়ে।

এমন সত্যিই হয়েছে যে তাঁর গানের পরে আর ভাল আসরও রাখা যায়নি। যেমন সেবার হয় কাশিমবাজারে। মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর প্রাসাদে।

মণীন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গীত বিদ্যালয়ে রাধিকাপ্রসাদ তখন অধ্যক্ষ। কি উপলক্ষ্যে বহরমপুরে তখন একটি বড় আসর হয়। তাতে যোগ দেন বাঙালী, পশ্চিমী বেশ কয়েকজন গুণী।

রাধিকাপ্রসাদের আহ্বানে মহীন্দ্রনাথও সে জলসায় আসেন।

কয়েকদিনের আসর। কিন্তু যে রাতে মহীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন, তাঁর পরে অন্য কোন গায়ক গাইতে রাজি হলেন না। সকলেই সানন্দে স্বীকার করলেন—এ গানের শেষে অন্য কোন গানের আর প্রয়োজন নেই। আসর জ্বলে গেছে।

কলকাতার হরকুটিরের আসরটির কথাও বলা যায় এখানে। তিনি সেদিন কেমন স্বীকৃতি পান কণ্ঠমাধুর্যের জন্যে, আর এক বিখ্যাত ওস্তাদের কাছে।

পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের হরকুটির সেকালের এক সুপরিচিত আসর ছিল। যদু ভট্টের গুরুভাই, গুণী ধ্রুপদী ছিলেন হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই নামাঙ্কিত এই ভবন। হরপ্রসাদ সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে বাড়িতে একটি উচ্চমানের আসর পত্তন করেন। নানা কলাবতের সঙ্গীতে ধন্য হত সে আসর।

হরকুটিরে যখন মহীন্দ্রনাথের গাইবার কথা বলা হচ্ছে তখন অবশ্য হরপ্রসাদ স্বর্গত। পরিবারের কর্তা তাঁর পুত্র দুর্গাপ্রসাদ। তিনিও ধ্রুপদ গায়ক। পিতার শিক্ষায় ধ্রুপদচর্চার ধারা যেমন তিনি বজায় রাখেন, তেমনি স্বগৃহের আসরটিকেও। গুণীজন সমাগমে মাঝে মাঝেই হরকুটির মুখরিত হয়ে উঠত।

সেদিন সেখানে গান করেন ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাও এবং মহীন্দ্রনাথ। বারাণসীর কলাবত বিশ্বনাথ রাও সে সময় কলকাতায় সঙ্গীতসমাজে সসম্মানে বিরাজমান।

বিশেষ ধামার গানে তিনি তখন শীর্ষস্থানীয়। লালচাঁদ বড়াল, মানদাসুন্দরীর মতন অনেক বিখ্যাত বাঙালী শিল্পী তাঁর কাছে অনেক দিন শিখেছেন।

সেদিন হরকুটিরে বিশ্বনাথজীর গানের পরে গাইতে বসলেন মহীন্দ্রনাথ।

বিশ্বনাথ রাও ভালই গেয়েছিলেন। তাঁর গান হয় অনেকক্ষণ ধরে। আসরকে বেশ প্রভাবিত করে তিনি চলে এলেন। বিশ্রাম

করতে লাগলেন একতলার একটি কোণের ঘরে। সঙ্গে তাঁর কয়েক-জন অনুরাগী।

ওদিকে আসরে মহীন্দ্রনাথ গান আরম্ভ করেছেন।

তাঁর উদাত্ত মধুর কণ্ঠের সুর আসর প্লাবিত করে ভেসে আসতে লাগল এই ঘরেও।

বিশ্বনাথজী বিশ্রম্ভালাপের মধ্যেই তা শুনতে লাগলেন। আর তাঁর সঙ্গীরাও। ক্রমে তাঁদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। মহীন্দ্র-নাথের গানের অনিবার্য আকর্ষণ তাঁরা রোধ করতে পারলেন না। শ্রোতা হলেন সেই ঘরে বসেই।

বিচক্ষণ গুণী বিশ্বনাথ রাও। আপন কৃতিত্ব সম্বন্ধে তিনি যেমন সচেতন, তেমনি ত্রুটির বিষয়েও নিজের কণ্ঠে মাধুর্যের অভাবও তাঁর অজানা নয়। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন এতক্ষণ তিনি আসরে যে প্রভাব বিস্তার করে এসেছেন, এবার তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এই গায়কের গানে।

বিশ্বনাথ রাওয়ের সঙ্গীরা তাঁরই মতন সপ্রশংস মুখে গান শুনছিলেন।

তাঁদের একজন মনের আবেগে বলে উঠলেন, 'মহীনবাবু আসর তো জমিয়ে ফেললেন।'

বলে, জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন তাঁর দিকে। অর্থাৎ মহীন্দ্রনাথের এই গান সম্বন্ধে ওস্তাদজীর মত কি ?

বিশ্বনাথজী অকপটে বললেন, 'হাম কেয়া করেঙ্গে ? উও ত গলেমে মার দিয়া।'...

বাস্তবিক, কণ্ঠই ছিল মহীন্দ্রনাথের পরম সম্পদ। ভারি রাগের ভারি চালের ধ্রুপদও তাঁর কণ্ঠের যাদুতে কি হৃদয়স্পর্শীই হত। মাৎ করে দিত ভাল ভাল আসর।

কিন্তু শুধু সঙ্গীতের আসরে কিংবা বোদ্ধা মহলে নয়। তাঁর গানের প্রভাবের অন্য দৃষ্টান্তও আছে।

এক একদিন বিকেলে তিনি গাইতে বসতেন বাড়িতে। প্রতি-বেশীদের অনেকে তখন উৎকর্ণ থাকতেন। আর একটি দৃশ্য দেখা যেত কোন কোন বাড়ির ছাদে।

মাথা-ঘষা গলি আর ওই ধরনের পাড়াও কাছাকাছি। গায়ে গায়ে লাগানো সব বাড়ির এলাকা। এক বাড়ির শব্দ অনেক বাড়ি থেকেই শুনতে পায়। বিশেষ দরাজ কণ্ঠের গান।

তাঁর বাড়ির কাছেই ছিল ক'টি কুখ্যাত অঞ্চল। অদূরেই এক একটি চিহ্নিত আস্তানা। তার ছাদে ছাদে অবিদ্যাদের সে সময় দেখা যেত। তাদের প্রাক্-সন্ধ্যা প্রসাধনের পর্ব তখন। কেশ পরিচর্যা করতে করতে হয়ত পদচারণ করত। কিংবা গল্পরতা।

এমন সময় কানে আসে মহীন্দ্রনাথের গানের রেশ। অমনি তাদের আলাপচারি, পায়চারি স্তব্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয় কবরী বন্ধনের কাজ। হাতের চিরুনি নিশ্চল থাকে হাতে। আবিষ্ট হয়ে সেই সুর তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত গায়িকাও। কি প্রকার তৃপ্তিলাভ করে, তারাই জানে।...

অবশ্য শ্রোতাদের চিত্তজয় করবার জন্যে মহীন্দ্রনাথের কণ্ঠমাধুর্যই একমাত্র অবলম্বন ছিল না। পদ্ধতিগত ধ্রুপদীরূপে তিনি গুণী এবং সম্মানিত ছিলেন সঙ্গীতসমাজে। বিজ্ঞ শ্রোতাদের কাছে তাঁর কদর ছিল। সকলেই জানতেন, তিনি প্রভূত রাগবিদ্যার অধিকারী।

আচার্য রাধিকাপ্রসাদের শিক্ষাধীনে নিষ্ঠাবান ধ্রুপদী—সেকালের সঙ্গীতজগতে এই পরিচয়ও অল্প গৌরবের কথা নয়। রাধিকা-প্রসাদের বিপুল ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক মহীন্দ্রনাথ। আর একনিষ্ঠ গুরুভক্তিরও এক আদর্শ উদাহরণ।

মৌজুদ্দিনকে সে আসরে গোঁসাইজী সম্পর্কে যা তিনি বলেছিলেন তাও বর্ণে বর্ণে সত্য। একমাত্র রাধিকাপ্রসাদকে গুরুরূপে গ্রহণ করেই মহীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল সাধনা করেছিলেন। ধ্রুপদ সঙ্গীত যেমন

তাঁর জীবনের অবলম্বন, তেমনি সঙ্গীতজীবনের অবলম্বন ছিলেন গোঁসাইজী। অর্থাৎ গোস্বামী রাধিকাপ্রসাদ।

মাত্র তের-চোদ্দ বছর বয়স থেকে মহীন্দ্র তাঁর কাছে গান শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। তারপর ত্রিশ বছর পেয়েছিলেন গুরুর স্নেহসঙ্গ। ছেচল্লিশ বছর বয়সে মহীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তার বছর দুই আগে কাল-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত তিনি গোঁসাইজীর শিষ্য মনে করতেন নিজেকে।

রাধিকাপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর আদর্শ গুরুশিষ্য সম্পর্ক ছিল। বিদ্যা দান ও গ্রহণের, স্নেহ ও শ্রদ্ধার, আস্থা ও বিশ্বাসের, সহৃদয়তা ও একনিষ্ঠতার এক দুর্লভ পারস্পরিক সম্বন্ধ তাঁদের।

অথচ গোঁসাইজীকে গুরুরূপে মহীন্দ্রনাথ পান অপ্রত্যাশিতভাবে। অভাবিত ঘটনাচক্রে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষারও সূত্রপাত। বালকসুলভ দুষ্টামির ফলে, কৌতুককর পরিবেশে গুরুর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। রাধিকাপ্রসাদ পরম সহিষ্ণু ও অতিশয় শান্ত স্বভাবের না হলে কি হত তাঁর অবস্থা! মহীন্দ্রের জীবন হয়ত অন্যদিকে বাঁক নিত। আর তাঁর জীবনে ঘটত না ধ্রুপদ সঙ্গীতের এমন চর্চা।

মহীন্দ্রনাথের সেই প্রথম পর্বের কথা গল্পের মতন।

গোঁসাইজীর সঙ্গে প্রথম যোগাযোগের সময় মহীন্দ্রের তের-চোদ্দ বছর বয়স। আর দুরন্ত, দুর্বিনীত স্বভাব। স্কুলে যান বটে কিন্তু লেখাপড়ায় সম্পূর্ণ অমনোযোগী। রীতিমত ডানপিটে বলে পাড়ায় আর বিদ্যালয়ে সুনাম কিনেছেন।

জোড়াসাঁকো আর পাথুরিয়াঘাটার মাঝামাঝি জায়গায় তাঁদের বাড়ি। এই পৈতৃক বাসস্থান। পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের দক্ষিণে, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীটের উত্তরে এবং চিৎপুর রোডের পশ্চিমে লাল-মাধব মুখার্জি লেন। সেই গলির ১৭।২ বাড়িতে তাঁদের বাস ছিল।

লালমাধব মুখার্জি লেন এখনো আছে বটে। কিন্তু সেকালে এই

নামের গলিটি ছিল আরো কিছু দীর্ঘ। পরে তার খানিক অংশ লুপ্ত হয়ে যায় হলওয়াসিয়া লেন নামে পথের মধ্যে।

যাঁর নামে এই সরু রাস্তাটির নামকরণ হয় সেই লালমাধব মুখোপাধ্যায় ছিলেন মহীন্দ্রনাথের কাকা। তখনকার একজন প্রতিপত্তিশালী চিকিৎসক তিনি। ডাক্তার লালমাধব কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠায় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের একজন সহযোগী ছিলেন, একথাও উল্লেখ্য। (কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ পরে রাধাগোবিন্দ করের স্মৃতিতে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ নামে পরিচিতি লাভ করে।)

বালক মহীন্দ্রনাথের সময় সেই বাড়ির সামনে ছিল ৩, ব্রজদুলাল স্ট্রীটের বাড়িটির একাংশ। ব্রজদুলাল পথটি পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে চলে আসে লালমাধব মুখার্জি লেনের পাশে। মহীন্দ্রের বাড়ির দিকে ৩, ব্রজদুলাল স্ট্রীটের একটি ঘর ছিল। আর রাধিকাপ্রসাদ সে সময় বাস করতে আসেন সেই ঘরটিতেই। তাঁর ঘরখানি ছিল সে বাড়ির একেবারে পূর্বদিকে এবং মহীন্দ্রের বাড়ির পশ্চিমে। ঠিক মুখোমুখি। দুয়ের মাঝে মাত্র পাঁচ ফুট গলির ব্যবধান। তখনকার কোলাহল-বিরল পরিবেশে তা ছিল একই বাড়ির মতন।

রাধিকাপ্রসাদ একান্তে সঙ্গীতসাধনার জন্যে ঘরখানি ভাড়া নিয়েছিলেন। তাঁর বয়স তখন তেইশ-চব্বিশ বছর। তখনো তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমী শিক্ষার্থী।

তাঁর সঙ্গীতজীবনের প্রথম পর্ব সে সময়। এ শহরে তিনি তখন প্রায় অপরিচিত। কলকাতার সঙ্গীতসমাজে তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠা কিছুই হয়নি। বেতিয়া ঘরানাদার শিবনারায়ণ ও গুরুপ্রসাদ ভাইদের কাছে ধ্রুপদ এবং খেয়ালও শিক্ষা করেন। সে সুযোগ পেয়েছেন ভাগ্যক্রমে। অনেক কষ্ট সহ্য করে, অচেনা শহরে অনেক জীবনযুদ্ধের পরে।

পনের বছর বয়সে জন্মস্থান বিষ্ণুপুর ত্যাগ করে তিনি কলকাতায়

আসেন রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষার আশায়। সহায়সম্বলহীন অবস্থায় কলকাতায় অনেক দুঃখকষ্টে ক'বছর কাটে। ইচ্ছানুযায়ী সঙ্গীত-শিক্ষার সুযোগ বহুদিন পর্যন্ত পাননি। উপরন্তু তাঁর নিতান্ত প্রাণ-ধারণের জন্যে কঠোর সংগ্রামের কাল সেটি। কিন্তু অটল অদম্য থাকেন সংকল্পে।

রাধিকাপ্রসাদের একমাত্র ধ্রুব লক্ষ্য—ভাল করে গান শিখতে হবে। কিন্তু কে শেখাবে এই গ্রাম্য বালককে? বহু চেষ্টায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রধান সভাগায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর ছাত্র হলেন। কিন্তু সেখানেও সুবিধা হল না উপযুক্ত শিক্ষার।

আবার কিছুদিন গেল। অবশেষে পরম সুযোগ এল ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর মধ্যস্থতায়। নিমতলা-নিবাসী ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হলেন। আর তাঁর দাক্ষিণ্যে শিবনারায়ণ, গুরু-প্রসাদের শিষ্য হয়ে গান শিখতে লাগলেন। ননীমোহনের মাসিক ৪০ টাকা সাহায্যের ফলে সম্ভব হয় এই পর্বের সঙ্গীতশিক্ষা।

বেতিয়া ঘরানার বিখ্যাত কলাবৎ শিবনারায়ণ ও গুরুপ্রসাদ ভ্রাতারা। তাঁদের কাছে একাদিক্রমে প্রায় দশ বছর শিক্ষালাভের সুযোগ পান রাধিকাপ্রসাদ। আর সুপ্রতিষ্ঠিত হন সঙ্গীত জীবনে। সেই শিক্ষাজীবনের মধ্যভাগে তিনি ব্রজদুলাল স্ট্রীটে বাস করতে আসেন। মহীন্দ্রনাথের বাড়ির সামনেই সেই ঘরখানিতে।

নির্জন গলির ঘরে বসে কণ্ঠ-সাধনা করতেন রাধিকাপ্রসাদ। ওদিকে নানাপ্রকার দুষ্টামির উৎসাহে মহীন্দ্রের দিন যায়।

রাধিকাপ্রসাদ গান আরম্ভ করলেই তাঁর দৃষ্টি পড়ে এ ঘরের দিকে। আর নানাপ্রকার দুষ্ট বুদ্ধি মাথা থেকে বেরুতে থাকে। তারই উপদ্রবে আক্রান্ত হতে থাকেন রাধিকাপ্রসাদ।

কোথা থেকে হঠাৎ হাজির হন দুরন্ত বালকটি। সঙ্গে গোপাল নামে আর একটি সমবয়সী জ্ঞাতিভাই—যার স্বভাবও বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রথম ভাগের গোপালের বিপরীত।

তখন রাধিকাপ্রসাদের গানের সঙ্গে বালক দুটির উৎপাত সমানে চলে। জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর গানের উদ্দেশে বর্ষিত হয় হাসি তামাসা চিৎকারধ্বনি। উপদ্রব একেকদিন অতিরিক্ত রকমের হতে থাকে। অগত্যা জানলা বন্ধ করে দেন গোঁসাইজী। তখন ক্ষান্ত হয়ে বালকদের মন অন্য অপকর্মের দিকে যায়।

এমনিভাবে দিনের পর দিন। মহীন্দ্রের দুরন্ত জীবনে কেবল একটি বিষয়ে আসক্তি দেখা যেত। বাংলা গানে তাঁর বড় অনুরাগ।

জোড়াসাঁকো অঞ্চলে হাফ আখড়াই আর পাঁচালি গানের তখনো খুব চলন ছিল। তিনি সেসব গান শুনতে যেমন ভালবাসতেন, তেমনি গাইতেনও। গান শুনে তা নকল করে গাইবার যেমন ক্ষমতা, তেমনি মিষ্টি গলা। কিন্তু গানের সময়টি ভিন্ন অস্থির অবাধ্য স্বভাব। আর রাধিকাপ্রসাদকেই তার শিকার হতে হয় বেশি।

গোঁসাইজী জানলা বন্ধ করেও একেক দিন নিস্তার পান না।

এমনি একদিনের কথা।

সেদিন জানলায় এমন ধাক্কা পড়তে লাগল যে তিনি খুলে দিলেন বাধ্য হয়ে।

সহাস্য মহীন্দ্র জানলা থেকেই সোজা জিজ্ঞেস করলেন, 'অমন আ-আ-আ করে এসব কি রোজ রোজ গাও? ভাল গান গাইতে পার না?',

গোঁসাইজী বিরক্ত হলেন না।

বরং সকৌতুকে বললেন, 'কেন, কি গান তবে গাইব?'

'কত ভাল ভাল সব বাংলা গান আছে। সেসব কেমন বোঝা যায়!'

'কি রকম গান? তুমি গাইতে পারো?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, আমায় শোনাও তো দেখি।' বলে, রাধিকাপ্রসাদ এবার

বালককে ঘরের মধ্যে আসতে দিলেন। তক্তপোশে স্থির হয়ে বসে মহীন্দ্র গেয়ে শোনালেন—

হীন জনে দয়া কর দয়াল প্রভু...

গানখানি সাদামাঠা। কিন্তু রাধিকাপ্রসাদ তাঁর গানের গলার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলেন। তখনি তাঁর মনে হল, স্বভাবদত্ত সুকণ্ঠ বালকের। তাকে শিক্ষিত মার্জিত করতে পারলে বড় সুন্দর হবে। এই বালকই পরে ভাল গায়ক হতে পারবে।

উৎসাহ দিয়ে তিনি বললেন, 'বাঃ, তুমি তো বেশ গাইতে পারো! আচ্ছা, এবার শোন এই গানটা কেমন লাগে।'

বলে, মালকোশে একটি বাংলা গান গাইতে লাগলেন—বাংলা খেয়াল অঙ্গের গান—

ও মা দীনতারিণী তারা।
দিনে দিনে দিন কেটে গেল মাগো,
কত দিন আর রব তোমা ছাড়া॥
পাঠাইলে যদি এ ভবসংসারে,
কেন চিরপরাধীন করিলে আমারে,
পরাধীনতার সহে না যাতনা,
কোলে তুলে নে মা ওমা দুখ-হরা॥

(গানখানি অনেক পরে গ্রামোফোন রেকর্ডে শোনা যায়। রেকর্ড করেছিলেন বিখ্যাত গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে।)

গাইবার সময় গোঁসাইজী লক্ষ্য করলেন, বালক একমনে গান শুনছে। স্তব্ধ হয়ে গেছে তার সব চাপল্য। এ যেন অন্য কোন জন!

আগাগোড়া গানখানি সেইভাবে শোনবার পর মহীন্দ্র বলে উঠলেন, 'তুমি এত ভাল গান জানো? আমাকে ওইরকম শিখিয়ে দেবে?'

রাধিকাপ্রসাদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বালকের সুমতি দেখে।

হাসিমুখে বললেন, 'বেশ তো, শেখাব।'

মহীন্দ্রের এতদিনের উৎপাত সেদিন থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। তাকে গান শেখাতে আরম্ভ করলেন রাধিকাপ্রসাদ।

পর পর দুখানি বাংলা গান প্রথমে দিলেন। কারণ তার তখন বাংলা গানেই প্রবল আকর্ষণ। সেজন্যে বাংলা গানের মধ্যে দিয়ে রাগসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় করাতে চাইলেন।

গান দুখানি গলায় বেশ তুললেন মহীন্দ্র।

ক্রমে সুরের দিকে তাকে আকৃষ্ট হতে দেখলেন গোঁসাইজী। এবার সার্গম সাধনার পাঠ দিলেন। ইমন কল্যাণের একটি তরানা শেখাতে লাগলেন—

উদানা দ্রিম দ্রিম তানু,
তা না দেরে না, তা না দেরে না।···

অর্থহীন স্বর দিয়ে সুরের সাধন। কিন্তু তা নিয়ে মহীন্দ্র এবার আর কোন হাসি তামাসা করলেন না। বেশ মন দিয়ে তরানা সাধতে লাগলেন গোঁসাইজীর নির্দেশে।

এমনিভাবে তাঁর পদ্ধতিগত সঙ্গীতশিক্ষা এগিয়ে চলল।

ছাত্রের আশানুরূপ উন্নতি দেখে এবার সন্তুষ্ট হলেন রাধিকাপ্রসাদ।

মহীন্দ্রনাথ সুকণ্ঠ গায়ক হতে লাগলেন। তারপর আরো কিছুদিন গেল।

রাধিকাপ্রসাদ একটি ছোটখাটো স্কুল করলেন ছাত্রদের গান শেখাবার জন্যে। ব্রজদুলাল স্ট্রীটেই অন্য একটি ঘর ভাড়া নিয়ে। তখন থেকে সেখানে গিয়েই সঙ্গীত অভ্যাস করতেন মহীন্দ্র। সে এক অবিশ্রান্ত, একনিষ্ঠ সাধনার দৃষ্টান্ত। শুধু আহার ও শয়নের সময়টিতে গৃহে দেখা দিতেন। অবশিষ্ট সব সময় গোঁসাইজীর নির্দেশে শিষ্যের যথাবিধি সাধন।

এখানে বলে রাখা যায় যে, সঙ্গীতচর্চার জন্যে মহীন্দ্রকে

পারিবারিক কোন বাধা ভোগ করতে হয়নি। বিদ্যাশিক্ষার কোন আশা তাঁর ছিল না। অভিভাবকরা ভাবলেন—মন্দের ভাল, গানই শিখুক। অন্তত দুরন্তপনা যাবে। শান্তশিষ্ট হবে।

মহীন্দ্রনাথের তন্নিষ্ঠ গায়কজীবন এমনিভাবে আরম্ভ হয়েছিল।...

১৮৭৩ সালে তাঁর জন্ম। আর ১৮৮৬-৮৭ থেকে অনেক বছর গোঁসাইজীর কাছে শেখেন একাদিক্রমে।

শিক্ষাপর্বের মধ্যেই মহীন্দ্রনাথ নানা আসরে গাইতে লাগলেন। কলকাতার উত্তরাঞ্চলে সঙ্গীতাসরের অভাব ছিল না সেকালে। ক্রমে মধুর-কণ্ঠ ধ্রুপদী বলে কলকাতার সঙ্গীতসমাজে গণ্য হলেন। গোঁসাইজী তার অনেক আগেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন গুণী, নেতৃস্থানীয় এক গায়ক বলে। মহীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয়তম শিষ্যরূপে যশস্বী হতে লাগলেন।

রাধিকাপ্রসাদ পরিণত বয়সে কয়েক বছর বহরমপুরনিবাসী হন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়ে বাস করেন সেখানে। মহীন্দ্রনাথ তখন গুরুর নির্দেশে ব্রজদুলাল স্ট্রীটের সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতেন। অব্যাহত রাখতেন তার সঙ্গীতচর্চা।

তখনো রাধিকাপ্রসাদ মাঝে মাঝে কলকাতায় এলেই সেখানে অবস্থান করতেন। কখনো মহীন্দ্রও গুরুর আহ্বানে উপস্থিত হতেন বহরমপুরে। এমনিভাবে পরস্পরের মধ্যে বরাবর যোগাযোগ থাকত। এইভাবেই তিনি ছিলেন আজীবন গোঁসাইজীর শিষ্য।

রাধিকাপ্রসাদ বহরমপুর যাবার আগে তাঁর সঙ্গীতজীবনের সঙ্গে মহীন্দ্রনাথ অঙ্গাঙ্গী যুক্ত ছিলেন। সেটি গোঁসাইজীর গুণীরূপে প্রতিষ্ঠালাভের অধ্যায়। গুরুর প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্যে প্রিয়তম শিষ্য সদা তৎপর ও একান্ত উৎসাহী ছিলেন। গুরুরও শিষ্যের প্রতি অন্তরের যে স্নেহ ছিল তার প্রকাশ হত নানা উপলক্ষ্যে।

গোঁসাইজী ছিলেন নিরীহ, শান্তিপ্রিয় স্বভাবের মানুষ। আর

সেকালের সঙ্গীতক্ষেত্রে নানাপ্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অশান্তিকর বিরুদ্ধতাও ছিল।

সেই পরিবেশে কলকাতায় গুরুর প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে বিশেষ সহায়ক হন মহীন্দ্রনাথ। বাল্যের দুরন্ত স্বভাব পরে তাঁর চরিত্রে সাহসিকতা, নির্ভীকতা আনে। কোন দাম্ভিক কলাবতের আসরে যদি গোঁসাইজীর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা থাকত, মহীন্দ্রনাথ সদলে উপস্থিত থাকতেন তাঁর সঙ্গে।

গোঁসাইজীর কণ্ঠ তেমন বলশালী ছিল না। তাছাড়া, সাধারণত তিনি গাইতেন সি-স্কেলে। সেজন্যে কোন কোন আসরে হয়ত তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে অসুবিধা হত। কিংবা হয়ত তাঁকে টেক্কা দেবার জন্যে কোন গায়ক গাইলেন ডি-তে। তখন মহীন্দ্রনাথ দরাজ কণ্ঠে এফ-এ গান গেয়ে গুরুর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতেন।

গুরুভক্তি প্রণোদিত হয়ে আরো এক ধরনের কাজ করতেন মহীন্দ্রনাথ। তার একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যাক। এই ঘটনা থেকে পাওয়া যাবে সেকালের সঙ্গীতজগতের একটি দিকের পরিচয়। এমন ঘটনাও ঘটত সে-যুগে।

সেদিন কলকাতার উপকণ্ঠে এক বৃহৎ আসর বসেছে। সেখানে কাশীর প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী কামতাপ্রসাদ মিশ্রের গান হচ্ছিল তখন। তাঁর গানের পরে গোঁসাইজীর অনুষ্ঠান হবার কথা।

কামতাপ্রসাদ আসর জমিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে গাইছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ আগে গান আরম্ভ করেছিলেন তিনি।

রাধিকাপ্রসাদ আসরে বসে অপেক্ষা করছেন। সঙ্গে মহীন্দ্রনাথ রয়েছেন এবং তাঁর আত্মীয় গোপালচন্দ্র প্রভৃতি সাঙ্গোপাঙ্গ। মহীন্দ্রনাথ এমনি ছোটখাটো একটি ফৌজ নিয়ে অনেক আসরে উপস্থিত হতেন।

কামতাপ্রসাদের গান চলেছে অনেকক্ষণ ধরে। শেষ হবার যেন লক্ষণ নেই। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন রাধিকাপ্রসাদ। অযথা

অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে। গানের মেজাজও আর থাকছে না। কি করা যায় এখন তাই ভাবছিলেন বসে।

মহীন্দ্রনাথের ভাল ঠেকেনি মিশ্রজীর এই অতিবিলম্বিত গায়ন। তাঁর মনে সন্দেহ জাগছিল—কামতাপ্রসাদের এমনি কালহরণ ইচ্ছাকৃত নয় তো? গোঁসাইজীকে গানের উপযুক্ত সুযোগ না দেয়াই কি কামতাপ্রসাদের লক্ষ্য?

গান অবশ্য ভালই হচ্ছিল। বিরাট আসরও জমজমাট। কিন্তু কত রাত্রে গাইতে পাবেন গোঁসাইজী? তখন আর কত শ্রোতা তাঁর গান শোনবার জন্যে থাকবে?

আরো অনেকক্ষণ বৃথাই তাঁরা অপেক্ষা করলেন। মহীন্দ্রনাথের সন্দেহ এবার দৃঢ় হল।

তিনি ইতিকর্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করে নিলেন গোপালচন্দ্রের সঙ্গে। একটি উপযুক্ত পরিকল্পনাও স্থির হল। আর সেই মতন আরম্ভ হয়ে গেলে কার্যধারা। জ্ঞাতিভাই গোপালচন্দ্র তার প্রধান কর্মকর্তা হলেন। তিনি ছিলেন মহীন্দ্রেরই তুল্য অকুতোভয়। উপরন্তু অধিকতর বলিষ্ঠকায়।

তখন প্রখর গ্রীষ্মকাল। আসরের প্রশস্ত কক্ষে বৃহৎ টানা পাখার ব্যবস্থা ছিল। ঘরের বাইরে দড়ি ধরে বসেছিল তার চালক। তার টানে আসরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত আন্দোলিত হয়ে যাচ্ছিল প্রকাণ্ড ঝালরদার পাখা। তারই মধ্যে হুঁকাবরদার আসরের গড়গড়ায় টিকের আগুন সরবরাহ করছিল।

মহীন্দ্রের দলের একজন ঘরের বাইরে সেই পাখার লোকটির সঙ্গে ভাব করে নিলে এবং পাখা টানতে আরম্ভ করলে।

তারপরই টানা পাখা ও হুঁকাবরদারের আগুনের মধ্যে সংযোগ ঘটানো হল অকাট্য কায়দায়।

আর তারই ফলস্বরূপ পাখার ধাক্কায় টিকের আগুন লক্ষ্যস্থলে পড়ল। অর্থাৎ গায়ক কামতাপ্রসাদের অঙ্গে।

তাঁর গায়ে আগুন পড়তেই আসরে মহা সোরগোল আরম্ভ হল। অকস্মাৎ গানের মধ্যে এই অগ্নিস্পর্শে বিমূঢ়, ভয়ার্ত হয়ে পড়লেন কামতাপ্রসাদ।

তৎপর গোপালচন্দ্র সেই সুযোগে তাঁর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

দরদী অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আপনার গায়ে আগুন লেগে গেছে, আগুন লেগে গেছে।'

বলবার সঙ্গে সঙ্গে মিশ্রজীকে পাঁজাকোলা করে একেবারে নিয়ে এলেন আসরের বাইরে।

বিপন্ন-মুখ, হতবাক্ কামতাপ্রসাদ। আগুন তাঁর অবশ্য কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

কিন্তু গোপালচন্দ্র তাঁর বপুতে হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন, "বড্ড পুড়ে গেছে। তবে আপনি ভয় পাবেন না। আমরা এখুনি সব ব্যবস্থা করছি। আপনি স্থির হয়ে থাকুন। নড়াচড়া একেবারে করবেন না। খুব বেঁচে গেছেন। ডাক্তার ডাকছি,' ইত্যাদি।

মিশ্রজীর গানের আগ্রহ তখন একেবারেই অন্তর্ধান করেছে। প্রাণরক্ষা হয়েছে মনে করেই তিনি কোনক্রমে সংবিৎ রেখেছেন।

ওদিকে আসর সামলেছেন সদলে মহীন্দ্রনাথ। হৈ-চৈ থামিয়ে দিয়েছেন।

আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শ্রোতাদের জানাচ্ছেন, 'ভাল আছেন, বেঁচে গেছেন কামতাপ্রসাদ। কোন ভয় নেই। এবার আসর চলুক।'

এমনি কথায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। শ্রোতারাও আসন নিয়েছেন গোঁসাইজীর গান শোনবার জন্যে।

অতএব গাইতে অনুরুদ্ধ হলেন রাধিকাপ্রসাদ। তারপর গান আরম্ভ করলেন। তখন ভাঙা আসর আবার প্রাণবন্ত হল তাঁর গুণপনায়।

গোঁসাইজীর প্রতিষ্ঠালাভের প্রথম পর্বের কথা এসব। তাঁর ঘনিষ্ঠমহল ভিন্ন বাইরে অবশ্য এসব ঘটনা জানাজানি হয়নি।

পরিণত বয়সে রাধিকাপ্রসাদ যখন বহরমপুরে সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়ে গেলেন, মহীন্দ্রনাথ তখন পূর্ণ বিকশিত ধ্রুপদগুণী। উচ্চমানের ধ্রুপদী বলে তিনি মর্যাদার আসন লাভ করেছিলেন।...

মহীন্দ্রনাথের গান বেশি শোনা যেত কলকাতার নিম্নলিখিত আসরগুলিতেঃ পাথুরিয়াঘাটার হরকুটীর ও প্রদ্যুম্ন মল্লিকের ভবন। পোস্তার কুঞ্জবিহারী মল্লিক ও দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীটের যদুনাথ দত্তের গৃহ। মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সার্কুলার রোড ও বাগবাজারের বাড়ি ইত্যাদি। তাছাড়া, সেকালে যে দুটি বার্ষিক সঙ্গীত-সম্মেলন এ শহরে হত, তার তিনি ছিলেন নিয়মিত ও সম্মানিত শিল্পী। একটি হল—মুরারি সম্মেলন। মৃদঙ্গাচার্য মুরারিমোহন গুপ্তের স্মৃতিতে কয়েকদিন ধরে এই সঙ্গীতাসর হত। শিবনারায়ণ দাস লেনে, বৃহৎ মণ্ডপের নীচে। তখনকার প্রায় সব নামী গুণীই গান-বাজনা শোনাতেন মুরারি সম্মেলনে। মুরারিমোহনের শিষ্য দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য এই সম্মেলনের প্রধান উদ্‌যোক্তা থাকতেন। আর একটি ছিল—শঙ্কর উৎসব। প্রতি বছর শিবরাত্রিতে এই আসর হত সারারাত ব্যাপী। দুই বিখ্যাত পাখোয়াজী দীননাথ হাজরা ও নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'শঙ্কর উৎসব' পরিচালনা করতেন। অনুষ্ঠানের স্থান ছিল—১৮, রাধানাথ মল্লিক লেন।

আসরে মহীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে পাখোয়াজ বেশি বাজাতেন সুমিষ্ট সঙ্গতকার নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কিংবা মৃদঙ্গগুণী দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য।

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং মধ্যমাকৃতির ছিলেন মহীন্দ্রনাথ। তাঁকে শীত-গ্রীষ্ম সর্বসময়ের আসরে মলমলের পাঞ্জাবি কিংবা চাদর গায়ে যোগ দিতে দেখা যেত।

তাঁর প্রিয় রাগ ছিল দরবারী কানাড়া, বসন্ত, ইমন কল্যাণ, কৌশিকী কানাড়া, বাগীশ্বরী ও কেদারা।

তাদের মধ্যে বিশেষ করে তিনি দরবারী ও কৌশিকী কানাড়ায় সিদ্ধ ছিলেন। তানসেনের সেই দরবারীর 'প্রথম সমঝ আওরে বিদ্যা' গানে বহু আসর যেমন মাতিয়ে দিতেন, তেমনি কৌশিকী কানাড়ার এই গানখানিতেও—

সগুণ সোহাওঅন
আজু লায়ে সুখ
নয়নন চয়নন সো ভাওএ॥
পিয়া অবঁহি আওএঙ্গে
বহোত চিহ্ন
প্রগট ভয়ো নিতহী উনকী।
মন ভাওয়ন আজু লায়ো সুখ
নয়নন চয়নন সো ভাওএ॥
ফুলন মাল গুঁথ
লাঈ পিয়াকে গরে দেওঙ্গী
মনমে আনন্দ আওএ॥
ধোঁধি কহত শুনোরি
তিয়া মেরে প্রভুকো পুকারো
তবঁহি তুরত পিয়া পাওএ॥

ধ্রুপদের এক কৃতী শিক্ষকরূপেও মহীন্দ্রনাথ স্থায়ী কীর্তি রেখে যান। রাধিকাপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত ব্রজদুলাল স্ট্রীটের সেই সঙ্গীত বিদ্যালয়ে, আপন গৃহে এবং অন্যত্রও নিয়মিত সঙ্গীতশিক্ষা দিতেন তিনি। ফলে তাঁর একটি শিষ্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তাঁদের মাধ্যমেই রাধিকাপ্রসাদ ও তাঁর সঙ্গীতধারা রক্ষিত ও প্রবর্ধিত হয় বাংলাদেশে।

মহীন্দ্রনাথ যে আসরে যোগ দিতেন, সেখানে পনের-কুড়িজন ছাত্রের একটি বাহিনী তাঁর সঙ্গে উপস্থিত হত।

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কণ্ঠসম্পদ ও গায়ন কৃতিত্বের জন্যে ভূতনাথ বাংলার এক শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী ছিলেন। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও মহীন্দ্রনাথের শিষ্য। সুকণ্ঠ ধ্রুপদগুণী ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও মহীন্দ্রনাথের নিকটে কয়েক বছর শিক্ষা করেন। তা ভিন্ন, কার্তিকচন্দ্র সেন, ননীলাল চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও তাঁর শিষ্য।

মহীন্দ্রের অপর এক শ্রেষ্ঠ শিষ্য তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র ললিতচন্দ্র। পিতার কণ্ঠমাধুর্যের ও নৈপুণ্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী তিনি। ললিতচন্দ্র বাংলার একজন প্রতিভাবান ধ্রুপদীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। নানা সঙ্গীত-সম্মেলনে, আসরে, কলকাতা বেতারকেন্দ্রের শিল্পী ললিতচন্দ্র বহুখ্যাত হয়েছিলেন বটে। কিন্তু তিনিও পিতারই মতন মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে ১৯৪৪ সালে লোকান্তরিত হন। একই কালব্যাধিতে। তার ছাব্বিশ বছর আগে ১৯১৮ সালে মহীন্দ্রনাথের জীবনাবসান হয়।

মহীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাঁর সকল কৃতী শিষ্যই শিক্ষা পেতে থাকেন রাধিকাপ্রসাদের কাছে। এইভাবে ধারাটি অব্যাহত থাকে।

মহীন্দ্রনাথ যখন খ্যাতনামা গায়ক, গ্রামোফোনের রেকর্ডের তখন খুবই প্রচলন হয়েছিল। সেই সংস্থা থেকে তিনি অনুরুদ্ধও হন রেকর্ড করবার জন্যে। কিন্তু তিনি সম্মত হননি।

সেকালের অনেক নিষ্ঠাবান ধ্রুপদীর মতন তাঁরও একটি আদ' কিংবা আভিজাত্য বোধ ছিল।

তিনি বলতেন, 'তিন মিনিটে ধ্রুপদ গান কি হবে? আর সে. রেকর্ড বাজবে যেখানে-সেখানে, পান-বিড়ির দোকানে।'

সুতরাং আর রইল না সেই অনুপম কণ্ঠমাধুর্যের, সেই ঠুংরির কণ্ঠের কোন শ্রুতি-নিদর্শন। তাঁর দেহপটের সঙ্গেই হারিয়ে গেল। তার ধারণা করতে পারবে না ভাবীকালের কোন শ্রোতা।

অথচ তাঁর গান শোনা কত সুলভ, কত সহজ ছিল। তাঁর কত

ঘরোয়া আসর হয়ে গেছে জানাশোনা বাড়িতে। যে কেউ ইচ্ছে হলেই শুনেছে।

কোথাও গাইবার কথা দিয়ে কখনো মহীন্দ্রনাথ গরহাজির হতেন না। শিল্পী হিসেবে অহমিকাশূন্য। গান গাইবার কথা যেখানে, গান হবেই। শ্রোতারা যে অপেক্ষা করে রয়েছেন—যেতেই হবে। নিজের কোন বাধাবিপত্তির কথা মনেই হত না তাঁর।

জোড়াসাঁকোয় সুবোধবাবুর বাড়ির সেই আসর তো গল্পকথা হয়ে আছে।

বলরাম দে স্ট্রীটের দেবেন্দ্রনাথ দে, নামকরা পাখোয়াজী। মুরারি গুপ্তের ঘরের শিষ্য তিনি। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আসল নাম হলেও সুবোধবাবু বলেই তাঁকে সবাই ডাকে। মহীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। বলা যায় তাঁরা এ-পাড়া ও-পাড়ার বাসিন্দা। তাঁদের বাড়ির মধ্যে পাঁচ-সাত মিনিটের রাস্তা।

সেদিন সুবোধবাবুর বাড়িতে আসর। কদিন আগেই কথা হয়েছে মহীন্দ্রনাথও গাইবেন। এমন সময়, আসরের ঠিক আগের দিন তাঁর একটি ছেলে মারা গেল।

পরের দিন আসর আরম্ভ হবার আগে সুবোধবাবু জানিয়ে দিলেন দুঃসংবাদটি। অতএব আজ মহীন্দ্রনাথের গান হবে না। শ্রোতারা দুঃখ পেলেন বটে, তবে আসর বন্ধ হল না। অন্য গায়ক গান শুরু করলেন।

তারপর আসর যখন শেষ হবার মুখে, সবাই অবাক হয়ে দেখলেন, মহীন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়েছেন!

খানিক পরে গানও ধরলেন তিনি। সুবোধবাবুর পাখোয়াজ সঙ্গতে যথারীতি ঘণ্টাখানেক গেয়ে গেলেন!

ওস্তাদের ওস্তাদ

লছমিপ্রসাদ মিশ্র

তবলিয়ার কি মিষ্টি হাত! যেন কোন সুরের যন্ত্র বেজে চলেছে। কেমন মধুর শোনাচ্ছে অনর্গল বোলগুলি। কোমল ধ্বনি, কিন্তু নিখুঁত সুস্পষ্ট সমস্ত বুলি। তবলা যেন নিজের ভাষায় কথা বলছে।

অথচ যন্ত্রের মতন ত্রুটিহীন সব আঙুল আর করতলের কায়দা। নির্ভুল অঙ্কের মাত্রায় তবলা বাঁয়া বেজে চলেছে। হাত ঘুরছে যান্ত্রিক চক্রে। কিন্তু কি মিঠে আওয়াজে বোল উঠছে অবিরাম। আর সেই সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা তবলা থেকে একটানা সুরের রেশ—কানি-র টাং টাং ধ্বনি। যেন সেতারের কৃন্তন। তারই মধ্যে ফুটছে অফুরন্ত বোল বন্দের বাহার।

হারমোনিয়মে নামমাত্র সঙ্গত হচ্ছে। ঘুরে ঘুরে বেজে চলেছে শুধু গতের মুখটি। সরল বোলের একটি গৎ। তার প্রত্যেক মাত্রায় একটি স্বর ও একটি বোল বাজছে। তবলা লহরার সঙ্গে সুর-যন্ত্র বাজাবার তা-ই রীতি, কারণ তবলাই এখানে মুখ্য। হারমোনিয়মের কোন ভূমিকা নেই তাল লয় রক্ষা ছাড়া। আসরে তাই তবলচীই প্রধান আকর্ষণ। হারমোনিয়ম-বাদকের দিকে কারো দৃষ্টি নেই।

শ্রোতাদের সকলকে আকৃষ্ট করে রেখেছেন তবলাশিল্পী। ওস্তাদ আবেদ হোসেন—লক্ষ্ণৌ ঘরানাদার খলিফা।

সেদিন আসর বসেছে দক্ষিণ কলকাতায়—ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনীতে।

সঙ্গীতচর্চার এমন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, নিয়মিত আসর কলকাতায় আর হয়নি। বিশ শতকের প্রথম বছরেই সঙ্গীত সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন সঙ্গীতপ্রেমী যাদবকৃষ্ণ বসু, পাখোয়াজী কেশবচন্দ্র মিত্র প্রমুখ। সেই ১৯০০ সাল থেকে এই সম্মিলনী অবিচ্ছিন্ন ধারায় সঙ্গীত-সেবার এক মহান ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। আবেদ হোসেনের সে আসরের প্রায় ২৫ বছর আগে তার পত্তন। আর আসরটির পরে ৫০ বছরেরও বেশি পার হয়ে গেছে। ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনী আজো তার আপন ভবনে সগৌরবে বিদ্যমান।...

সম্মিলনীতে সেদিনকার আসরে আবেদ হোসেনের বাজনা শুনতেই শ্রোতারা এসেছেন। তাঁর একক অনুষ্ঠান—তবলা লহরা।

লক্ষ্ণৌর তবলা ঘরানার তখন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি আবেদ হোসেন। উত্তর ভারতের এক শ্রেষ্ঠ গুণীও তিনি। তাই খলিফা বলা হত তাঁকে।

বাইজীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা নর্তকীকে যেমন বলা হয় চৌধুরান। তখনো এমনি এক বাইজা ছিলেন। কলকাতাতেই থাকতেন সেই চৌধুরান। লক্ষ্ণৌ থেকেই সে বাইজী কলকাতায় আসেন। লক্ষ্ণৌ কথক ঘরানার বিন্দা দীনের কাছে তালিম তাঁর।

দুজনেই লক্ষ্ণৌর বলে আবেদ হোসেনের সঙ্গে চৌধুরানের সাঙ্গীতিক যোগাযোগ ছিল। চৌধুরান বাইজা ও তাঁর কনিষ্ঠা আজমৎ বাই—নান্নুয়া বাছুয়া নামে প্রসিদ্ধা। দুই ভগিনীর কথক নাচের সঙ্গে কত আসরে বাজিয়েছেন আবেদ হোসেন।

লক্ষ্ণৌ তবলা ঘরানার কদর ছিল নাচকরণ সঙ্গতের জন্যে। কথক নৃত্যের যোগ্য বাদন-শৈলী নাচকরণেও আবেদ হোসেন খলিফা ছিলেন।

চৌধুরান বাইজীর ভাই আলী কদরও ভাল তবলচী। কিন্তু বড় আসর হলে, সুযোগ থাকলে আবেদ হোসেন অনেক সময় তাঁদের কথক নৃত্যের সঙ্গে নাচকরণ বাজাতেন। চৌধুরান আর আজমৎ বাই শুধু কলকাতায় থাকতেন না। তাঁরা বাংলার বাইরেও মুজরো করতে যেতেন, পশ্চিমের নানা আসরে দরবারে।

আবেদ হোসেন কলকাতায় এলে চৌধুরান বাইয়ের বাড়িতে মুরশেদ (সম্মানিত অতিথি) হয়ে থাকতেন। সেখান থেকে বাজাতে যেতেন নানা আসরে।

আবেদ হোসেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুন্নে খাঁও ছিলেন খলিফা। মুন্নে খাঁর মৃত্যুর অনেক পরে বংশের সেই শূন্য পদ আবেদ হোসেন পূরণ করেছেন। কঠিন সাধনায় যোগ্য করে তুলেছেন নিজেকে। দৈনিক পনের-ষোল ঘণ্টা পর্যন্ত রিয়াজে প্রস্তুত হয়েছেন। তারপর সঙ্গীত-জগতে আত্মপ্রকাশ করেছেন লক্ষ্ণৌ ঘরানার উপযুক্ত রূপে। খলিফার সম্মান পেয়েছেন।

আবেদ হোসেনের জন্ম ১৮৬৭ সালে। লক্ষ্ণৌর মামুদপুরে। বেশি থাকতেন লক্ষ্ণৌতেই। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। তাঁর অনেক গুণগ্রাহী ছিলেন এ শহরে। নানা আসরে মুজরো করতেন। লহরা শোনাতেনও কোথাও। কখনো সংগতকার। এখানে তাঁর কৃতী শিষ্যও হন। এমনি নানাভাবে সে যুগের কলকাতায় বিখ্যাত ছিলেন খলিফা আবেদ হোসেন।

সেদিন ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনীতে তিনিই অতিথি শিল্পী। তাঁর লহরার জন্যেই এত বড় আসর হয়েছে। সেই বৃহৎ কক্ষ তখন শ্রোতায় পূর্ণ।

ঝাঁপতালে লহরা বাজাচ্ছিলেন খাঁ সাহেব। অসমান বিভাগের এই তাল। দোলায়িত ছন্দ তার।

সেই ছন্দে আবেদ হোসেন লহরা বা লহর শোনাচ্ছেন। তা হল একক তবলা বাদনের তাল লয় ছন্দের এক ধারা-পদ্ধতি। সে রীতিতে লয়ের কত বৈচিত্র্যময় রূপ। কত বিভিন্নতার মধ্যেও একটি অখণ্ডতা। অজস্র বোলের বিস্তার হয়ে চলেছে। অথচ অন্তর্লীন রয়েছে মূল সূত্রটি। এত সবের মধ্যে অটুট আছে সিল্‌সিলা। অর্থাৎ পারম্পর্য। কোন্‌টির পর কোন্‌টি বাজবে তার সুসঙ্গতি।

এ এক অসাধারণ মুন্সিয়ানা। হিসাবের ভিত্তিকে অতিক্রম

করে অতিরিক্ত এমন কিছু, যার আবেদন যেন অনির্বচনীয়। এক এক অংশের পর মূল ছন্দের দোলা যথারীতি ফিরে আসছে। বাদ্যধারার ছন্দে ছন্দে দোলায়মান হয়ে উঠছে শ্রোতাদের অন্তর।

আবেদ হোসেনের তন্ময় নিমীলিত দৃষ্টি। আত্মসমাহিত তিনি। ছন্দলোকে তদ্গতচিত্ত। শ্যামবর্ণ কৃশ শরীর, মাঝারি আকার তাঁর। প্রৌঢ় বয়স। পরনে চুড়িদার পায়জামা পাঞ্জাবি। মাথায় লক্ষ্ণৌ টুপি। তার পাশে পিছনে বাব্‌রি-কেশে সাদা কালোর মিশ্রণ।

দরবারি আসনে জানু পেতে তিনি বাজিয়ে চলেছেন। হাত দুটি শুধু চঞ্চল, গতিময়। আর সারা শরীর স্থির, অকম্প। সুদীর্ঘকালের নিয়মনিষ্ঠ হস্তসাধন কৌশলের ফল।

আবেদ হোসেনের বাম হাতে বাজছে তবলা। আর ডান হাতে বাঁয়া। ছিমছাম মিঠে আওয়াজে অজস্র বোল উঠছে। লক্ষ্ণৌ ঘরানার ধেরেকেটে বোলের প্রাচুর্যে বিশেষত্বে শ্রোতারা বিমুগ্ধ।

সঙ্গীত সম্মিলনীর আসর খলিফার লহরায় তখন জমজমাট। সেই বৃহৎ কক্ষ শ্রোতায় পরিপূর্ণ।

এমন সময় নতুন একজন শ্রোতার আবির্ভাব হল।

আবেদ হোসেনেরই ধরনের চেহারা তাঁর। শ্যামাঙ্গ মেদবর্জিত নাতিদীর্ঘ শরীর। তবে বয়সে আরো প্রবীণ। তিনিও বাঙালী নন। তাঁর গায়ে ধূসর রঙের লম্বা কোট। পরনে ধুতি, কিন্তু কোঁচার ধরন অন্য রকমের। মাথায় কালো টুপীর দু পাশেই পক্ব কেশের আভাস। প্রায় বৃদ্ধবয়সী হলেও তাঁর শরীর বেশ শক্ত।

তিনি মঞ্চের দিকে আবেদ হোসেনের কাছে এগিয়ে গেলেন।

তাঁকে দেখে একটু চাঞ্চল্য জাগল শ্রোতাদের মধ্যে। তাঁরা বেশির ভাগই সঙ্গীত সম্মিলনীর সদস্য। আর তিনি হলেন এখানকার সর্বমান্য সঙ্গীতাচার্য। সম্মিলনীর সকলেই চেনেন তাঁকে।

রীতিমত শিক্ষাদানের জন্যে সম্মিলনীতে একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয় আছে। তিনি তাঁর ভারপ্রাপ্ত। তাছাড়া এখানে জলসায় তিনি হন

আসরপতি। সম্মিলনীর যাঁরা সদস্য, সম্মিলনীর আসরে যাঁরা আসেন, তাঁদের সবাইকার কাছেই তিনি ওস্তাদজী বলে সুপরিচিত। তাছাড়া বৃহত্তর সঙ্গীতজগতেও তাঁর একমাত্র পরিচিতি হিসেবেও 'ওস্তাদ' কথাটি তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে থাকে। তাই শ্রোতাদের মধ্যে শোনা গেল একটি অস্ফুট গুঞ্জরণ : লছমী ওস্তাদ।

অর্থাৎ লছমীপ্রসাদ মিশ্র। তিনি খাঁ সাহেবের তবলা লহরা শুনতে এসেছেন।

আবেদ হোসেনও জানতেন তাঁকে। এখন সামনে দেখে দস্তুরমত খাতির জানালেন। কারণ লছমী ওস্তাদ শুধু মহামানী গুণী নন। বয়োজ্যেষ্ঠ। আবেদ হোসেনের চেয়ে সাত-আট বছরের বড়। আর এমন নানামুখীন গুণের ওস্তাদ সারা ভারতে কজন আছেন? তিনি শুনতে এসেছেন বাজনা। তাই খাঁ সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্মান জানালেন।

লছমী ওস্তাদ হাসিমুখে আলিঙ্গন করলেন আবেদ হোসেনকে। তারপর দুজনেই আসন নিলেন।

এখন লছমীজীর অনুরোধে খাঁ সাহেব পুনরায় শুরু করলেন লহরা। হারমোনিয়ম বন্ধ ছিল না। তাই তখনি লয় ধরে নিলেন। দেখতে দেখতে আবার জমে উঠল লহরা।

লছমী ওস্তাদ মাথা দুলিয়ে তারিফ করতে লাগলেন। মাঝে মাঝেই মৃদু স্বরে জানালেন, 'বহোৎ আচ্ছা, বহোৎ আচ্ছা।'

খলিফা শিরোধার্য করে নিলেন ওস্তাদজীর আন্তরিক প্রশংসা। স্মিতমুখে বাজাতে লাগলেন। সমাহিত সেই মুখমণ্ডলে বিচ্ছুরিত হল অকথিত আনন্দের আভা। লছমী ওস্তাদের দিল্‌খোলা তারিফ। আবেদ হোসেন তার কদর বোঝেন বৈকি।

তাঁর লহরের ছন্দ ওস্তাদজীর উপস্থিতিতে আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। শ্রোতাদের অনেকেই তা অনুভব করলেন।

তারপর আসর মাত করে আবেদ হোসেনের লহরা শেষ হল

একসময়ে। লছমী ওস্তাদই তাঁকে সবচেয়ে সাবাস দিলেন। আর লক্ষ্ণৌয়ি বিনয়ে সেলাম জানালেন খাঁ সাহেব।

তারপর ওস্তাদজী আর এক রকমের তারিফ করলেন। বললেন যে, এমন চমৎকার বাজনা শুনে বাজাবার উদ্দীপন জেগেছে তাঁর মনে।

'আপ্‌কা ঝাঁপতাল সুন্‌ কর মেরা মেজাজ আ গয়ি।'

আবেদ হোসেন খুশি হয়ে জানালেন—বাঃ বাঃ, এ তো ভাল কথা। ওস্তাদজীর বাজনা শোনা যাবে।

সামনেকার শ্রোতারাও শুনতে পেলেন কথাটা। আর একটা আসরের জন্যে সবাই আশা করে বসলেন।

কিন্তু লছমী ওস্তাদ নিজের তবলা আনেননি তো। এখানে আজ তাঁর বাজাবার কথা নয়। প্রস্তুত হয়েও আসেননি সেজন্যে।

তাই তিনি আবেদ হোসেনের অনুমতি নিয়ে তাঁর তবলা বাঁয়া টেনে নিলেন। সুর একটু নেবে গিয়েছিল। ঠিকঠাক করে নিলেন ছোট্ট হাতুড়িটা দিয়ে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই বাজনা শুরু করলেন, তবলা বাঁয়ার জায়গা বদল করে। যথারীতি ডান হাতে তবলা ধরলেন। বাঁ হাতে বাঁয়া। খাঁ সাহেব তো ন্যাটা হাতে তবলা বাজিয়েছিলেন।

লছমী ওস্তাদ ওই ঝাঁপতালের লহরাই আরম্ভ করে দিলেন। অমনি এক মাত্রায় একটি স্বরে হারমোনিয়মের গৎও ঝাঁপতালে বাজতে লাগল।

খলিফা আবেদ হোসেনের মিষ্টি দুরন্ত হাতে এতক্ষণ বেজেছিল ঝাঁপতাল। আসরের হাওয়ায় এখনো তার ছন্দ ভরপুর হয়ে আছে। খাঁ সাহেবও সামনে বসে। লছমীজী এই তালেই শুরু করলেন কেন? এখনি ঝাঁপতাল ধরা হঠকারিতা হল না তো?

কোন কোন শ্রোতার মনে জাগল বৃদ্ধ ওস্তাদের সম্পর্কে এই আশঙ্কা। কেউ আবার সন্দেহ করলেন আবেদ হোসেনের সঙ্গে উনি লড়তে চান নাকি? না হলে একই তাল ধরলেন কেন?

কিন্তু আবেদ হোসেনের মনে হয়ত সে ভাব হয়নি। লছমী ওস্তাদকে দেখে বোঝা যায়, শিল্পীপ্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত বাদনের আবেগ। খাঁ সাহেবের মনে হল, তাঁরই বাজনা আর এক শিল্পীর মনে ছন্দোবন্ধের প্রেরণা দিয়েছে। অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই প্রবীণ গুণীর।

বাজনা ক্রমেই এগিয়ে চলল আপন স্বচ্ছন্দ পথে। আর শ্রোতাদের সব সন্দেহ আশঙ্কা ওস্তাদজা নস্যাৎ করে দিলেন। দস্তুরমত লহরার কাজ দেখাতে লাগলেন একেবারে তৈরি হাতে। তাঁর বাজনার বহর দেখে বয়সের কথা আর কারুর মনে হল না।

আসরের অনেকে আবার অবাক হলেন তাঁকে তবলা বাজাতে দেখে। কারণ তাঁরা তাঁকে গায়ক বলেই জানতেন। কিংবা বীণ্‌কার। আর শুধু বাজানো নয়, তবলাতেও যে একেবারে সাধা ওস্তাদী হাত।

রীতিমত উঠান্‌ দিয়ে লছমী ওস্তাদ লহরা আরম্ভ করেছিলেন। তারপরেই ধরলেন ঠেকা।

অভিজ্ঞ শ্রোতারা লক্ষ্য করছিলেন। ওস্তাদজী লয়ের বৈচিত্র্য দেখাচ্ছিলেন নানারকমে। কিন্তু সিল্‌সিলা ঠিক রেখেছেন। উঠান আর ঠেকার পর শোনালেন ফরাসবন্দী।

লহরার যেমন পরম্পর্য থাকা নিয়ম, ঠিক পর পর বাজতে লাগল। অসমান বিভাগের এই ঝাঁপতালে লছমীজীও দেখাতে লাগলেন কত ছন্দ-চাতুর্য। অথচ যথাবিধি বাদন।

ফরাসবন্দীর পর পেশকার দেখালেন। কায়দা বাজালেন। গৎ টুকরা সব নিয়মমাফিক। তারপর টুকরার পরেই এমন এক বিরাট চক্রদার তেহাই দিলেন যে আসর উল্লসিত হয়ে উঠল সমে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু চক্রদার তেহাই মেরেও লছমীজী শেষ করলেন না। চক্রদার দিয়েই সমাপ্ত করেন অনেক লহরাবাদক। তিনি তারপরেও বাজালেন—রেলা। আবার রেলার পর লগ্‌গি।

এবার আবেদ হোসেনের সাবাস দেবার পালা। তিনি তা ভাল করে দিলেনও।

ঝাঁপতালের লহরায় যত ছন্দবৈচিত্র্য আর লয়কারী দেখানো সম্ভব সবই করলেন লছমী ওস্তাদ। আর মাৎ করা আসরকে আবার নতুন করে মাতিয়ে দিলেন—যা অতি কঠিন ব্যাপার। বিশেষ, আবেদ হোসেনের তুল্য তবলিয়ার বাজানো তালেই বাজিয়ে আসর জমানো!

বাজনা শেষ হতেই প্রশংসার উচ্ছ্বাস জানালেন অনেক শ্রোতা। আর বোদ্ধারা একটা ব্যাপার ঠিক বুঝলেন। আবেদ হোসেনের অমন বাজনার ছাপও মুছে গেছে লছমী ওস্তাদের লহরায়।

এ যে কতখানি কৃতিত্ব তার ব্যাখ্যা সকলের কাছে করা যায় না। অথচ কোন লড়াইয়ের ভাব দেখা দেয়নি। লছমীজীর আচরণে আবেদ হোসেনেরও মনে জাগেনি কোন ক্ষোভ। না। কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রকাশ নয় লছমী ওস্তাদের বাজনা।

পারস্পরিক সৌহার্দ্যের মধ্যেই সম্মিলনীর আসর শেষ হল।

লছমীজীর প্রতিভার একটিমাত্র পরিচয় সেদিন পাওয়া যায় সঙ্গীত সম্মিলনীতে। কিন্তু তাঁর সঙ্গীতজীবন অসামান্য বহুমুখীন। এবং তাই তাঁর লোকোত্তর বৈশিষ্ট্য। তেমন উদাহরণ ঘরোয়াভাবেও বিশেষ দেখা যেত না। আসরে তো নয়ই।

সেদিন লছমী ওস্তাদ যেমন তবলা লহরা শুনিয়েছিলেন, তেমনি কোন আসরে হয়ত তুলতেন বীণায় ঝঙ্কার। সিদ্ধ বীণ্‌কার বেশে ভারী ভারী রাগের আলাপচারি বাজাতেন। তারপরণ শোনাতেন সেরা পাখোয়াজীদের সঙ্গতে। আবার কোন আসরে নিপুণ হাতে সেতার বাজাতেন। আলাপ গৎ তোড়া ঝালায় সম্পূর্ণ তাঁর সেতার বাদন।

কণ্ঠসঙ্গীতের আসরে আরো বিচিত্রগামী লছমীজী। একাধারে

ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা টপ্‌খেয়াল গায়ক ছিলেন তিনি। আর সেই সব বিভিন্ন রীতির সৌন্দর্য ও বাণার গানে গুণী।

ধ্রুপদীরূপে যেমন তাঁর রাগবিদ্যায় পাণ্ডিত্য, তেমনি গায়নক্ষমতা ছিল। যে দরবারী কানাড়ায় অধিকার গুণপনার পরীক্ষা-স্থল, সে রাগে তিনি ছিলেন সিদ্ধ। নানা রাগেই যোগ্য মর্যাদায় তিনি আসরে ধ্রুপদ গাইতেন। সর্ব অলঙ্কারে সমৃদ্ধ হত তাঁর ধ্রুপদ গান।

ধামারও তিনি শোনাতেন উপযুক্ত বাঁটের মুন্সিয়ানা সহযোগে।

লছমী ওস্তাদের সঙ্গীত-কণ্ঠও ভালই ছিল। বেশ দরাজ গলায় গান গাইতেন আসরে। তান বিস্তারে কিছু কমতি ছিলেন না।

আর টপ্পা তো তাঁদের ঘরে বিশেষ চর্চার বস্তু ছিল। যত রাগে টপ্পা গান গাওয়া সম্ভব সে সবই ছিল তাঁর সংগ্রহে। আসরেও তিনি টপ্পা গাইতেন। টপ্পার দানা সুন্দর খুলত তাঁর গলায়।

তা ছাড়া আরো কয়েক রীতির গানের সংগ্রহ ও অভিজ্ঞতা তাঁর যথেষ্ট ছিল। যেমন হোরি দাদরা ও ঠুংরি। এসব গান তিনি আসরে গাইতেন না। কিন্তু কেউ শিখতে চাইলে শেখাতেন ভালভাবে।

আর টপ্‌খেয়াল রীতি ছিল তাঁর বড় প্রিয়। খেয়ালের তানের সঙ্গে টপ্পার অলঙ্কার চমৎকার শোনাতেন। তাঁর টপ্‌খেয়াল ছিল খাম্বাজ পিলু ভৈরবী থেকে ইমন সাহানা ইত্যাদি নানা রাগে।

লছমী ওস্তাদের টপ্‌খেয়ালের উত্তরাধিকার তাঁর পুত্র হরিদাসও পেয়েছিলেন। আর হরিদাসের এক ছাত্রী হন কৃষ্ণভামিনী। কৃষ্ণভামিনীর অবশ্য আরো দুজন বড় শিক্ষক ছিলেন। ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর মিশ্র ও তাঁর কনিষ্ঠ কালী ওস্তাদ। তাঁদের মধ্যে লছমী-পুত্রের কাছে কৃষ্ণভামিনী শিখেছিলেন আগে। বাংলার একজন শীর্ষস্থানীয় টপ্‌খেয়াল গায়িকা বলে কৃষ্ণভামিনী বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর গ্রামোফোন রেকর্ডের বাংলা গান বেশীর ভাগই টপ্‌খেয়াল অঙ্গের। মনে হয় কৃষ্ণভামিনীর টপ্‌খেয়াল চালের উৎস ছিলেন তাঁর

অন্যতম ওস্তাদ হরিদাস মিশ্র, যিনি তাঁর পিতা লছমী ওস্তাদের কাছেই এই রীতির তালিম পান।

সমগ্রভাবে, সেকালের সঙ্গীতজগতে এক বিস্ময় ছিলেন লছমীপ্রসাদ মিশ্র। একাধারে এত বিভিন্ন যন্ত্রে ওস্তাদী হাত এবং নানা রীতির সঙ্গীতে দিক্‌পাল গায়ক সর্বকালেই দুর্লভ। কারণ ভারতীয় সঙ্গীত এক এক রীতিতে বিশেষজ্ঞ হয়েই সাধনার বস্তু। অর্থাৎ এক এক গুণী সচরাচর একেকটি যন্ত্র কিংবা একটি রীতির গানের মাধ্যমেই চর্চায় সাধনায় জীবন অতিবাহিত করে দেন। একাধিক মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না—এমন গভীরতা ও বিস্তার রাগ সঙ্গীতের। বেশি মাধ্যম ক্ষতিকর হতে পারে বরং। তাই সঙ্গীত-জীবীকে একটি মাধ্যমেই সেই বিচিত্র ঐশ্বর্যের সন্ধানী হতে দেখা যায়।

কিন্তু সকল নিয়মেরই আছে ব্যতিক্রম। লছমী ওস্তাদ সেই ব্যতিক্রমের একটি আদর্শ উদাহরণ। তাঁকে যখন যে রীতির গায়ক বা যে যন্ত্রের বাদকরূপে দেখা যেত শ্রোতার মনে হত তিনি এই গানে কিংবা এই যন্ত্রসঙ্গীতেই একান্ত সাধন করেছেন।

কলকাতার আসরে আসরে ওস্তাদী দেখিয়ে গেছেন বটে লছমী-প্রসাদ। কখনো ধ্রুপদী। কখনো খেয়াল গায়ক। কখনো বা টপ্পা কিংবা টপ্‌খেয়াল গুণী। কোথাও বীণকার। কোথাও সেতার শিল্পী। কোথাও তবলাবাদক।

তাঁর এক একটি খণ্ড পরিচয়কেও ওস্তাদ আখ্যা দেওয়া যায়। কারণ তাঁর তুল্য গায়ক কিংবা বীণকার কিংবা সঙ্গতকার হয়েও ওস্তাদ নামে পরিচিত হতে পারতেন যে কোন গুণী। লছমী-প্রসাদকে তাই শুধুমাত্র ওস্তাদ বললে যেন পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। তিনি ওস্তাদের ওস্তাদ। সঙ্গীতের এক অবতার বিশেষ।

ঘরেও এমনি বিচিত্রের সাধকরূপে তাঁকে দেখা যেত। কখনো ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা কিংবা টপ্‌খেয়ালের চর্চায় নিমগ্ন। কখনো

বসেছেন বীণা নিয়ে। কখনো ধরেছেন সেতার। কখনো তবলা বাজাচ্ছেন। সঙ্গীতের নিরলস সাধন-জীবন তাঁর।

লছমীজীকে শিক্ষকরূপেও পাওয়া যেত সামগ্রিকরূপে। বিভিন্ন রীতির কণ্ঠসঙ্গীতে ও পৃথক যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁর শিষ্যমণ্ডলী গঠিত হয়েছিল।

মিশ্রজীর শিক্ষকজীবনও বেশির ভাগ কলকাতায় দেখা যায়। যদিও তাঁর শিষ্যরা সকলেই বাঙালী নন। তিনি বীণায় তালিম দিয়েছিলেন ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর (শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৌত্র) ও পুত্র হরিদাসকে।

তাঁর কাছে তবলা শিখে শ্যামাচরণ মিশ্র ও বুন্দি মিশ্র (ওস্তাদ গৌরীশঙ্করের জ্যেষ্ঠ ও চতুর্থ অনুজ) ওস্তাদ তবলাবাদক হয়েছিলেন।

খগেন্দ্রনাথ পাল (পচা পাল নামে সুপরিচিত) তাঁর আর এক কৃতী তবলিয়া শিষ্য। দিবারাত্র গুরুর কাছে থেকে, তাঁর সেবা করে খগেন্দ্রনাথ হন উৎকৃষ্ট তবলাবাদক।

বাংলার স্বনামপ্রসিদ্ধ গুণী অনাথনাথ বসুও অনেক বছর তবলায় তালিম পান লছমীজীর কাছে। পরে অনাথনাথ দিল্লীর নূর মহম্মদ ও মীরাটের মহম্মদ সফির কাছেও তবলা শিখেছিলেন বটে। কিন্তু লছমী ওস্তাদের সাত-আট বছরের তালিমই বেশী ছাপ রাখে অনাথনাথের তবলাবাদনে।

লছমীজী পূর্ণিয়ার রাজা নিত্যানন্দ সিংকে সেতার শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ধ্রুপদে তাঁর উপযুক্ত শিষ্য হন পুত্র হরিদাস। লছমী ওস্তাদের এই একমাত্র পুত্র যে কত বড় কলাবত হয়েছিলেন তা দেখা যায় আহিরীটোলার সে আসরে। সেদিন পাখোয়াজী মদনমোহন মিশ্র……। সে আশ্চর্য ঘটনাটি বলা যাবে শেষে। এখন লছমীজীর আরও শিষ্যদের কথা আছে।

সুপরিচিত খেয়াল-গায়ক অনাথনাথ বসু যত বছর তাঁর কাছে তবলা শেখেন তত বছর খেয়ালও শিখেছিলেন। অর্থাৎ সাত-আট বছর। লছমীজীর বহু খেয়াল শিক্ষা ও সংগ্রহ করেছিলেন অনাথনাথ। আর সেই সঙ্গে কিছু টপ্‌খেয়ালও, যদিও আসরে কখনো টপ্-খেয়াল গাইতেন না। অনাথনাথ খেয়াল বিষয়ে আরো নানা গুণীর কাছেও উপকৃত। কিন্তু খেয়াল গায়ক হিসেবে তাঁর মূল ভিত্তি ছিল লছমীজীর তালিম।

ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (ধ্রুপদীরূপেই পরিচিত এবং ধ্রুপদে মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখের শিষ্য) টপ্পার তালিম নিয়েছিলেন লছমী ওস্তাদের কাছে।

বড়বাজারের বিনায়ক মিশ্র ছিলেন তাঁর আর এক শিষ্য। লছমী ওস্তাদের কাছে তিনি খেয়াল ও টপ্পার তালিম নিয়েছিলেন।

হাওড়া-রামকৃষ্ণপুরের শ্যামাচরণ বসুও ছিলেন তাঁর খেয়াল টপ্পায় শিষ্য।

গ্রে স্ট্রীটের যোগেশচন্দ্র ঘোষ ওস্তাদজীর কাছে খেয়াল শিখতেন।

পাঁচুগোপাল অর্ণব এবং বাঁশতলা লেনের মদনমোহন মিশ্রও তাঁর সঙ্গীতশিষ্য ছিলেন।

বিখ্যাত সারঙ্গবাদক ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর মিশ্রও লছমী ওস্তাদের কাছে ঋণী ছিলেন নানা রীতির গানের জন্য।

তা ছাড়া ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মেলনীতে দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষক। আর প্রতিভা দেবী পরিচালিত সঙ্গীত সঙ্ঘেরও এক বিশিষ্ট শিক্ষক এবং পরীক্ষার বিচারক। এই দুই সংস্থাতেই তিনি নানা প্রকার কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে বহু ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

যেমন নানামুখীন প্রতিভাধর গুণী, তেমনি কৃতী শিষ্যগোষ্ঠী গড়েছিলেন লছমীজী। কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে এই যুগ্মরূপে বহু

মানের আসন তাঁর ছিল। গায়ক ও যন্ত্রীরা সকলেই তাঁকে মান্য করতেন যথার্থ সঙ্গীতাচার্য বলে।

কিন্তু কোন বিরাট প্রতিভা অকস্মাৎ সৃষ্টি হয় না। তা বিকশিত হয় সে প্রতিভার আধারের দীর্ঘকালের নিরলস সাধনায় ও শ্রমে। সেই সঙ্গে অনেক সময় অদৃশ্য পশ্চাৎপটে পূর্ব-সংস্কারও ক্রিয়া করে যায়। এই দুই ধারার সম্মেলনে গঠিত হয় লছমী ওস্তাদের সঙ্গীত জীবন।

একথা মিথ্যা নয় যে অক্লান্ত অধ্যবসায় ও শিক্ষায় তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেন। তেমনি সত্য—তিনি ছিলেন এক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। সুপ্রসিদ্ধ প্রসদ্দু মনোহর ঘরানাদার এবং বংশানুক্রম লছমী প্রসাদ মিশ্র।

বিভিন্ন ধারায় সঙ্গীতচর্চা এবং তালাধ্যায়ে মুন্সিয়ানা নানা-প্রকার যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতের একাধারে সাধনা এই ঘরানাকে বিশিষ্ট, বিখ্যাত করেছিল। উত্তর ভারতের এটি এক শ্রেষ্ঠ ও বহু পরিচিত ঘরানা। তার কিছু ইতিবৃত্ত এখানে দেওয়া যায়।

বারাণসীর এক কত্থক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান মনোহর ও হরিপ্রসাদ মিশ্র। হরিপ্রসাদ সংক্ষেপে প্রসদ্দু নামে কথিত হতেন। দুই সহোদর তাঁরা। মনোহর জ্যেষ্ঠ।

তাঁদের দুজনের সঙ্গীতচর্চা এমন এক ধারা প্রবর্তন করে যে দুই ভ্রাতার যুগল পরিচয়ে একটি ঘরানার নাম হয়ে যায়। অনুজ প্রসদ্দুর নাম প্রথম স্থান নেয় বেশী প্রতিভাবান ও প্রসিদ্ধতর হওয়ার জন্যে। তাঁদের কনিষ্ঠতম ভ্রাতা বিশ্বেশ্বরের নাম এই ঘরানায় যুক্ত নেই।

কাশীতে এ বংশের আদি নিবাস ছিল ৯৮ সেনপুরার কোঠিতে। মনোহর ও হরিপ্রসাদের পিতা ঠাকুরদয়ালও গায়ক ছিলেন।

ঠাকুরদয়ালের পিতামহ দিলারাম মিশ্র এই বংশের বাস পত্তন করেন বারাণসীতে। দিলারাম তাঁর আদি নিবাস বৃন্দাবন থেকে কাশীবাস করতে এসেছিলেন। তা হল আঠারো শতকের প্রায়

মাঝামাঝি সময়ের কথা। তখন থেকেই এ পরিবারের বারাণসীতে বাস।

দিলারামেরও কয়েক পুরুষ আগেকার নাম পাওয়া যায় এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন সঙ্গীতসেবী। কিন্তু অত পূর্ব বৃত্তান্তের এখানে প্রয়োজন নেই। শুধু বক্তব্য—দিলারাম, তাঁর পুত্র জগমন এবং জগমনের পুত্র ঠাকুরদয়াল এই তিন পুরুষও ছিলেন গায়ক।

দিলারামের পৌত্র ঠাকুরদয়ালের তিন পুত্র। মনোহর হরিপ্রসাদ (প্রসদ্দ্) এবং বিশ্বেশ্বর।

গায়ক ঠাকুরদয়াল তিন পুত্রকেই সঙ্গীতশিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ বিশ্বেশ্বরের নাম অগ্রজদের তুল্য স্থায়ী হয়নি সঙ্গীত-জগতে।

শোনা যায় দিল্লীর কোন কলাবন্ত সেতারীর কাছে তিনি শিখেছিলেন সেতার। বিশ্বেশ্বরের কণ্ঠসঙ্গীতের কথা বিশেষ জানা যায় না। মিশ্র বংশে সেতারের চর্চা এই প্রথম। তবে তাঁর কাছে এ বংশে কেউ সেতার শিক্ষা করেন কিনা জানা যায়নি।

বিশ্বেশ্বর পরে বিষয়সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত হন। আর মনোহর ও হরিপ্রসাদ আত্মনিয়োগ করেন সঙ্গীতে। এই দুজনের নামই অসামান্য সঙ্গীতগুণের গৌরবে স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রসদ্দ্ মনোহরের নাম কীর্তিত হয়েছে একটি পৃথক ঘরানায়।

মনোহর ও হরিপ্রসাদের সঙ্গীতজীবন অনেক সময়েই অঙ্গাঙ্গী ছিল। তাঁদের যুগ্ম সঙ্গীতচর্চার কথা একসঙ্গে বর্ণনীয়। কিন্তু স্থানাভাবে এখানে তা সম্ভব নয়। প্রসদ্দ্‌র বিবরণ দেওয়া হবে ভিন্ন খণ্ডে শিব-পশুপতির অধ্যায়ে।

এখানে মনোহরের ধারা প্রসঙ্গ। কারণ এই অধ্যায়ের নায়ক লছমীপ্রসাদ হলেন মনোহরের পৌত্র।

১৭৯৪ সালে বারাণসীতে মনোহরের জন্ম। আর মৃত্যু হয় ১৮৭৪ সালে, ৮০ বছর বয়সে। তিনি নেপালের প্রধানমন্ত্রী স্যর জং

বাহাদুরের দরবার ও পাতিয়ালা মহারাজার দরবারে অনেক দিন সসম্মানে ছিলেন। নবাব ওয়াজেদ আলীর লক্ষ্ণৌ দরবারেও থাকেন কিছুদিন।

মনোহর মিশ্র পরিণত বয়সে কলকাতায়ও বাস করেছিলেন। তখন থেকেই তাঁর বংশের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক।

জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বলরাম দে স্ট্রীটে মনোহর ছিলেন কিছুকাল। পরে তাঁর পুত্র রামকুমারও এখানে থাকেন। লছমী ওস্তাদও দীর্ঘকাল বাস করে গেছেন এই অঞ্চলেই।

মনোহর মিশ্রের সময় থেকেই এ বংশের সঙ্গে বাঙালী গুণীদের যোগাযোগেরও সূত্রপাত। যদু ভট্টের সঙ্গীতগুরু এবং কলকাতার আদি ধ্রুপদী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের (জন্ম ১৮০৮) সঙ্গে মনোহরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

এই সম্পর্ক স্থায়ী হয় তাঁদের বংশানুক্রমে। মনোহরের পুত্র রামকুমারের শিষ্য হয়েছিলেন গঙ্গানারায়ণের পৌত্র তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায় (বেহালাবাদক ও গায়ক)। রামকুমারের দ্বিতীয় পুত্র কেশবদাসের সঙ্গেও তুলসীদাসের সাঙ্গীতিক যোগাযোগ ছিল।

বলতে গেলে, তাঁদের চার পুরুষের সঙ্গে কলকাতার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে।

মনোহর অস্থায়ীভাবে বাস করেন কলকাতায়। কিন্তু তাঁর পুত্র রামকুমার অনেককাল এ শহরের বাসিন্দা ছিলেন। তারপর লছমী ওস্তাদ তাঁর সঙ্গীতজীবনের সুদীর্ঘকাল আমৃত্যু ছিলেন কলকাতা নিবাসী। তেমনি এই ধারায় গোবিন্দদাস কেশবদাস হরিদাস সকলকেই কলকাতাবাসী বলা যায়, কাশীর সঙ্গে সম্পর্ক সত্ত্বেও।

মনোহর ধ্রুপদী ছিলেন বংশের ধারায়। কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমার ধ্রুপদের সঙ্গে খেয়াল এবং টপ্পারও সাধনা করেন। উপরন্তু বীণাবাদনও। এই ধারায়, সঙ্গীতচর্চায় বহুমুখীনতা রামকুমারের দৃষ্টান্তেই আরম্ভ হয়।

মনোহরের সময় থেকে নেপাল দরবারের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ। সেই সূত্রে রামকুমারও চোদ্দ বছর নেপালে ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর পুত্র জেনারেল মুখিয়ার সঙ্গীতসভায় থাকেন রামকুমার। তারপর পরিণত বয়সে কাশীতে কিছুকাল বাসের পর কলকাতায় স্থায়ী হন।

এখানে জীবনের শেষ পর্যন্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের সঙ্গীতসভায় নিযুক্ত ছিলেন রামকুমার। বছরের পর বছর তিনি সম্মানিত ওস্তাদ হয়ে কলকাতায় বসবাস করেন। আর ফলে এখানে গড়ে ওঠে তাঁর বিরাট শিষ্যমণ্ডলী।

বাংলার সঙ্গীতজগতে রামকুমার মিশ্রের দান কতখানি তা তাঁর শিষ্যদের নাম থেকেই ধারণা করা যায়। (এখানে উল্লিখিতদের কেউ কেউ অন্য ওস্তাদের শিক্ষাও অবশ্য পেয়েছিলেন, যেমন হয়ে থাকে।)

রামকুমারের কাছে শেখেন—চন্দননগর-গোন্দলপাড়ার কিন্নরকণ্ঠ টপ্পাগায়ক মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়। মহেশ ওস্তাদ নামে সুপরিচিত টপ্পাগুণী মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বহুমুখী প্রতিভা লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী (ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ঠুংরি গায়ক এবং বাণা পাখোয়াজ তবলা ইত্যাদি যন্ত্রের বাদক)। ভাগলপুরের খেয়াল ও টপ্‌খেয়ালগুণী সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। বাংলার শ্রেষ্ঠা বাইজীদের দুজন—সুরমা ও কিরণময়ী। গঙ্গানারায়ণ-পৌত্র তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়। শ্যামনগরের চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গোয়াবাগানের নিবারণ কথক। পাথুরিয়াঘাটার কালিপ্রসন্ন ঘোষ। গ্রে স্ট্রীটের যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি।

তা ছাড়া, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গেও সঙ্গীতাচার্যরূপে রামকুমার মিশ্রের যোগাযোগ ছিল। মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবী ও পুত্র হিতেন্দ্রনাথের নামও রামকুমারের শিষ্য তালিকায় গণনীয়। প্রতিভা ও হিতেন্দ্র বাল্যকালে শিক্ষা করেন রামকুমারের কাছে।

কলকাতায় সঙ্গীতসমাজে আচার্য-স্থানীয় রামকুমার গায়ক হিসাবেও ছিলেন অতি সুকণ্ঠ। তাঁর শেষ জীবন পরম গৌরবে কলকাতাতেই অতিবাহিত হয়।

রামকুমারের তিন পুত্র—গোবিন্দদাস, কেশবদাস ও লছমীপ্রসাদ। প্রথম দুজনও গায়করূপে শক্তির পরিচয় দেন। তবে কনিষ্ঠ লছমীপ্রসাদই স্বনামধন্য হন বহুমুখী প্রতিভায়।

লছমীজীর জীবনকথা এখানে সংক্ষেপ দেওয়া হল।

বারাণসীতে ১৮৬০ সালে লছমীপ্রসাদের জন্ম। তিনি যখন শিশু, তাঁর পিতা রামকুমার দীর্ঘকালের জন্যে নেপালে যান।

লছমী বাল্যজীবনে কাশীতেই বাস করতেন। রামকুমার এক আত্মীয়কে পুত্রের সঙ্গীত শিক্ষার ভার দিয়েছিলেন।

চোদ্দ বছর নেপাল দরবারে নিযুক্ত থাকেন রামকুমার। সেই দীর্ঘ প্রবাসের সময় মাঝে মাঝে তিনি কাশীতে আসতেন। তখন লক্ষ্য রাখতেন লছমীর তালিম কেমন হচ্ছে।

লছমী তখন নেহাৎ বালক। তবু এই পুত্রের ওপরেই রামকুমার বেশি আশা রেখেছিলেন। কারণ তিনি কেমন বুঝেছিলেন, বংশের নাম রাখবে এই কনিষ্ঠটি। তাই লছমীকে তাঁর নিজের কাছে রেখে শেখাবারই ইচ্ছা ছিল।

কিন্তু নেপালের সেই প্রচণ্ড শীতে, তার ওপর বিদেশে ছেলেমানুষকে রাখা বড়ই অসুবিধা। তাই লছমীকে এক আত্মীয়ের তালিমে কাশীতে রেখেছিলেন। গলাটা এ সময়ে তৈরী হোক। তারপর ভাল করে গড়ে নেবেন আর একটু বড় হলে। এই ভেবেছিলেন। এমনিভাবে কয়েক বছর গেল।

রামকুমার সেবার এলেন ক'বছর পরে। লছমীকে ডেকে তার গান শুনলেন। পরীক্ষা করলেন তার কণ্ঠ। কিন্তু একেবারেই হতাশ হলেন।

কি আশ্চর্য! গলা সাধা তো কিছুই হয়নি। ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ

করে জেনে নিলেন তালিমের সব কথা। বুঝতে পারলেন, যাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি আপনার জন হয়েও ফাঁকি দিয়েছেন। হয়তো ইচ্ছা করেই ঠিক রীতিতে সাধাননি লছমীকে।

রামকুমার সে জ্ঞাতিকে আর কিছু বললেন না।

সেবার বেশ কিছুদিন রয়ে গেলেন কাশীতে। আর প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজে শেখাতে লাগলেন লছমীকে। একান্তে। তাও সেনপুরার সে বাড়িতে নয়।

পুত্রকে নিয়ে সকাল-বিকেল কোঠি থেকে বেরিয়ে যেতেন। অনেক দূরে। একেবারে লোকালয় পার হয়ে খোলা মাঠে। গলা খুলে লছমীকে সেখানে সাধতে হত। দস্তুরমত নিয়মে লছমী কণ্ঠসাধনা করতেন। ধ্রুপদের আলাপচারি শেখাতেন রামকুমার। তাছাড়া, পাল্টা ইত্যাদিও অক্লান্তভাবে রিয়াজ করাতেন। তালিম দিতেন লয়কারীর নানা জটিল রীতিনীতি।

এতদিনে লছমী ঠিক পথ পেলেন। সহজাত প্রতিভা তাঁর। এবার দ্রুত শিখতে লাগলেন। আরো কিছুদিন পরে রামকুমার যথাবিধি নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন নেপালে।

কিন্তু সেখানে এবার আর বেশিদিন রইলেন না। বয়সের সঙ্গে অত শীতও আর সহ্য হচ্ছিল না। কনিষ্ঠ পুত্রকে তৈরী করেও দিতে হবে।

এইসব কারণে জেনারেল মুখিয়ার দরবারী ওস্তাদের কাজ ত্যাগ করে রামকুমার ফিরে এলেন কাশীতে। লছমীকে উপযুক্ত করে গড়ে নিতে লাগলেন। একই সঙ্গে কণ্ঠে ও যন্ত্রে। গানের সঙ্গে আরম্ভ করলেন বীণের তালিম। অসাধারণ আধারে অসাধারণ শিক্ষাধারা যুক্ত হল।

দিনরাতের অধিকাংশ সময় লছমীর রিয়াজে চলে যায়। একই সঙ্গে ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পার সাধন। আবার বীণা আর তবলার সঙ্গে সেতারও। সব শিক্ষাসাধনা একযোগে চলতে লাগল। বিকশিত হতে লাগল লছমীপ্রসাদের বহুমুখী প্রতিভা।

রামকুমার কাছে রেখে তাঁকে শেখাতে লাগলেন। লছমীপ্রসাদ যেমন মেধাবী তেমনি পরিশ্রমী। পিতার নির্দেশ অনুসারে অক্লান্ত সাধনা করতে লাগলেন।

এমনিভাবে পিতাপুত্রের দিন অতিবাহিত হতে লাগল কাশীতে। যথাসময়ে লছমী ঠিক তৈরি হয়ে উঠলেন, যেমনটি রামকুমারের আশা ছিল। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা সবরকম গানেই উপযুক্ত হলেন। আর পিতার মতন বীণায় বিশেষ দক্ষ।

রামকুমার বিবেচনা করলেন, লছমী এবার পেশা আরম্ভ করতে পারে। নির্ভরতার জন্যেও তা প্রয়োজন। আর চর্চারও তাতে শ্রীবৃদ্ধি।

এইভাবে পুত্রের শিক্ষা অগ্রসর করে নিয়ে রামকুমার কলকাতায় স্থায়ী হলেন।

ওদিকে লছমীপ্রসাদ প্রবেশ করলেন পেশাদারী জীবনে। কাশীর নিকটেই জৌনপুরের দরবারে প্রথমে নিযুক্ত হলেন। জৌনপুরের রাজা দরবারী শিল্পী বলে বড়ই সমাদর করতেন লছমীকে। এখানেই লছমীপ্রসাদ গুণগ্রামের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রথম স্বর্ণপদক পুরস্কার পান।

জৌনপুরে ক'বছর থেকে লছমীপ্রসাদ যোগ দিলেন পূর্ণিয়ার দরবারে। পূর্ণিয়ার রাজা নিত্যানন্দ সিংও তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। গুরুর মর্যাদাও এ রাজ্যে প্রথম পেলেন লছমীজী। রাজা নিত্যানন্দ সিং তাঁর কাছে সেতার শিখতে লাগলেন।

পূর্ণিয়ায় কয়েক বছর বাসের পর লছমীজী পশ্চিমাঞ্চল ত্যাগ করলেন। চলে এলেন বাংলার সঙ্গীতজগতে। কলকাতায়।

সঙ্গীতচর্চাকে জীবনের বৃত্তি ও অবলম্বন করতে হলে কলকাতার কথা অনেক কলাবতের মনে আসেই। সঙ্গীতের এত শিক্ষার্থী, এমন আনুকুল্য, সঙ্গীতসেবীদের এত পৃষ্ঠপোষকতা উত্তর ভারতে আর কোথায়? লছমীপ্রসাদেরও কলকাতায় সঙ্গীতজীবন যাপন করার কথা মনে হল স্বভাবতই। তা ছাড়া, পিতা রামকুমার মিশ্র

এখানে ক্ষেত্র রচনা করে রেখেছিলেন। তিনিও এখন বিগত। পেশাদার জীবনযাপন করতে লছমীপ্রসাদ এলেন কলকাতায়।

পরিণত যৌবনেই লছমীজী কলকাতায় সঙ্গীতসমাজে এসে যুক্ত হলেন। রামকুমার মিশ্র যে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের সঙ্গীতসভায় নিযুক্ত ছিলেন, সেখানে আশ্রয় পেলেন তিনিও। আর, জোড়াসাঁকো অঞ্চলেই সেই বলরাম দে স্ট্রীটের পাশে সাগর ধর লেনে বাস করতে লাগলেন।

গুণের কদর করে কলকাতা। এত বড় গুণী লছমীপ্রসাদ, কলকাতাতেই প্রতিভার যোগ্য ক্ষেত্র পেলেন।

নানা জন এলেন শিক্ষার্থী হয়ে। আসরের পর আসরে লছমীজী মুজরো করতে লাগলেন। কোথাও ধ্রুপদ গাইতেন। কোথাও খেয়াল টপ্পা টপ্‌খেয়াল। কখনো বীণকাররূপে দেখা দিতেন। কখনো সঙ্গত করতেন তবলায়। সব রীতির গানে আর বীণায় তবলায় সেতারে ছাত্রছাত্রীদের শেখাতেন।

কলকাতায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ আসরেই লছমী ওস্তাদ যোগ দিতেন। বিশেষ করে উত্তর কলকাতায় শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে, দুনিয়ালাল শীল ও পরে হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল ভবনে, হর-কুটীরে, সঙ্গীত-মিত্রালয় প্রভৃতি আসরে। দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর আসর সবচেয়ে বেশি হত ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনীতে। তারপর প্রতিভা দেবী পরিচালিত সঙ্গীত সঙ্ঘে।

কলকাতায় নিয়মিত আসর ও সঙ্গীত-চর্চার বনিয়াদী সংস্থা ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনী। দীর্ঘকাল লছমীজী সেখানকার সঙ্গীত শিক্ষাদানের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিখ্যাত সঙ্গীত সঙ্ঘের বিশিষ্ট শিক্ষক ও পরীক্ষার বিচারকও হতে হয় তাঁকে।

কলকাতায় প্রথম বেতার প্রতিষ্ঠান আরম্ভ হল সেই ১৯২৭ সালে। আর লছমী ওস্তাদের বীণাবাদন বেতার শ্রোতারা তখন থেকেই শুনতেন।

কলকাতার সঙ্গীতসমাজের সঙ্গে লছমীজী নানাভাবে একাত্ম হয়ে বিরাজ করতেন। শান্ত মধুর ব্যক্তিত্বের জন্যেও সকলের প্রিয় তিনি। নম্র, নির্বিরোধী, গরিমা-বর্জিত বলেই সবাই তাঁকে জানতেন।

স্বভাব চরিত্রের জন্যে সকলকার শ্রদ্ধাভাজন। তাই নানা সম্ভ্রান্ত পরিবারে সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন ওস্তাদজী। তিনি বাঙালীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন। বেশির ভাগ শিষ্যসেবকই তাঁর বাঙালী। পৃষ্ঠপোষকরাও বেশির ভাগ বাঙালী। আর যৌবনকাল থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত বাঙালী সমাজের মধ্যেই কলকাতায় বাস করেছিলেন।

এইসব সূত্রে তিনি বাংলা বেশ শিখেছিলেন। বাংলা ভাল বলতে যেমন পারতেন, তেমনি পড়তেও। বাংলা স্বরলিপি ইত্যাদি কিছু কিছু লিখতেনও।

কলকাতার সঙ্গীতজীবনের সব দিকে লছমী ওস্তাদের যোগাযোগ ছিল।

১৯২৪ সালে যখন সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা মাসিকপত্র প্রকাশ আরম্ভ হল, তাঁর নাম মুদ্রিত থাকত তার তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে। সকলের শীর্ষে। তাঁর পরে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, নাটোর-মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়, দিলীপকুমার রায়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম তালিকায় দেখা যেত।

তাঁর নাম বরাবরই 'সঙ্গীতাচার্য লছমীপ্রসাদ মিশ্র' বলে প্রকাশিত হত 'সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা'য়। এই পত্রিকার সঙ্গে প্রথম থেকেই তিনি আন্তরিকভাবে যুক্ত ছিলেন। 'প্রবেশিকা'র লেখক-লেখিকাদের মধ্যেও থাকতেন 'শ্রীযুক্ত লছমীপ্রসাদ মিশ্র সঙ্গীতাচার্য'। তাঁর সঙ্গীত বিষয়ে লেখা দেখা যায় এই মাসিক পত্রিকায়।

সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকার ১৩৩২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'সঙ্গীতাচার্য লছমীপ্রসাদ মিশ্র মহাশয় প্রদত্ত ইমন, ঢিমা তেতালা।'

এই স্বরলিপি রচনার সঙ্গে লছমী ওস্তাদের স্বাক্ষরে একটি নিবেদন থাকে—'এই সংখ্যায় কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত কিরূপ সহজে আয়ত্ত করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতানুযায়ী আলোচনা করিতে একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপা না হইলে মানুষ ইচ্ছামত কার্য করিতে পারে না। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন ক্ষুদ্র একটি স্বরলিপি ব্যতীত বর্তমান সংখ্যায় অন্য কোন বিষয় লিখিতে পারিলাম না। সে কারণে দুঃখিত আছি। শ্রীলছমীপ্রসাদ মিশ্র।'

বাংলার সঙ্গীতসমাজে এক বহুমানী আচার্য হয়েই তিনি ছিলেন। আরো একটি সংবাদ পাওয়া যায় এ বিষয়ে।

১৯২৮ সালের ৫ই মে তারিখে খড়দায় বেশ বড় একটি সঙ্গীত সম্মেলন হয়। তার উদ্দেশ্য ছিল—খড়দায় একটি সঙ্গীতসমাজ স্থাপন। সেখানে বিগত যুগের সঙ্গীতজ্ঞদের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিষ্ঠা করা হবে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয়, ইত্যাদি।

সেদিনের আসরে কলকাতা থেকে নানা প্রসিদ্ধ গায়ক বাদক যোগ দিয়েছিলেন। যেমন শরদী আমীর খাঁ, সারঙ্গী ছোটে খাঁ, গায়ক-তবলা-বাদক অনাথনাথ বসু, টপ্পাগায়ক রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ধ্রুপদী বিনোদ গোস্বামী, টপ্পাগায়ক বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়, এলাহি বক্স প্রভৃতি।

সেই বৃহৎ অনুষ্ঠানে লছমীপ্রসাদও এসেছিলেন। আর, সকলের সম্মতিতে তিনিই হন সভাপতি।

সভায় স্থির হয়, খড়দায় একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। সেজন্যে যাবতীয় ব্যবস্থা নেবার সংকল্পও করলেন কর্মকর্তারা। 'খড়দহ সঙ্গীতসমাজ'—সংস্থাটির এই নামও সাব্যস্ত হল।

তার প্রতিষ্ঠাও হয়েছিল আট মাস পরে। ১৯২৯-এর ৫ই জানুয়ারী সেই 'খড়দহ সঙ্গীতসমাজ'-এর উদ্‌বোধন হয় আর একটি বিরাট আসরে। সেদিনও কলকাতার নানা নামী গুণী গান-বাজনা শোনাতে আসেন। এবারের স্থান—গোকুলচাঁদ বড়ালের বাগান।

কলকাতার সেই গোকুলচাঁদ বড়াল, যাঁর বৌবাজার হিদারাম ব্যানার্জী লেনের বাড়িতে একদিন লালচাঁদ বড়াল ছদ্মবেশে গান গেয়েছিলেন। সে বিবরণ দেওয়া হয়েছিল 'ভুলে গেলে বলে বলে দিও' অধ্যায়ের শেষে।

গোকুলচাঁদের বাগানের অনুষ্ঠানেও লছমীজী সভাপতি হন। তাঁর নাম প্রস্তাব করেন বাংলার এক সর্বমান্য কলাবৎ—পাখোয়াজী দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য। সেদিন অনুষ্ঠান চলেছিল প্রায় সারারাত।

লছমীজীর শেষ জীবনে সেটিই সবচেয়ে বৃহৎ আসর। সেই সালই তাঁর মৃত্যুর বছর।

যশ সম্মান প্রীতি সবই তিনি জীবনে পেয়েছিলেন। বাংলার আচার্য স্থানীয় কলাবৎ হয়ে সার্থক ছিল তাঁর শিল্পী-জীবন। সঙ্গীত সেবা করে সেকালে প্রাপ্তিযোগ বেশি হত না। অভাব পূর্ণ হলেই খুশি থাকতেন গুণীরা। বিশেষ লছমীজী। তাঁর সাধাসিধা অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। অর্থলোভও ছিল না আদৌ। সাধারণ সাংসারিক প্রয়োজন সবই মিটে যেত। তিনিও থাকতেন সন্তুষ্টচিত্ত।

কিন্তু শেষের কয়েক বছর বড়ই কষ্ট পান ওস্তাদজী। তাঁর মানসিক শান্তি একেবারেই ছিল না। যথারীতি সঙ্গীতচর্চা করে যেতেন, তালিম দিতেন। আসরেও যোগ দিতেন গাইতে, বাজাতে। কিন্তু নিদারুণ শোকে বিপর্যস্ত ছিল তাঁর মন। তবে ধীর স্থির স্বভাবের জন্যে বাইরে তার প্রকাশ দেখা যেত না। শুধু ঘনিষ্ঠ পরিচিতেরা জানতেন তাঁর বিদীর্ণ অন্তরের কথা।

লছমীজীর একমাত্র পুত্র হরিদাস। আবাল্য তাকে নিজের হাতে গড়ে তোলেন। কি গুণী হয়েছিলেন হরিদাস। পিতার অতিযোগ্য উত্তরসাধক। পূর্ণ পরিণত যুবক ত্রিশ বছর পার হয়েছিলেন। বৃদ্ধ ওস্তাদের সকল রকমের আশাভরসাস্থল।

সে পুত্র লছমীজীর শুধু জীবনের অবলম্বন ছিলেন না। পিতার মতন বহুমুখী সঙ্গীতপ্রতিভাও। তেমনি নানা রীতির গানে, যন্ত্র-সঙ্গীতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন হরিদাস।

ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ও টপ্‌খেয়াল অঙ্গের গায়ক। সেই সঙ্গে সুরবাহার সেতার তবলা ইত্যাদি বিভিন্ন যন্ত্রবাদক। তরুণ বয়সেই এমনি বিচিত্রগামী গুণীরূপে হরিদাস বৃহত্তর সঙ্গীতক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন। তবে মুখ্যত তিনি ধ্রুপদী।

তাঁর সম্বন্ধে একজন সমসাময়িকের বিবৃতি পাওয়া যায় যা নির্ভর-যোগ্য। শিল্পাচার্য প্রমোদকুমার চটোপাধ্যায় প্রথম জীবনে ছিলেন জোড়াসাঁকো-নিবাসী এবং লছমী ওস্তাদ তথা হরিদাসের অতি নিকট প্রতিবেশী। আবাল্য হরিদাসের তিনি পরিচিতও। হরিদাসের একটি আসরের উল্লেখ তাঁর আত্মজীবনীতে আছে, যেখানে হরিদাস গান এবং সুরবাহার, সেতার শুনিয়েছিলেন। সে আসর হয় লক্ষ্মীকান্তপুরে (ডায়মণ্ড হারবার অঞ্চলে), প্রমোদকুমারের মামার বাড়িতে, একটি বিবাহ উপলক্ষ্যে। তার প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল—

'সেজ মামার বিবাহ উপলক্ষ্যে একদিন···কলকাতা থেকে কেশব আর লছমীপ্রসাদের ছেলে হরিদাস মিশ্র দুজন প্রসিদ্ধ গাইয়ে গিয়েছিল। হরিদাসের সঙ্গে আমাদের বাল্যকাল থেকেই আলাপ-পরিচয় ছিল, আমাদের পাড়াতেই তারা থাকত। আমাদেরই বয়সী কিন্তু তার সঙ্গীতবিদ্যায় দক্ষতা সঙ্গীত-সমাজে সর্বজনবিদিত। যন্ত্রে তার হাত এত সুন্দর ছিল যে সভায় সর্বশেষে সকলকার বাজনা হয়ে গেলে পর তারই বাজনা হত। তার পিতা লছমীপ্রসাদ সর্ব-জনবরেণ্য গুণী, বহু ধনবানের ঘরে তিনি শিক্ষা দিতেন। এখন ওখানে কেশব, লছমীপ্রসাদের ভাই আর হরিদাসকে শ্রীশ মামা এনেছিলেন, সেইজন্যেই উৎসবটি অত্যন্ত গৌরবের হয়েছিল। ঐ উৎসবের দিনেই সকালে সভায় তাঁদের গান এবং তারপর

সুরবাহার পরে সেতার বাজনা শুনে নিয়েছিলাম ভাগ্যে,…’ (প্রাণকুমারের স্মৃতিচারণ, পৃষ্ঠা ২৮৯)।

সেই হরিদাসের পূর্ণযৌবনকালেই মৃত্যু হল।…

বাহ্যত সে মহাশোক সহ্য করলেন লছমীজী। কিন্তু শরীর ভেঙে পড়তে লাগল। আগে থেকেই শরীর বিশেষ সুস্থ ছিল না। কষ্ট পেতেন হাঁফানিতে। সে রোগ ক্রমেই বাড়তে লাগল।

চিকিৎসাও চলল কবিরাজী ইত্যাদি। কিন্তু কোন ফল দেখা গেল না। জীর্ণ দেহেই ওস্তাদজি সঙ্গীতচর্চা করতে লাগলেন আগেকার মতন।

বাড়িতে শিষ্যরা আসতেন। লছমীজী যথারীতি শেখাতেন তাঁদের। আসরেও যেতেন। সঙ্গীতের মধ্যেই শোক সংবরণের চেষ্টা করতেন ওস্তাদজী। কিন্তু জীবনীশক্তি সে মহাশোকে নিঃশেষ হয়ে আসছিল।

ওদিকে হরিদাসের মৃত্যুর পর থেকে শিব, পশুপতি বিশেষ করে আসতেন। তাঁরা লছমীজীর বিশেষ আত্মীয়। শিব, পশুপতির পিতামহ হরিপ্রসাদ বা প্রসদ্দু এবং লছমী ওস্তাদের পিতামহ মনোহর— দুই সহোদর। শিব, পশুপতি তাই লছমীজীর সবচেয়ে নিকট জ্ঞাতি।

শিব, পশুপতি ভ্রাতারাও কলকাতায় পেশাদার সঙ্গীতজীবন যাপন করতেন। লছমীজীর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ, সামাজিকতা আগে থেকেই ছিল এখানে। যাতায়াতও। শিব, পশুপতি দুজনেই লছমীজীর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তাঁকে যথেষ্ট সম্মানও তাঁরা করতেন। আসতেন তাঁর সাগর ধর লেনের বাসায়।

লছমীপ্রসাদ অসুস্থ হওয়ার পর থেকে তাঁর কাছে তাঁরা বেশি আসা যাওয়া করতে লাগলেন। এখন তাঁদের মনে ছিল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

লছমীজীর একমাত্র পুত্র হরিদাসের মৃত্যুতে শিব, পশুপতির

মনে একটি ইচ্ছা জেগেছিল। একটি আশা। তাঁদের কোন পুত্রকে লছমীজী যদি পোষ্যপুত্র হিসেবে নেন।

পশুপতি অপুত্রক। কিন্তু শিবসেবকের তিন পুত্র—রামকিষণ, ভবানী ও বিষ্ণু। তাঁদের একটিকে তো পোষ্য নিতে পারেন লছমীজী। এরা একই বংশের। সঙ্গীতচর্চাও একই ধারায়। নিলে লছমীজীরও তো এ বয়সে একটা অবলম্বন হতে পারে। আর ভাল হয় এদিকেও। ওস্তাদজীর বিপুল বিদ্যার অধিকার এসে যায় এ ঘরে।

শিব, পশুপতির মনে এই আশা স্বাভাবিকভাবেই জাগে।

কাউকে পোষ্যপুত্র নিলে, লছমী ওস্তাদ তাঁর সঙ্গীতবিদ্যাও তাকে দান করবেন পুত্রের মতন।

তাঁদের মনের এই ইচ্ছা বা আশার কথা তাঁরা জানিয়েও ছিলেন লছমীজীকে।

কিন্তু ওস্তাদজী কোন উত্তর দেননি। হয়ত তাঁর ভাল লাগেনি শিব, পশুপতির এই প্রস্তাব বা ইচ্ছা। এ কথায় লছমীজীর মনে পুত্রশোকের দাহ হয়ত নতুন করে জাগত।

তবে তিনি কিছু প্রকাশ করতেন না মুখে। শিব, পশুপতি আসতেন। বসে বসে চলে যেতেন। কিন্তু এ বিষয়ে মৌন থাকতেন লছমীজী।

আর শেষ পর্যন্ত তিনি কাউকে পোষ্যপুত্র নেননি।

ক্রমে শরীর তাঁর আরো জীর্ণ হল হাঁফানির পীড়নে। চিকিৎসায় আর কিছু হয় না দেখে আত্মীয়স্বজন সেবকরা সাধুদের শরণাপন্ন হলেন। সেবার কয়েকজন শক্তিসম্পন্ন সাধু এসেছিলেন গঙ্গাসাগর তীর্থ করতে। লছমীজীকে সুস্থ করবার আশায় তাঁদের কাছে প্রার্থনা জানানো হল।

সাধুরা বললেন, 'শান্তি স্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান করতে হবে।'

সেই মতন সব ব্যবস্থা হল লছমীজীর বহুদিনের বাসস্থান সেই ১২, সাগর ধর লেনে।

সেখানে সকালবেলা সাধুরা অনেকক্ষণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন। শান্তি স্বস্ত্যয়ন হল ওস্তাজীর নিরাময় কামনায়।

অনুষ্ঠানের শেষে সাধুরা বললেন, 'সন্ধ্যার পর গান শুনব আমরা। এত বড় ওস্তাদ—গানের আসর যেন হয়।'

অনেকে এসেছিলেন তাঁর শান্তি স্বস্ত্যয়ন দেখতে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সঙ্গীতজ্ঞ। সুতরাং সন্ধ্যাতেই সকলে আসরেরও আয়োজন করলেন।

সেই বাড়িতেই আসর হল। লছমীজীর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব শিষ্য-গায়ক-বাদক অনেকেই এলেন আসরে। শিব, পশুপতি, গৌরীশঙ্কর, কালী ওস্তাদ, শ্যামাচরণ, বুন্দি, নান্নু সহায় প্রভৃতি। শিষ্য অনাথনাথ বসুও এসেছিলেন।

সেদিনও ওস্তাদজীর শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। তিনি শুনলেন সকলে উপস্থিত হয়েছেন আসরে।

লছমীজী কোনরকমে কষ্ট করে এসে সকলের সঙ্গে বসলেন। তারপর সবাই অপেক্ষা করতে লাগলেন সাধুদের জন্যে।

তাঁরা সময় মতন এলেন। এবার আরম্ভ হবে আসরের অনুষ্ঠান।

সন্তরা বললেন, 'প্রথমে আমরা ওস্তাদজীর গান শুনব।'

তাঁদের অনুরোধ শুনে বড়ই দুঃখ পেলেন লছমীজী। হাত জোড় করে সবিনয়ে জানালেন, 'আসরে গান গাইবার ক্ষমতা আমার একেবারে নেই। আপনারা আমায় অনুগ্রহ করে ক্ষমা করুন।'

জীবনে এই প্রথম সঙ্গীতে অক্ষম হলেন লছমীপ্রসাদ।

এত বড় কলাকার আজ বার্ধক্যে অপটু হয়েছেন। সমবেত গুণীরা বুঝলেন তাঁর কষ্ট। ওস্তাদজীর শিষ্যরা বিষণ্ণ হলেন। গুরুজীর এমন অবস্থা তাঁরা দেখেননি কখনো।

তখন অন্যদের গান হল। শিব, পশুপতি জুটিতে গাইলেন খেয়াল।

অনাথনাথ বসুও খেয়াল শোনালেন। আরো কেউ কেউ গাইবার পর শেষ হল গানের অনুষ্ঠান।

সঙ্গীতের আসরে লছমীজীর সেই শেষ উপস্থিতি। তাও বিনা সঙ্গীতে।

তারপর আর কদিন মাত্র বেঁচে ছিলেন।

অবশেষে ৭ই ডিসেম্বর ১৯২৯ চিরনীরব হয়ে গেলেন লছমী ওস্তাদ।

বয়স তখন হয়েছিল ৭০ বছর।...

তাঁর মৃত্যুতে সঙ্গীতজগতে এক বিচিত্র শূন্যতার সৃষ্টি হল। কারণ উত্তর-অধিকার তো চলে যায় পূর্বেই।

লছমীপ্রসাদের সেই প্রতিভাদীপ্ত একমাত্র পুত্র হরিদাস মিশ্র। বংশগত বিদ্যার কি যোগ্য অধিকারীই সেই বয়সে হয়েছিলেন।

তার একটু পরিচয় একদিন পাওয়া যায় সঙ্গীত মিত্রালয়ে। উত্তর কলকাতার সেই সুন্দর আসরটিতে।

আহিরীটোলায় ভূতনাথ মিত্রের বাড়ির সেই আসর। সঙ্গীত মিত্রালয়। মিত্র ভবনের সে আসরের কথাও বলবার মতন। কলকাতায় বিগত যুগে কত উচ্চ মানের সঙ্গীতাসর ছিল। বলা যায়, আসরের শহর কলকাতা। তবু সেই সঙ্গীত মিত্রালয়ের মতন এমন দরাজ আসর সেকালেও আর ছিল কিনা সন্দেহ।

সমস্ত বড় বড় কলাবতদের গান-বাজনা তো সেখানে হতই। শরদী কৌকব খাঁ ও করামতুল্লা খাঁ, সারঙ্গী ছোটে খাঁ ও গৌরীশঙ্কর মিশ্র, সেতারী এমদাদ খাঁ, শরদী আমীর খাঁ, লছমী ওস্তাদ ও শিব, পশুপতি, ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাও ও পাখোয়াজী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেক গুণীরই আসর হয়েছে সেখানে।

কিন্তু সেজন্যে কথা নয়। শ্রেষ্ঠ গায়ক-বাদকদের নিয়ে কলকাতায় তো আরো নানা বাড়িতেই আসর হত। কিন্তু শ্রোতাদের জন্যে

সঙ্গীত মিত্রালয়ে ছিল ঢালাও ব্যবস্থা। আর এ বিষয়েই আহিরী-টোলার সেই মিত্র বাড়ির জুড়ি মেলা ভার।

সেখানে কোন কোন আসর পর পর দুদিন ধরেও চলত। সে সময় সেখানে শ্রোতাদের গান-বাজনা:শোনার জন্যে আহার থেকে বিশ্রাম পর্যন্ত ব্যবস্থা থাকত সব কিছুর। প্রথম দিনে তো সারা রাত আসর হল। তারপর চলে গেলেন গায়ক-বাদকরা।

কিন্তু নিমন্ত্রিত শ্রোতারা মিত্রালয়েই সাদরে রইলেন। কারণ পরের সন্ধ্যায় আবার বসবে আসর। তাই তাঁদের সারা দিনের বিশ্রাম আহার জলযোগ ইত্যাদির যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা আছে। আর সে সবই অমায়িকভাবে হয়ে থাকে অতিথিদের জন্যে। সম্মান, আপ্যায়ন এবং সুবিধা ভোগে কোথাও লেশমাত্র ত্রুটি নেই। এমন কি বাথরুমে প্রত্যেকের জন্যে কোঁচানো কাপড় পর্যন্ত প্রস্তুত।

শ্রোতাদের জন্যে সেকালের জামাতার মতন আদর অভ্যর্থনা। গান বাজনা শুনতে এসেছেন। থাকুন, আরাম করুন, আহার করুন, বিশ্রাম নিন। নিজের বাড়ির মতন ভাববেন। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হলে বলবেন। আবার সন্ধ্যার পর শুনবেন আর এক দলের গান-বাজনা। ইচ্ছে হলে সে রাতেও থেকে যাবেন। সব আয়োজন করা আছে সে জন্যে। নিঃসঙ্কোচে থাকবেন।

মিত্র মহাশয়ের জলসাঘরে শোনবার জন্যে যাঁরা নিমন্ত্রিত হন তাঁদেরও গুণ আছে। তাঁরা কেউই হুজুগের শ্রোতা নন। প্রত্যেকে রীতিমত বোদ্ধা। গুণীর গুণপনা বোঝেন। ধরতে পারেন অল্পবিদ্যার ফাঁকি। রাগের ঠিক-বেঠিক জ্ঞানও তাঁদের আছে। উপযুক্ত সময়ে তারিফ করতে জানেন। কূট তান সমে এসে পড়লে মাথা তাঁদের ঠিক নড়ে ওঠে ঝোঁকের মুখে।

এই মিত্রালয়ের নিয়মিত শ্রোতারা তেমনি গুণগ্রাহী। শিল্পীদের মতন তাঁরাও এখানে তাই সম্মানিত অতিথি। দস্তুরমত সমঝদার,

আসরের প্রাণ। এমন শ্রোতাদের না পেলে আসর জমে না। কলাবতদের মেজাজ আসে না। সঙ্গীত মিত্রালয়ের তাই অন্তরের মিত্র তাঁরা। এখানে তাঁদের বড় খাতির।…

সেদিনও ভূতনাথ মিত্র একটি বড় আসরের আয়োজন করেছেন। তাঁর মিত্রালয়ের জলসাঘর ভরে উঠেছে বিশিষ্ট শ্রোতার দলে। কলাকাররাও উপস্থিত। তাঁরা সকলেই কলকাতার।

শুধু বাইরে থেকে এসেছেন দুর্ধর্ষ প্রবীণ পাখোয়াজী মদনমোহন মিশ্র। স্বনামধন্য কদৌ সিংহের উপযুক্ত শিষ্য তিনি। আর এখানকার মধ্যে আছেন লছমী ওস্তাদ, শরদী আমীর খাঁ, সারঙ্গী ছোটে খাঁ প্রভৃতি। নবীনদের মধ্যে আছেন লছমীপুত্র হরিদাস মিশ্র, অনাথনাথ বসু এমনি কজন।

সেদিন আসরে আসবার আগে পিতা-পুত্রে এ বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছিল।

এ আসরে একজন বড় পাখোয়াজী আসবেন, তা শুনেছিলেন হরিদাস। আর বাড়িতেই বলেছিলেন, 'বাবা, আপনি নাইবা গেলেন। আমি আজকের আসরে ধ্রুপদ গাইব।'

হরিদাসের কথার ধরনে লছমীজীর ঠিক সন্দেহ হয়।

পুত্রকে তিনি স্পষ্ট বলেন, 'না, আমিও থাকব। দেখ, হরিয়া, মদনমোহনজী বড় গুণী আদমি। তাঁর কদৌ সিংয়ের তালিম। কিন্তু এখন মিশিরজীর অনেক বয়স হয়েছে। সামলে গাইবি। ওঁর সঙ্গে লড়াই বাধাসনি যেন।'

সেদিন আসরে কিন্তু তাই ঘটে গেল। আর সে সাধারণ লড়াই নয়। অতি কুট লয়কারীর অদ্ভুত শক্তি পরীক্ষা।

যথাসময়ে সঙ্গীত মিত্রালয়ের আসর আরম্ভ হল। আর সেকালের রীতি মতন ধ্রুপদ দিয়েই শুরু। প্রথম শিল্পী হলেন তরুণ হরিদাস।

তাঁর গানের সঙ্গে মদনমোহনজীই পাখোয়াজ নিয়ে বসলেন।

সামনের সারিতে আছেন লছমীজী, আমীর খাঁ প্রমুখ কলাবন্ত।

শ্রোতাদের মধ্যে নানা বিচক্ষণ ব্যক্তি রয়েছেন। আসরকক্ষ পরিপূর্ণ।

অতি সুরেলা দরাজ কণ্ঠে গান ধরলেন হরিদাস। যথাবিধি আলাপচারিতে রাগের রূপ দেখালেন। সুরের সুন্দর আবহ সৃষ্টি হল আসরে। আলাপের পর হরিদাস্ স্থায়ী গাইতে শুরু করলেন।

মদনমোহন পাখোয়াজের সুর তানপুরার সঙ্গে আর একবার মিলিয়ে নিলেন।

হরিদাস চৌতালে গান আরম্ভ করলেন ঠাস লয়ে।

মদনমোহনের পাখোয়াজ মেঘমন্দ্র ধ্বনি করে উঠল। বৃদ্ধ হলেও তাঁর রিয়াজী হাতের কি মুন্সিয়ানা। বোলের গুরু গুরু ঝঙ্কারে যেন উন্মাদনা জাগল আসরে।

শ্রোতারা কলাবৎ রসাস্বাদের আশায় উৎসুক হলেন। হরিদাসের সঙ্গে মদনমোহনজীও আকৃষ্ট করেছেন তাঁদের।

কিন্তু স্থায়ী কলির মধ্যেই গোলযোগ বাধল। গায়কের সঙ্গে পাখোয়াজীর অমিল। সঙ্গত মিলছে না গানের তালে।

ব্যাপার কি? কার গরমিল? হরিদাস, না মদনমোহনের গলদ?

শ্রোতারা কৌতূহলী, উৎকর্ণ হলেন। উপেজের শেষে কি ঠিক পৌঁছতে পারছেন না পাখোয়াজী? নাকি হরিদাস সমে পড়বার আগে মাঝপথে ছেড়ে দিচ্ছেন?

তটস্থ হলেন প্রবীণ মদনমোহন। গাওয়াইয়ার লয়কারী সতর্ক হয়ে অনুধাবন করলেন। হাঁ। উপেজ তো শেষ করছেন না গায়ক।

তারপর বললেন হরিদাসকে, 'এ কেয়া? বিচ্‌মে রোক্‌তা কাহে?'

সমের আগেই কেন থেমে যাচ্ছ?

সপ্রতিভ গায়ক জানালেন, 'আপকা ইজ্জৎকো ওয়াস্তে। উপেজ পুরা করলে আপনি ধা লাগাতে পারবেন না।'

কি, এত বড় কথা ?

মিশ্রজী সোজা হয়ে বসে বললেন, 'চলিয়ে ত শেষ তক্ !'

মদনজীর কথা মতন উপেজ শেষ করে হরিদাস স্থায়ীতে ফিরে এলেন। কিন্তু আসরের সবাই দেখলেন—আশ্চর্য, এত বড় পাখোয়াজী পৌঁছতে পারলেন না উপেজের শেষে। মদনমোহন নিজেও যেন অতিশয় বিস্ময় বোধ করলেন।

এবার হরিদাস বললেন, 'মিশিরজী, ঠিক কিজিয়ে।'

মদনমোহনের ইজ্জতেই ঘা পড়ল। তিনি আত্মসম্মান বাঁচাতে যেন শেষ শক্তিতে হাঁকলেন, 'ঔর এক দফে।'

কিন্তু একবার নয়, একাধিকবার একই ব্যাপার ঘটল। হরিদাস গাইলেন যথারীতি। কিন্তু প্রত্যেকবার উপেজের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এসে পড়তে অক্ষম হলেন মদনমোহন !

বিচক্ষণ শ্রোতারা এবার স্পষ্টই একথা বুঝলেন। আর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মদনমোহনজী নিজে। এ কি বিষম কূট লয়কারি !

বৃদ্ধ পাখোয়াজীর মস্তিষ্ক আলোড়িত হয়ে উঠল। প্রকাশ্য আসরে শুধু অপদস্থ হওয়াই নয়। আরো এক বেদনার্ত অনুভব। মিশ্রজীর চৈতন্যলোক চমকিত করে জাগতে লাগল বহুদিন আগের একটা আসরের স্মৃতি। অনেক কালের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা !

লেকিন কেয়া তাজ্জব ! ঠিক সেই জিনিসের পুনরাবৃত্তি এখানে কেমন করে হল ? এতকাল পরে ! এই নওজওয়ান গাওয়াইয়ার গানে !

মদনমোহন কোল থেকে পাখোয়াজ নামিয়ে রাখলেন। হরিদাসের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'আপ্ কোন্ হ্যায় ?'

অর্থাৎ কি আপনার বংশধারার পরিচয়—ঘরানা ?

হরিদাস লছমীজীর দিকে দেখালেন, 'মেরা পিতাজী।'

'আপকা দাদা ?'

'রামকুমার মিশির।'

'বানারস্‌কা?'

'জী, হাঁ।'

মদনমোহনজী আস্তে আস্তে বললেন, 'অব্‌ পাত্তা মিলা।'

গান বাজনা তো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শ্রোতারা অনেকেই অবাক হয়ে শুনছিলেন এঁদের অদ্ভুত কথাবার্তা। এখন তাঁরা আরো কৌতূহলী হলেন। অন্য একটি বৃত্তান্ত শোনবার আশায়। তা হয়ত গান-বাজনার চেয়ে কম উদ্দীপক হবে না। নড়ে চড়ে বসলেন সকলে।

লছমীপ্রসাদের বিস্ময় সবার চেয়ে বেশি। মদনমোহনজী বাবার নাম করে কি বলতে চাইছেন? তিনি চেয়ে রইলেন মিশ্রজীর মুখের দিকে। এবার তিনি বোধহয় রহস্য ভেদ করবেন!

বহুদিন আগেকার আর একটি আসরের নাটকীয় বর্ণনা আরম্ভ করলেন বৃদ্ধ পাখোয়াজী। লছমী ওস্তাদ আর সকলেই মদনমোহনের কাহিনী শুনতে লাগলেন।

হরিদাসের দিকে ফিরে মিশ্রজী বলতে লাগলেন, 'সে পুরানা জমানার কথা। আমি তখন তোমারই মতন জওয়ান। বেনারসের এক আসরে তোমার দাদা রামকুমার মিশিরজী গাইছেন। আমি সঙ্গত করছি।

গান বেশ জমেছে। কিন্তু আমার তখন কম বয়সের দাপট। রামকুমারজীর গানকে আমার পাখোয়াজের সঙ্গে কেবল টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। তোমার দাদা তা বুঝতে পারলেন। কোসিস করতে লাগলেন নিজের লয়ে দাঁড়াতে। আর আমি চাইছি আমার দিকে টেনে নিতে।

এমন সময় রামকুমারজী গান থামিয়ে বললেন, 'সাথ্‌ সাথ্‌ চলো। সুস্থ্‌ হোকে মিঠা করকে বাজাও, ভাই। লড়াই করছ কেন?'

বলে আবার গান ধরলেন। কিন্তু বুড়োমানুষের কথায় আমি কান দিলুম না। আমার রক্ত গরম তখন। কেবল তেড়ে বাজাবার আর গাওয়াইয়াকে বেকায়দায় ফেলবার দিকে ঝোঁক। আর মনে এই অহঙ্কার—আরে, এত যে শিখেছি, এসব বাজাব না?

তখন আর খানিক গেয়ে তোমার দাদা এমন একটা লয়কারী করলেন—ঠিক এই তোমার মতন—যে, আমার হাত একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কোনদিকে রাস্তা নেই। আমি আর কিছুতেই তাঁর গানের সঙ্গে ধা লাগাতে পারলুম না। বে-ইজ্জতের একশেষ।

পাখোয়াজ থেকে হাত উঠিয়ে নিতে হল সকলের চোখের সামনে। এখন আমার যা বয়েস সে সময় তোমার দাদারও হয়ত তেমনি বয়েস হয়েছিল।

তিনি তারপর আমায় বললেন, 'সঙ্গতীয়া, এদিক সেদিক করতে গেলে নিজেই বেকায়দায় পড়বে। মনে রেখো, আমাদের ঘরে যা আছে, তুমি এসব জিনিসের সঙ্গে কিছুতেই বাজাতে পারবে না। যদি নিজেকে না শোধরাও, তাহলে পরেও এই দুরবস্থায় পড়বে।'

আজকের এই লয়কারীও ঠিক সেদিনের মতন। এবারও আমি বেকায়দায় পড়লুম। আমি তো আর কিছুদিন পরেই মরে যাব। কিন্তু আজও এ জিনিসের সঙ্গে বাজাতে পারলুম না। সেদিনও যেমন আজও তেমনি আমায় বেইজ্জৎ হতে হল আসরে। তোমার দাদার সেই পুরানা জমানার কথাই ঠিক ঠিক ফলে গেল।'

বিমর্ষ বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরব হলেন। আসরসুদ্ধ লোক তাঁর এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলেন এতক্ষণ।

শেষে লছমী ওস্তাদই জলসাঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। অল্প কথার শান্ত মানুষ তিনি। সংবেদনশীল, প্রাজ্ঞ। অপদস্থ বৃদ্ধের বেদনা তিনিই অনুভব করলেন সবচেয়ে বেশি।

হরিদাসকে সংক্ষেপে শুধু বললেন, 'হরিয়া, গান শুরু করো।'

আর মদনমোহন মিশ্রের দিকে ফিরে তাঁকে বাজাতে অনুরোধ করলেন।

হরিদাসও বুঝলেন পিতার আসল বক্তব্য। তাঁর নির্দেশ। প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, সঙ্গতকারের সঙ্গে তিনি সহযোগিতাই চান।

সেই ভাবেই গান আরম্ভ করলেন হরিদাস।

এবার তাঁর গানের সঙ্গে মদনমোহনজীর সঙ্গত মিলতে লাগল ঠিক ঠিক। আর কোন গোলমাল নেই। লড়াইয়ের পর এবারে যথার্থ সঙ্গীত আরম্ভ হল আসরে।···

লছমী ওস্তাদের সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্বে সেদিন সঙ্গীত মিত্রালয়ের আসর এমনিভাবে রক্ষা পেয়েছিল। আর সম্মান ফিরে পান বৃদ্ধ পাখোয়াজী!

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত